প্রভাতকুমার: জীবন ও সাহিত্য

প্রভাতকুমার

সৌজন্য ঃ শ্রীঅলোক রায়

প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য

ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়
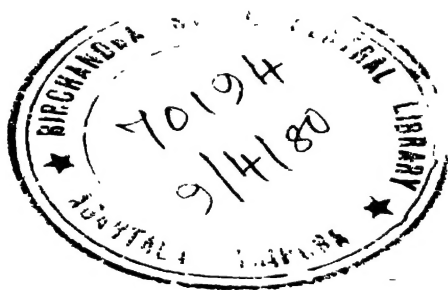
· দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা - ৯

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থটি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গবেষণা-নিবন্ধ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রকাশকের ইচ্ছানুসারে নামটি শুধু বদলে দিয়েছি—অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। কয়েক বছর আগে অধুনালুপ্ত 'বিহার স্টেট ইউনিভার্সিটি কমিশনে'র 'রিসার্চ-ফেলো' হিসাবে যখন প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি, তখন মনে একটু সংশয় থাকলেও এখন দেখছি বিষয় নির্বাচন খুব সময়োপযোগী হয়েছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যের বরেণ্য শিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর জন্মের শতবর্ষও পূর্ণ হয়েছে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। অথচ পরিতাপের বিষয় যে প্রভাতকুমারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী অথবা প্রভাত-সাহিত্যের কোন আলোচনাগ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অথবা বাংলা গল্প-উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেকেই প্রভাতকুমারের আলোচনা করেছেন এবং সেগুলির গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। কিন্তু একথাও সত্য যে সেগুলি পর্যাপ্ত অথবা সুসম্পূর্ণ নয়। বর্তমান গ্রন্থটিও যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সে দাবী করি না—কিন্তু এটি যদি সুধীজনের দৃষ্টি বিস্মৃতপ্রায় প্রভাতকুমারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ছোটগল্পেই প্রভাতকুমারের প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শিল্পকৌশলের দিক থেকে প্রভাতকুমার আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ছোটগল্পের লেখক হিসাবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নিচেই তাঁর স্থান। কিন্তু জনপ্রিয়তায় সমসাময়িককালে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছিলেন। শুধু জনপ্রিয় লেখক বললে অবশ্য তাঁর প্রতিভাকে ছোট করে দেখা হয়, তিনি শক্তিমান লেখক। তাঁর রচিত 'মাষ্টার মহাশয়', 'আদরিণী', 'রসময়ীর রসিকতা', 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'প্রণয় পরিণাম' ইত্যাদি উৎকৃষ্ট গল্পগুলি পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পরেই পরম গৌরবের বলে বিবেচিত হবে। বর্তমান আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রভাতকুমার শতাধিক গল্প লিখেছেন। দু-একটি বাদে প্রায় প্রতিটি গল্পেরই আলোচনা করেছি এবং পরিশিষ্টে গল্পগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকাও দিয়েছি।

প্রভাতকুমার বেশ কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনা করেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে শিল্পকৌশলের দিক থেকে উপন্যাসগুলির নানা ত্রুটি আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলির সুখপাঠ্যতা স্বীকার করতেই হয়। এই কারণেই তাঁর রচিত 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দূর কৌটা', 'রত্নদীপ' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি সমসাময়িককালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান ছিল।

একমাত্র অসম্পূর্ণ 'বিদায় বাণী' ছাড়া প্রভাতকুমারের সমস্ত উপন্যাসের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির একটি বাঁধান খাতা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। খাতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় সুরক্ষিত আছে। খাতাটিতে 'রত্নদীপ' ও 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসের এবং 'আধুনিক রোমিও' ('নিষিদ্ধ ফল' শীর্ষকে প্রকাশিত) ও 'খোকার কীর্তি' ('খোকার কাণ্ড' নামে প্রকাশিত) গল্পের পাণ্ডুলিপি আছে। তাছাড়া আরও কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত খসড়াও আছে। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'জীবনের মুল্য', 'আধুনিক রোমিও' এবং 'গুণীর আদর' এই তিনটির পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দিয়েছি। 'খোকার কীর্তি'র পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা অবশ্য প্রভাতকুমারের নয়। অনুসন্ধান করে জেনেছি এই হস্তাক্ষর কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি কি সূত্রে গল্পটি লিখে রেখেছেন তা বোধগম্য হয়নি। এই খাতাটিতেই প্রভাতকুমার স্বহস্তে নিজ বংশতালিকা লিখে রেখেছেন যার প্রতিলিপি বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় দিলাম।

গল্প-উপন্যাস ছাড়া কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রভাতকুমারের বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময়াভাবের জন্য সম্ভব হল না। গ্রন্থটির এই ত্রুটি দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করব।

এবার প্রভাতকুমারের জীবনীর প্রসঙ্গে আসি। প্রভাতকুমারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা আমার উদ্দেশ্য না হলেও তাঁর জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি সাহিত্য রচনা ত বটেই অন্যান্য কার্যকলাপও লোক চক্ষুর অন্তরালেই করে গিয়েছেন। মনে হয় এদিক থেকে তিনি একটু অসামাজিকই ছিলেন। দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ল' কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি অল্প সংখ্যক ভক্তেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অনুরাগী এবং অনুগামী ভক্তের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। কিন্তু সভা-সমিতি উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে তিনি আজীবন দূরে থেকেছেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্যাদি সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। যথাসাধ্য পরিশ্রম করে এবং অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অনেকের কাছে গিয়েও এমন কিছু তথ্য পাইনি যাতে প্রভাতকুমার সম্পর্কে খুব বেশী জ্ঞাতব্য বিষয় জনসমাজে উপস্থিত করতে পারি। কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ায় অনেক অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের কিছু মুল্যবান চিঠি প্রকাশ করা হয়নি। চিঠিগুলি দেখবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। প্রভাতকুমারের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও আশানুরূপ সাড়া পাইনি। আবার প্রভাতকুমার সম্পর্কে লোক মুখে কিছু কিছু অভিনব সংবাদ পেলেও

সেগুলির সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন এবং লোক সমাজে প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয়। তাই বিরত থাকতে হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমার পুর্বে যাঁরা প্রভাতকুমারের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী। সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং আমার গবেষণা নির্দেশক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট। গ্রন্থ-পরিকল্পনা থেকে সুরু করে গ্রন্থ-সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি উপদেশ-নির্দেশ এবং উৎসাহ দিয়ে আমাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। গবেষণা-গ্রন্থের অপর দু'জন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এঁরা দু'জনেই আমার পূজনীয় শিক্ষক। তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোন গবেষকের পক্ষেই ডঃ সুকুমার সেন অপরিহার্য। তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমার গবেষণার অনেক সূত্র পেয়েছি। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সাগ্রহে আমাকে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই।

অধ্যাপক ডঃ অলোক রায় তাঁর মাতামহ ৺মন্মথনাথ ঘোষের রচিত একটি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের পৌত্র শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। পাটনার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা 'ভারতী ভবনে'র অন্যতম কর্ণধার শ্রীতড়িৎ বসু গ্রন্থটি প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 'দে'জ পাবলিশিং'এর কর্তৃপক্ষ অপরিচিত লেখকের গ্রন্থ প্রকাশ করে যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

পাটনার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরি, হিরণ লাইব্রেরি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সহৃদয় সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

স্নেহাস্পদ ছাত্র, বর্তমানে সহকর্মী ডঃ দেবনারায়ণ রায় বইটি প্রকাশের জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিয়ে বইটির প্রকাশ ত্বরান্বিত করেছে। তাকে জানাই আমার আন্তরিক স্নেহাশিস্।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও অভিজ্ঞতা না থাকায় কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ থেকেই গেল। সেগুলির কোনটিই তেমন মারাত্মক নয় বলে শুদ্ধিপত্র-সংযোজন অপেক্ষা সুধী পাঠকের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করাই শ্রেয় মনে করি।

বাংলা বিভাগ, বিহার ন্যাশনাল কলেজ
পাটনা—৮০০০০৪

শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থ-সংকেত

	গ্রন্থের নাম	সংকেত
১।	প্রভাত গ্রন্থাবলী (শ্রীভবন সং)	প্র গ্র
২।	(বসুমতী সং)	প্র গ্র (ব)
৩।	রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং)	র র
৪।	বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং.)	ব র
৫।	সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫৪)	সা সা চ (৫৪)
৬।	সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার	সা দৃ প্র
৭।	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	প্র মু শ্রে গ
৮।	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (ডঃ সুকুমার সেন)	বা সা ই

॥ সূচীপত্র ॥

প্রভাতকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

১২৭৯ সালের ২২শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার ইংরাজী জন্ম তারিখটিকে কেহ কেহ ভুল করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছেন।[১] কিন্তু প্রভাতকুমার স্বয়ং একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"আজ ৪ ফেব্রুয়ারী আমার দ্বাবিংশতম জন্মদিন।"[২] প্রভাতকুমারের পিতার নাম জয়গোপাল এবং মাতার নাম কাদম্বিনী দেবী। ইঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার গুরুপ।

জয়গোপাল তদানীন্তন **Danapur Railway District**-এ **Telegraph Office Signaller-in-Charge**-এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে জামালপুর, ঝাঝা, দিলদার নগর ইত্যাদি বিভিন্ন স্টেশনে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। একমাত্র পুত্র প্রভাতকুমারের শিক্ষার ভার তিনি তাঁহার শ্যালিকাপুত্র রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র জামালপুর হাই-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। প্রভাতকুমার এই স্কুল হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পাটনা কলেজ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এফ, এ, এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১২৯৯ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রজবালা দেবীর সহিত প্রভাতকুমারের বিবাহ হয়। অন্নদাপ্রসাদের আদি নিবাস হালিসহর। কিন্তু কর্মসূত্রে তিনি তখন জামালপুরেই বাস করিতেন। বিবাহকালে প্রভাতকুমারের বয়স ছিল ১৯ বৎসর ১০ মাস। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এফ, এ'র দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দিকে ওঁর বিবাহ হয়ে যায়, ওঁর বয়স তখন সতের পূর্ণ হতেও কিছু বাকি ছিল···।"[৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"এফ, এ, পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্বে প্রভাতকুমার······বিবাহ করেন।"[৪] কিন্তু বিবাহের উপরোক্ত তারিখটি ঠিক[৫] হইলে প্রভাতকুমারের বিবাহ এফ, এ, পরীক্ষার পূর্বে হয় নাই, বি, এ, পরীক্ষার পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। অতঃপর ১৩০১ সালে এবং ১৩০৩ সালে যথাক্রমে প্রভাতকুমারের জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়।[৬] ১৩০৪ সালের ১৫ই শ্রাবণ প্রভাতকুমারের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

বি, এ, পাশ করিবার অব্যবহিত পরে প্রভাতকুমার জামালপুর হাই-স্কুলে শিক্ষকতার

চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি আষাঢ় ১৩০২ হইতে মাঘ ১৩০২ পর্যন্ত এই পদে ব্রতী ছিলেন। তাহার পর সিমলাতে Commissary General in Chief-এর অফিসে কিছুদিন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করেন। সিমলা হইতে ফিরিয়া তিনি কলিকাতায় Director General of Telegraph-এর অফিসে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। . কিন্তু এই চাকুরীও তাঁহাকে বেশীদিন করিতে হয় নাই। কলিকাতায় থাকাকালে প্রভাতকুমার 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলাদেবীর সহিত এতদুর ঘনিষ্ঠ হন যে উভয়ের বিবাহ পর্যন্ত স্থির হইয়া যায়। সরলাদেবীর উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের খরচে প্রভাতকুমারকে বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়িতে পাঠান। প্রভাতকুমার ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারি বিলাত যান এবং ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যেজন্য প্রভাতকুমার ব্যারিস্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের বন্ধুস্থানীয় সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

.... হঠাৎ শুনলুম এক রোমান্‌সের কাহিনী। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যাবতী ও লেখিকা কন্যা সরলা দেবী প্রভাতকুমারের গল্প পাঠ করে তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন, শীঘ্রই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। প্রভাতকুমার তখন বোধ হয় ডাক বিভাগে কেরানী-গিরি করতেন। নিজেদের পরিবারের যোগ্য করে নেবার জন্যে সরলা দেবীর মাতাপিতা প্রভাতকুমারকে বিলাতে পাঠাতে চাইলেন। তিনিও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন ব্যারিস্টারী শিখবার জন্যে।

এ রকম 'রোমান্‌স' বাংলা সাহিত্য-সমাজে বড় একটা ঘটে না, শহরের সাহিত্যে বৈঠকগুলি কিছুদিন পর্যন্ত সরগরম হয়ে রইল। দেখতে দেখতে তিন চার বৎসর কেটে গেল। প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু এরি মধ্যে ব্যাপারটা কি ঘটল বোঝা যায় নি, তবে সরলা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের বিবাহ আর হল না। চোখের আড়াল হলে প্রাণের আড়াল হয় বোধ করি সত্য হয়ে দাঁড়াল এই প্রবাদটাই।"[৭]

প্রভাতকুমার মাতার সম্মতি পান নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই এরূপ একটি ধারণাও প্রচলিত আছে।[৮]

বিলাত হইতে ফিরিবার পর তিনি দার্জিলিঙে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রঙ্গপুরে চলিয়া যান। ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত রঙ্গপুরে ছিলেন। সেখানে প্র্যাকটিসে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় গয়াতে চলিয়া আসেন। গয়াতে প্রায় আট বৎসর ছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। আইন শিক্ষার প্রতি প্রভাতকুমারের প্রথমাবধিই অনিচ্ছা ছিল।[৯] বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি আইন

পড়িয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় আইন ব্যবসায়েও তাঁহার মনোযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য সাধনাতেই জীবন কাটাইবেন ইহাই ছিল প্রভাতকুমারের আকৈশোর ইচ্ছা।[১০] এই ইচ্ছা সফলও হইয়াছিল। গয়াতে বাসকালেই প্রভাতকুমারের কয়েকখানি গল্প গ্রন্থ এবং উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে (১৩২২ ফাল্গুন) নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায় 'মানসী' এবং 'মর্মবাণী' পত্রিকা দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া মাসিক 'মানসী ও মর্মবাণী' রূপে প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহারই আগ্রহে প্রভাতকুমার এই নূতন পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। গয়াতে থাকিয়া পত্রিকা সম্পাদনায় অসুবিধা হওয়ায় প্রভাতকুমার কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সে যুগে শুধু পত্রিকা সম্পাদনা অথবা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে জীবিকানির্বাহের কথা কেহ ভাবিতে পারিতেন না। প্রভাতকুমারও জীবিকার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। 'মানসী ও মর্মবাণী' ১৩৩৬ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রভাতকুমার সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরকাল পত্রিকাখানি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনার পূর্বে তিনি সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'র সম্পাদনা কার্যেও কিছুদিন সহযোগিতা করিয়াছিলেন।[১১] বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'মানসী ও মর্মবাণী' একটি বিখ্যাত নাম। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র' ইত্যাদি প্রখ্যাত পত্রিকাগুলির সহিত 'মানসী ও মর্মবাণী'র তুলনা চলিতে পারে। 'বঙ্গদর্শন'এর সহিত যেরূপ বঙ্কিমের 'প্রবাসী'র সহিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'সবুজপত্রে'র সহিত প্রমথ চৌধুরীর 'মানসী ও মর্মবাণী'র সহিত তেমনই প্রভাতকুমারের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। সে যুগের যে সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত তাঁহাদের মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, দীননাথ সান্যাল, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩৩৩ সালে প্রভাতকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত হন।

২২শে চৈত্র ১৩৩৮ (৫ই এপ্রিল ১৯৩২), রাত্রি পৌনে দুইটার সময় প্রভাতকুমারের জীবনাবসান হয়।

আমাদের বংশতালিকা*

* 'রত্নদীপে'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠায় প্রভাতকুমার স্বয়ং এই 'তালিকা' লিখিয়া রাখিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমারের আবির্ভাব

বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার কাব্যসাধনার মাধ্যমে সাহিত্যপথে যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই প্রভাতকুমারের কাব্যরচনায় হাতে খড়ি হইয়াছিল। তাঁহার প্রাথমিক কাব্যরচনার পরিচয় সমসাময়িক 'দাসী', 'ভারতী' এবং 'প্রদীপ' এই পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত 'চিরনব' শীর্ষক কবিতাটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের 'সর্বপ্রথম রচনা'[১] বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'চিরনব' প্রভাতকুমারের প্রথম প্রকাশিত রচনা, কিন্তু 'সর্বপ্রথম রচনা' নয়। প্রভাতকুমার রচিত প্রথম কবিতা সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমার প্রথম কবিতা ২৬এ বৈশাখ ১২৯৬ সালে লিখিয়াছিলাম তা এই :—

কি ক্ষণে দেখিনু তোরে
হরে নিলি প্রাণ মন!
জনমে ভুলিব কিরে
সে হাসি মাখা আনন?
কেন বা হেরিনু তোরে?
কি ফল লভিনু হায়?
পুনঃ চাহি হেরিবারে
প্রাণ সদা তোরে চায়।
প্রাণ কেন চায় তোরে?
কেন ভাবি দিবা নিশি?
কেন বা মনেতে পড়ে
সে চারুবদন হাসি?
কিছু না বুঝিতে পারি,
আশাতে বাঁধিতে বুক
তোর নাম গান করি
আমার অমিত সুখ"।[২]

প্রভাতকুমার যখন পাটনা কলেজে বি, এ, ক্লাশের ছাত্র ছিলেন তখনই পত্রালাপের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন। এই সময়কার পত্রগুলি পাঠ করিলে প্রভাত-কুমারের গভীর রবীন্দ্রপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সময়ই তিনি কবি-খ্যাতি লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন এবং কবিতা রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শও চান। রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'র সম্পাদক তখন তিনি প্রভাতকুমারের 'অনুবাদ ও অনুকরণ' শীর্ষকে কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী'তেও প্রভাতকুমারের 'কবিতা হরিণী', 'বৈশাখ', 'সেকালের প্রতি', 'চন্দ্রের আক্ষেপ', 'ছবিজন্ম' এই পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রভাতকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মিলনান্ত' কবিতার পরিপূরক 'বিরহান্তে' রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কবিতা দুইটি একসঙ্গে 'ভারতী'তে (১৩০৩ ভাদ্র) প্রকাশিত হইয়াছিল।

একমাত্র 'অভিশাপ' ছাড়া প্রভাতকুমারের আর কোনও কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 'অভিশাপ', 'ভারতী'তে ১৩০৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রভাতকুমার দীর্ঘকাল কাব্যচর্চা করেন নাই। গদ্য রচনা আরম্ভ করিবার পর হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার কবিতার সংখ্যা কমিতে থাকে এবং সম্ভবত ১৩১৯ সালের পর তিনি আর কবিতা রচনা করেন নাই। কবিতা যে তাঁহার স্বক্ষেত্র নয় এবং গদ্য রচনার মাধ্যমেই যে তিনি নিজ পরিচয় দিতে পারিবেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই তাঁহার এই ভক্তকে তাঁহার সঠিক পথটি চিনিয়া লইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়াছেন—

"রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম,—'কবিতার মা বাপ নাই, যা খুশী লিখিয়া যাই, কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সে পাণ্ডিত্য আমার কই ?

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিষ হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি'। ইহার ফলে 'দাসী'তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই···।"[৩]

উপরের উদ্ধৃতিটিতে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের পত্র হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"...আপুনি আমাকে গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কি লিখিব

তাহা লিখেন নাই। সেইজন্য আমি কোন কুলকিনারা পাইতেছি না। এক গল্প লেখা তাহারই 'মা বাপ' নাই সেই এক লিখিতে পারি। তাহার ত নমুনা ঐ। কিন্তু তাই বলিয়া আপনি আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না—আমাকে মাস ছয়েক অভ্যাস করিতে দিন…" ।[৪]

ছয় মাসের মধ্যেই 'ভারতী'তে (১৩০২ অগ্রহায়ণ) প্রভাতকুমারের গদ্য রচনা 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' প্রকাশিত হইয়াছে। 'চিত্রা'র সমালোচনা (বৈশাখ ১৩০৩) পরবর্তী রচনা। অতএব 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'ই প্রভাতকুমারের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। অবশ্য এটিও প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্য রচনা নয়। 'বেনামী চিঠি' গল্পটি প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্য রচনা এবং প্রথম মৌলিক গল্প রচনা। প্রভাতকুমার অবশ্য 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পটিকে সর্বপ্রথমে লিখিত এবং প্রকাশিত গল্প বলিয়াছেন।[৫] কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্য অনবধানতাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। কারণ 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' রচনাটিকে যদি গল্পের অন্তর্ভুক্ত নাও করি তাহা হইলেও 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধির' পূর্বেই 'একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবনচরিত' (ভাদ্র ১৩০৩) প্রকাশিত হইয়াছে। 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র ১৩০৫) পূর্বোক্ত দুইটি গল্পের পরে প্রকাশিত হইলেও রচিত হইয়াছিল পূর্বে। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'সাধনা'য় প্রকাশের জন্য লেখক এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট লিখিত ১৩০২ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠে লেখা একটি পত্রে প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—"এই ডাকে, বাঙ্গলা গদ্য লেখায় আমার প্রথম উদ্যম আপনার নিকট পাঠাইলাম" ।[৬] তাহার পরবর্তী পত্রেই (২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) আবার লিখিয়াছেন—"আপনাকে আমি 'বেনামী চিঠি' নামক যে একটি গল্প পাঠাইয়াছি, তাহা পাইয়াছেন বোধ হয়" ।[৭] অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' লেখকের 'সর্বপ্রথম গল্প রচনা' নয় 'বেনামী চিঠি'ই প্রথম গল্প রচনা। স্বাভাবিক কারণেই ১৩০৪ সালের কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত 'পূজার চিঠি' গল্পটিকেও প্রথম মৌলিক গল্প রচনা এবং 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'কেও প্রথম গদ্য রচনা বলা যায় না। যদিও এযাবৎ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডঃ সুকুমার সেনও 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'কে প্রভাতকুমারের 'প্রথম গদ্য রচনা'[৮] এবং 'পূজার চিঠি'কে তাঁহার প্রথম 'মৌলিক গল্প চিত্র'[৯] বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের পত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ায় এখন প্রকৃত তথ্য জানা গিয়াছে।

যে কারণেই হউক 'বেনামী চিঠি' সাধনায় প্রকাশিত হয় নাই। পরে 'প্রদীপে' 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' এবং 'বেনামী চিঠি' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায়

গল্প দুইটির প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন।[১০] ইহাতে উৎসাহিত হইয়া প্রভাত-কুমার পূর্ণোদ্যমে গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হন।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা' প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে এবং শেষ গল্প সংকলন 'জামাতা বাবাজী' প্রকাশিত ১৩৩৮ সালে। মাঝের বৎসরগুলিতে আরও দশটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।[১১]

তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে এবং শেষ উপন্যাস 'বিদায় বাণী' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় বাকী অংশ লিখিয়া দেন এবং গ্রন্থটি ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি ছাড়া প্রভাতকুমার আরও বারোটি[১২] উপন্যাস লিখিয়াছেন।

গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস ছাড়া প্রভাতকুমার একটি নাটক এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'সূক্ষ্মলোম পরিণয়' শীর্ষক পঞ্চাঙ্ক নাটকটি কৌতুকরসের। বাঙ্গালীর সংসারের পুত্র কন্যার বিবাহ ব্যবস্থাই নাটকটির বিষয়। নাটকটির সমস্ত চরিত্র পশুর নামাঙ্কিত, কিন্তু তাহাদের অন্তরালাস্থিত মনুষ্যরূপটি চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে পশুভূমিক নাটক বোধকরি এইটিই প্রথম। জানোয়ার মোহন শর্মা—এই ছদ্মনামে নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রভাতকুমার রচিত 'চিত্রা'র[১৩] সমালোচনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সমসাময়িক সাহিত্য পাঠকদের উপর রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিচয় প্রবন্ধটিতে লভ্য। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ[১৪] পাইয়া দেশে ও বিদেশে খ্যাত হইবার বহু পূর্বেই প্রভাতকুমার যে রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থক মূল্যায়ন করিতে পারিয়াছিলেন প্রবন্ধটিতে তাহার পরিচয় আছে। তাঁহার বিলাত ভ্রমণ এবং বিলাতী অভিজ্ঞতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও মূল্যবান।

প্রভাতকুমারের গল্পের শ্রেণী বিভাগ

প্রভাতকুমার জীবনে শতাধিক গল্প রচনা করিয়াছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং গঠন কৌশলের জন্য গল্পগুলি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁহার গল্প গ্রন্থের সংখ্যা দ্বাদশ।[১] এই গ্রন্থগুলিতে মোট একশত উনিশটি গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'বঙ্কিমবাবুর কাজীর বিচার' গল্পটি প্রভাতকুমারের রচনা নয়। 'নবকথা'র ভূমিকায় লেখক সেকথা প্রকাশ করিয়াছেন।[২] ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত পাঁচটি[২ক] নূতন গল্পের মধ্যে 'ভূত না চোর', 'কাটামুণ্ড' এবং 'শাহজাদা ও ফকীর কন্যার কাহিনী' এই তিনটি গল্প যে প্রভাতকুমারের মৌলিক রচনা নয় তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন[২খ]। 'কাজীর বিচার' গল্পটিও প্রভাতকুমারের মৌলিক রচনা নয় বলিয়াই মনে হয়। 'নবকথা'র 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' এবং 'পত্রপুষ্পে' সঙ্কলিত 'সতীদাহ' এই রচনা দুইটি গল্প নয়, সত্যঘটনার বর্ণনা মাত্র। 'গহনার বাক্সে' সঙ্কলিত 'কালিদাসের বিবাহ' গল্পটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। 'বিলাসিনী' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'ভোজরাজের গল্প' বল্লালসেন (আনুমানিক ১৪শ শতাব্দী) রচিত 'ভোজ প্রবন্ধ' অবলম্বনে রচিত। 'জামাতা বাবাজী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী' এবং 'বেশ্যা খুন' রচনা দুইটিকে লেখক আইনের গল্প আখ্যা দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই দুইটিও সত্য ঘটনা অথবা জনশ্রুতির বর্ণনা মাত্র। উল্লিখিত এগারটি গল্পকে প্রভাতকুমারের মৌলিক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অতএব তাঁহার গল্প গ্রন্থগুলিতে সঙ্কলিত মৌলিক গল্পের সংখ্যা (১১৯—১১=১০৮) একশত আটটি মাত্র।

কোন গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন চারিটি গল্পের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালের কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রভাতকুমার দুইটি গল্প পাঠাইয়াছিলেন—দুইটিই ছদ্মনামে। রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে প্রেরিত গল্পটি প্রথম পুরস্কার পায় এবং শশিভূষণের ছদ্মনামে প্রেরিত গল্পটি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 'পূজার চিঠি' শীর্ষক এই দুইটি রচনাই গল্প হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়। বোধ হয় এই জন্যই লেখক এই দুইটিকে তাঁহার কোন গল্প গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। এই দুইটি ছাড়া 'গুল বেগমের আশ্চর্য গল্প' এবং 'দুধ-মা' গল্প দুইটিও কোন

গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। 'দুধ-মা' (চৈত্র ১৩৩৮) রচনার পরেই প্রভাতকুমারের মৃত্যু (চৈত্র ১৩৩৮) হয়। অতএব এই গল্পটিকে কোন সংকলনে স্থান দিবার সময় তিনি পান নাই। কিন্তু 'গুল বেগমের আশ্চর্য গল্প' কাহিনীটি 'মুসলমানী কেচ্ছা নং ৩' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩১৬ সালে। ঐ একই সময়ে 'শাহজাদা ও ফকীর কন্যার কাহিনী' এবং 'কাটামুণ্ড' গল্প দুইটি যথাক্রমে 'মুসলমানী কেচ্ছা নং ১ এবং নং ২ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১নং এবং ২নং গল্প দুইটি 'নব-কথা'য় স্থান পাইয়াছে কিন্তু ৩নং গল্পটিকে প্রভাতকুমার কোথাও স্থান দেন নাই। যাহাই হউক এই গল্পটিও প্রভাতকুমারের মৌলিক রচনা নয় বলিয়া মনে হয়।

আমরা বিশেষ করিয়া পূর্বোক্ত একশত আটটি এবং প্রভাতকুমার রচিত সর্বশেষ গল্প 'দুধ-মা'র প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

প্রভাতকুমারের গল্পে অবাঙ্গালী এবং অভারতীয় চরিত্র স্থান লাভ করিলেও তিনি প্রধানত বাঙ্গালী জীবনেরই রূপকার। বাঙ্গালী সমাজের শুধু বিশেষ একটি শ্রেণী নহে, গরীব তাঁতীর ভগ্ন কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত কেরানীর বাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল ও ধনী বঙ্গ-সন্তানের ফ্যাসনেবল ড্রইংরুম পর্যন্ত সমস্তই তাঁহার গল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির গতিবিধিও বহু বিচিত্র পথে, কখনও পল্লী গ্রামে, কখনও নগরের অভিজাত বা অনভিজাত পল্লীতে, কখনও বা বিহার, উত্তর প্রদেশ অথবা দিল্লীর শহরাঞ্চলে, আবার কখনও বা সমুদ্র পারে ব্রিটেনের মাটিতে। এই পটভূমিগত বা চরিত্রগত বৈচিত্র্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যদি ভাবগত বৈচিত্র্যের সন্ধান করিতে যাই তাহা হইলে দেখিব সেখানেও প্রভাতকুমারের ভাণ্ডার অমিত ঐশ্বর্যশালী। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার উজ্জ্বল ও মধুর প্রকাশ রহিয়াছে তাঁহার গল্পগুলিতে। শুধু যে নরনারীর প্রেম তাহাই নহে ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, সন্তানবাৎসল্য, আশ্রিতানুরাগ এবং পশুপ্রীতি তাঁহার অনেকগুলি গল্পের বিষয়বস্তু। সামাজিক সমস্যার স্পর্শও প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্পে লাগিয়াছে। যদিও লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে সমস্যার ভীষণতা পাঠকের মনকে অধিকার করিতে পারে না। লেখক অবলীলাক্রমে সমস্যার হাত এড়াইয়া গল্পের পাত্র পাত্রীকে (সেই সঙ্গে পাঠককেও) নিরাপদ তীরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে দাম্পত্য-প্রেম আছে, কুমার কুমারীর প্রেম আছে, বিধবার প্রেম আছে, পতিতার প্রেম আছে, যথাশাস্ত্র বিবাহ আছে, আবার শৈববিবাহও আছে। রসের দিক দিয়া প্রভাতকুমারের গল্পগুলিকে বিচার করিলে দেখি যে করুণ, মধুর, কৌতুক, ব্যঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন রসের গল্প তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গল্পের আসরে প্রত্যেকেরই সমান

অধিকার, তিনি কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলন, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কতকগুলি গল্প আছে। তবে তাঁহার অধিকাংশ গল্প তাহা যে বিষয়েরই হউক না কেন প্রধানত কৌতুক রসাশ্রিত। তথাপি পুর্ব আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা প্রভাতকুমারের গল্পগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। অবশ্য এখানে বলিয়া লওয়া প্রয়োজন যে উপাদান অথবা বিষয় বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে লেখকের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়া তাঁহার মনের একটি ধর্মই রূপলাভ করে অথবা বলিতে পারি যে লেখকের সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার একটি জীবনদর্শনই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রভাতকুমারের গল্পগুলির শ্রেণীবিভাগ কৃত্রিম এবং স্বেচ্ছাচারমুলক বলিয়া বোধ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের কৈফিয়ৎ এই যে নেহাৎ আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা গল্পের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লেখকের বিশিষ্ট মানসধর্মটিরও সন্ধান করিব।

গল্পের শ্রেণী বিভাগ

১। **প্রেম, প্রীতি, ভক্তি ও বাৎসল্য বিষয়ক গল্প**

ক) দাম্পত্য প্রেম : পত্নী হারা, ভুল ভাঙ্গা, শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, এক দাগ ঔষধ, নিষিদ্ধ ফল, প্রেম ও প্রহার, পুলিনবাবুর পুত্র লাভ, দাম্পত্য প্রণয়, বাপ কী বেটী, পরের চিঠি, উপন্যাস কলেজ, প্রেমের ইন্দ্রজাল, নুতন বউ, বি এ পাশ কয়েদী, রাণী অম্বালিকা, নয়ন মণি, মুক্তি।

খ) কৈশোর প্রেম : প্রণয় পরিণাম, হতাশ প্রেমিক।

গ) অস্বাভাবিক প্রেম : প্রিয়তম।

ঘ) প্রাক্ বিবাহ প্রেম : গুরুজনের কথা, আমার উপন্যাস, প্রবাসিনী, ছদ্ম নাম, ভুল, ডাগর মেয়ে, সুশোভনা, প্রজাপতির পরিহাস, অলকা, সুধার বিবাহ, সুশীলা না পিপুলা, ধর্মের কল।

ঙ) সমাজান্তর প্রেম : হিমানী, সচ্চরিত্র, মাতৃহীন, লেডি ডাক্তার, বিলাতী রোহিণী, ঘড়ি, সতী, হীরালাল, বিনোদিনীর আত্মকথা, যুবকের প্রেম, রেলে কলিসন, যোগবল বা সাইকিক ফোর্স।

চ) বন্ধু প্রেম : বাল্য বন্ধু, নীলুদা, যুগল সাহিত্যিক, কুমুদের বন্ধু, অদৃষ্ট পরীক্ষা।

ছ) ভ্রাতৃ প্রেম : ফুলের মূল্য, যজ্ঞ ভঙ্গ।

জ) সন্তান বাৎসল্য : কাশীবাসিনী, বন্য-শিশু, দুধ-মা।

ঝ) প্রভু ভক্তি : অযোধ্যার উপহার।

২। **পণ প্রথা ও কন্যাদায় বিষয়ক গল্প :** অঙ্গহীনা, সম্পাদকের কন্যাদায়, গহনার বাক্স, কুড়ানো মেয়ে, স্বর্ণ সিংহ।

৩। **ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি বিষয়ক গল্প :** বউ চুরি, খোকার কাণ্ড, প্রতিজ্ঞা পূরণ, প্রত্যাবর্তন, কানাইয়ের কীর্তি, চিরায়ুষ্মতী, দেবী, বাস্তু সাপ, দাম্পত্য প্রণয়, সারদার কীর্তি।

৪। **আপাত ভৌতিক গল্প :** ভূত না চোর, খুড়া মহাশয়, রসময়ীর রসিকতা।

৫। **স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গল্প :** উকীলের বুদ্ধি, হাতে হাতে ফল, খালাস, মাদুলী, সখের ডিটেকটিভ, পোষ্ট মাস্টার, ঘড়ি, জামাতা-বাবাজী।

৬। **প্রতারণা বিষয়ক গল্প :** অদ্বৈতবাদ, কলির মেয়ে, বিবাহের বিজ্ঞাপন, আধুনিক সন্ন্যাসী, বায়ু পরিবর্তন, পুনর্মূষিক, মাস্টার মহাশয়, ঢাকার বাঙ্গাল, বাজীকর, বেনামী চিঠি, বিষবৃক্ষের ফল, হারানো মেয়ে।

৭। **ভ্রান্তি বিষয়ক গল্প** বলবান জামাতা, এক দাগ ঔষধ, সম্পাদকের আত্মকাহিনী, হারাধন, ভুল শিক্ষার বিপদ, বিলাত ফেরতের বিপদ, বিলাসিনী, কুঙ্কুম কুমারীর গুপ্ত কথা, একালের ছেলে।

৮। **ভাষান্তর হইতে গৃহীত গল্প :** একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবন চরিত, শাহজাদা ও ফকীর কন্যার কাহিনী, ভূত না চোর, কাজীর বিচার, কাটা মুণ্ড, ভোজরাজের গল্প।

৯। **সত্য ঘটনামূলক গল্প :** দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর, সতী দাহ, মাতঙ্গিনীর কাহিনী, বেশ্যা খুন।

১০। **বিচিত্র গল্প :** ভিখারী সাহেব, আম্রতত্ত্ব, গুণীর আদর, জ্যোতিষী মহাশয়, ঔপন্যাসিক, কালিদাসের বিবাহ, পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প।

১। প্রেম, প্রীতি, ভক্তি ও বাৎসল্য বিষয়ক গল্প।

(ক) দাম্পত্য প্রেম

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'উপন্যাস কলেজ', 'নূতন বউ', 'বাপ কী বেটী' এবং 'বি এ পাশ কয়েদী' এই গল্প কয়টি ব্যতীত অবশিষ্ট গল্পগুলি কৌতুক রস-প্রধান। এই ছয়টি গল্পেই নারীর সনাতন পাতিব্রত্যধর্ম ও একনিষ্ঠতার

জয়গান করা হইয়াছে। দাম্পত্য জীবনে একনিষ্ঠতা, পারস্পরিক সহানুভূতি সর্বপ্রকার সুখের মূল। ইহার অভাবেই সংসার জীবন মরুময় হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্র সূর্যমুখী, ভ্রমর গোবিন্দলালের জীবনে এইভাবেই সর্বনাশ নামিয়া আসিয়াছিল। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পে প্রভাতকুমারও মন্তব্য করিয়াছেন—

এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া যায়"।[৩]

'বিলাসিনী' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার অভাব এবং তজ্জনিত কুফলের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক ব্রজমাধব অবশ্য শ্রীবিলাসের ন্যায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই অথবা করিতে চাহে নাই, বরং উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কুলটা সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে চাহিয়াছে এবং পরে শীতল মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ ও বিলাতে পলায়নের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বলা বাহুল্য গল্পটির প্রভাতীয় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে অর্থাৎ সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং স্বামী-স্ত্রীতে মিলন ঘটিয়াছে।

'নূতন বউ' গল্পের নির্মলা এবং 'বি এ পাশ কয়েদী'র মোক্ষদা আদর্শ হিন্দু রমণী। পূর্ব পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে কথা গোপন করিয়া নির্মলার স্বামী নির্মলাকে বিবাহ করিয়াছে একথা জানিয়াও নির্মলার মনে স্বামীর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ বা অসন্তোষ জাগে নাই। অবশ্য পূর্ব পত্নীর মৃত্যুর পরেই নির্মলা সেকথা জানিতে পারিয়াছে। মোক্ষদা স্বামীকে শুধু চোখের দেখা দেখিবার জন্যই জেলারের বাড়ীতে দাসী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। 'বাপ কী বেটী'র সুষমা তাহার রূপ, লাবণ্য, যৌবন লইয়া আজীবন মৃত স্বামীর স্মৃতি আঁকড়াইয়া থাকিল। এই তিনটি গল্পের মধ্য দিয়া নারীর পাতিব্রত্য সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'বেকসুর খালাস' গল্পটিতে সদ্গোপ জাতীয় দম্পতির পারস্পরিক প্রেমের একটি মধুর চিত্র আছে—

"তার হাতের রান্নাটি আমার যেমন মিষ্ট লাগে, কৈ আর কাহারও রান্না ত তেমন লাগে না। সে কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে আমার যে খাইয়াই সুখ হয় না।......এই সাত আট বৎসর কাল প্রতিদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া তার মুখখানি দেখিয়াছি—দিন ত এতকাল সুখেই কাটিয়াছে। কলিকাতায় প্রভাতে উঠিয়া কার মুখ দেখিব।......"[৪]

এমন শান্ত আত্মতৃপ্ত প্রেমনির্ভরতা অন্যত্র চোখে পড়ে না। গল্পটিতে একটি পতিতা কন্যার উদ্ধার কাহিনী আছে। লয়লা নাম্নী এক অসহায়া কন্যাকে তাহার পালিকা বাঈজী জনৈক দেশীয় করদ নৃপতির নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কন্যাটি শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্র মণ্ডলের সহায়তায় রক্ষা পায়। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) লিখিয়াছেন—

"একদিকে ব্রাহ্ম যুবকগণ জাতিভেদ বর্জন করিয়া মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া সমাজ হইতে বর্জিত হইলেন এবং ঘোর নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন, অপরদিকে আশ্রয় গ্রহণার্থিনী কুলীন কন্যাগণকে ও হিন্দু বিধবাদিগকে আশ্রয় দিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন·· ···একটি পলায়িতা ও আশ্রয়ার্থিনী কুলটার কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ বিচারপতির বিচারে ঐ কন্যার অভিভাবকতা তাহার মাতার হস্ত হইতে লইয়া নবকান্তবাবুর প্রতি অর্পিত হইল"।[৫]

মনে হয় অনুরূপ ঘটনা প্রভাতকুমারকে প্রেরণা দিয়াছিল। 'বেকসুর খালাস' গল্পে লয়লা পুলিশ সাহেবকে বলিতেছে—"আমি শুনিয়াছি আমাদের ন্যায় অসহায়া-স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা পাইলে সাদরে গ্রহণ করেন। আমি সেইরূপ স্থানে যাইতে চাই।"[৬] লয়লা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজে স্থান পায় এবং জনৈক উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম যুবক তাহার পাণিগ্রহণ করে। বড় বড় ঘরের কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায় না। চিরকালই তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করা হয়। এই গল্পটিতেও আমরা দেখি একজন দেশীয় করদ নৃপতি এই পতিতা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত শুনিয়া 'লাট সাহেব বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং এ ব্যাপার নাকি হাশআপ করিতে (চাপিয়া যাইতে) আদেশ দেন।'

'পত্নীহারা', 'এক দাগ ঔষধ', 'পরের চিঠি', 'পুলিনবাবুর পুত্র লাভ', 'প্রেম ও প্রহার' প্রভৃতি দাম্পত্য-জীবন ভিত্তিক গল্পগুলির কৌতুক উৎসারিত হইয়াছে প্রধানত কোন ভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়া। ছোটখাট ভ্রান্তিও কখনও কখনও মানুষের জীবনে অশান্তি ডাকিয়া আনে। অন্য কোন বাস্তবতাপ্রিয় লেখকের হাতে হয়ত এই উপাদানই করুণরসাত্মক গল্পে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু প্রভাতকুমারের হাতে তাহা কৌতুক প্রধান মিষ্ট গল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রভাতকুমারের গল্পে কৌতুক খুব অল্প আয়োজনেই জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার যুগ ছিল স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের যুগ। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে তখন হিন্দু ঘরের মেয়েদের মধ্যেও ক্রমশঃ শিক্ষার চর্চা বাড়িতেছিল। লেখা-পড়া শিখিবার ফলে মেয়েদের মধ্যে বাঙ্গলা উপন্যাস খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। উপন্যাস পাঠ ও তাহার ফলে জীবনকে উপন্যাসানুরূপ ভাবিবার মধ্যে যে কৌতুককর দিকটি রহিয়াছে তাহা প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্পে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'পরের চিঠি' গল্পের নায়িকা মণিকা কৈশোরকাল হইতে অত্যধিক উপন্যাস পাঠের ফলে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একটি উচ্চ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। "তাহার বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষ জীবনে একবার মাত্র ভালবাসিতে পারে। যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীকে ভালবাসিয়া তাহার মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা জাল ও জুয়াচুরি

মাত্র। উহাতে দেহের মিলন হয় বটে, প্রাণের মিলন ও আত্মার মিলন অসম্ভব"।[৭] এ হেন মণিকা হঠাৎ একদিন একটি বাক্সের মধ্যে এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পাইয়া সন্দেহ করিল যে বিবাহের পুর্বে তাহার স্বামী অন্য কোন রমণীকে ভালবাসিত এবং এই পত্রগুলি তাহারই লিখিত। যথারীতি মণিকা মনঃপীড়িতা হইল, কিন্তু তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে চিঠিগুলি পরের। হাসির মধ্য দিয়া স্ত্রী স্বামীকে অভিযোগ হইতে মুক্তি দিল্ল। 'বনফুল' (১৮৯৯—) রচিত 'স্ত্রী চরিত্র'[৮] গল্পটির সহিত 'পরের চিঠি'র তুলনা চলিতে পারে। গল্পটিতে গল্প উপন্যাস পাঠিকা স্ত্রী কোন পত্রিকায় স্বামীর লিখিত 'গল্প নয়' শীর্ষক একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিল যে গল্পটি যেহেতু গল্প নয় অর্থাৎ সত্য ঘটনা, অতএব তাহার স্বামীর জীবনেরই ঘটনা। স্বামী গল্পের শীর্ষকটিকে নেহাৎ রচনা কৌশল বলিয়া বুঝাইলেও স্ত্রীটি স্বামীর কৈফিয়তে ভুলিতে চাহিল না, নিজের বিশ্বাসটিই তাহার নিকট খাঁটি বলিয়া মনে হইল এবং "ঈর্ষায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল।" বনফুলের নায়িকা নারী চরিত্রের বিশিষ্ট দুর্জ্ঞেয়তাকে প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রভাত-কুমারের নায়িকা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ চরিত্র, সমগ্র নারী সমাজের কোন বিশিষ্টতার বাহন নয়। একথা প্রভাতকুমারের অধিকাংশ নায়িকা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আবার লেখকদ্বয়ের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির কথাই যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখি প্রভাতকুমারের নির্বিরোধী আত্মতৃপ্ত মনোভাব জীবনের ভুলভ্রান্তিকে কৌতুকের উপাদান হিসাবেই দেখিয়াছেন। 'বনফুল' দেখাইয়াছেন যে সেই সামান্য ভুল ভ্রান্তির মধ্যে কিভাবে ভবিষ্যৎ ট্রাজেডির বীজ লুকাইয়া থাকিতে পারে।

'এক দাগ ঔষধ', গল্পের নায়িকা সুকুমারী বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসের পাঠিকা। উপন্যাস পাঠজনিত কল্পনা-প্রবণ মন দিয়া সে স্বামীর পত্রের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। পরে স্বামীর নিকট হইতে পত্রটির প্রকৃত অর্থ জানিবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটির সমস্যার সমাপ্তি ঘটে।

'পত্নী হারা' গল্পে "স্বাধীনতা ওয়ালা" আলোকপ্রাপ্ত যুবক সুবোধ মেমসাহেবের অনুকরণে স্ত্রীকে মেম সাজাইতে চাহিয়াছিল। অপর্দানশীন বধুকে পাশে লইয়া নব্যযুবকের প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছিল তাহাই গল্পটির পটভূমিকা। প্রভাতকুমারের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল প্রকৃত হাস্য রসিকের। মানুষের প্রতিদিনকার সুখ দুঃখের জীবনের মধ্যেও তিনি হাস্যরসের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি জানেন অনেক সময়েই হাস্যরসের সৃষ্টি হয় সৃষ্টি কর্তার অজ্ঞাতসারে, তাই গল্পটির নায়ক নায়িকার পক্ষে যেটি গভীর মনস্তাপের বিষয় লেখক তাহারই মুলে অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ্য করিয়া পাঠকের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে হাসাইয়াছেন।

'প্রেম ও প্রহার' গল্পে নিম্ন শ্রেণীর এক দম্পতির কৌতুক-মধুর চিত্র পাই।

'দাম্পত্য প্রণয়' গল্পটির কাহিনী কিছু অদ্ভুত। এখানে অবশ্য গল্প পড়িতে লেখককে অনেক আয়োজন করিতে হইয়াছে। গল্পটির পটভূমি চিত্রিত করিতে গিয়া প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—

"প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর পুর্বেকার ঘটনা।......ইংরাজী না পড়ায় ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীকে তাহারা যথোচিত সম্মান করিয়া চলিত এবং কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রবণ করিলে 'হাম্বাগ' বলিয়া উড়াইয়া দিত না, "বিশ্বাস করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত"।[৯] এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীর নায়ক নায়িকার জন্মান্তর, অপ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং দৈবজ্ঞের দ্বারা প্রতারিত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখক অবশ্য নরহরি ও কুসুমকুমারীর গভীর দাম্পত্য প্রেমে চিরবিচ্ছেদ টানিয়া দিতে চাহেন নাই। তাই দৈবজ্ঞের ছদ্মাবরণ খসিয়া গেলে দম্পতি পুনরায় সুখে ঘর করিতে থাকে।

'পুলিন বাবুর পুত্রলাভ' গল্পে বন্ধ্যা স্ত্রী সুশীলা স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে পুলিনবাবু রাজী হন না। স্ত্রীকে শান্ত করিবার জন্য তিনি দৈবজ্ঞের এবং নিজ বিবাহের যে সব গুজব রটাইয়াছেন তাহা নিতান্তই কষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হয়। গল্পটির পরিসমাপ্তি অবশ্য মিলনান্তক এবং "অসম্ভবও সম্ভব হয়, বৎসর না ঘুরিতেই, কবচ ধারণের সুফল ফলিল—এই দম্পতি পুত্রলাভ করিল।" 'পুলিনবাবুর পুত্রলাভ' গল্পটির সহিত সাম্প্রতিক কালের একজন গল্প লেখকের একটি গল্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।[১০]

'নিষিদ্ধ ফল' গল্পে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের অহংবোধই গল্পের মুল সূত্র। রায় বাহাদুর তাঁহার রচিত "সামাজিক সমস্যা সমাধান" গ্রন্থে তাঁহার এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে বাল্য বিবাহ সমর্থনযোগ্য এবং স্বামী স্ত্রীর বয়স যথাক্রমে ২৪ এবং ১৬ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এই মত তিনি তাহার পুত্র এবং পুত্রবধুর উপরও চাপাইয়া দিয়াছেন। তাই পুত্র ছল চাতুরীর আশ্রয় লইয়া অবৈধ উপায়ে পত্নীর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। রায় বাহাদুর তাহার গ্রন্থে সংশোধন করিয়া স্বামী স্ত্রীর বয়স চতুর্বিংশতি কাটিয়া দ্বাবিংশতি এবং ষোড়শ কাটিয়া চতুর্দশ করিয়া দিলেন।[১১] বলা বাহুল্য তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধুর ঐ বয়সই ছিল।

পরবর্তী গল্পকারদিগের মধ্যে মনোজ বসু রচিত 'এক বিহঙ্গী' গল্পটিতে এই জাতীয় কাহিনীর অনুসরণ দেখা যায়। বিমল করের 'বালিকা বধু' গল্পেও গ্রন্থ প্রণেতা আদর্শবাদী পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

নারীর পাতিব্রত্যের প্রতি প্রভাতকুমারের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁহার বহু গল্পেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহাশ্রমের প্রতিও তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। উভয়

প্রকার শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে 'ভুল ভাঙ্গা' গল্পে। এই গল্পের নায়িকা "শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী" স্থির করিয়াছিল যে বিবাহ করিবে না এবং ধর্মালোচনায় কুমারী জীবন যাপন করিবে। কিন্তু বিবাহ করিতে হইল। ইহার কিছুদিন পরেই সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিল এবং উচ্চতর ধর্মসাধনার জন্য গুরুর সহিত সংসারও ত্যাগ করিল। কিন্তু গুরুদেব গুরুদানবে পরিণত হইলে হরিপ্রিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিল। গুরুদেবের ভণ্ডামিই কি হরিপ্রিয়ার সংসারে ফিরিবার একমাত্র কারণ? সে গুরুদেবকে জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহাই হরিপ্রিয়ার একমাত্র ভুল নয়। কারণ গুরুদেব স্বয়ং তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন "মা তুমি যে জীবন নির্বাচন করিলে তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যখন ডুব দিলে, গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রত্ন মিলিবে না। শুধু শিকারার্থী হাঙ্গর কুমীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ"।[১২] অথচ হরিপ্রিয়া গুরুরূপী হাঙ্গর কুমীরের প্রথম দংশনেই সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভুল ভাঙ্গা নামকরণের দ্বারা লেখক ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে স্বামী ও সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাধনার প্রবৃত্তিও ভুল। সেই ভুল বুঝিতে পারিয়াই হরিপ্রিয়া স্বামীর সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছে।[১৩]

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে 'ভুল ভাঙ্গা' গল্পটির কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের একটি পত্রে তাহা জানিতে পারা যায়—

"হরিপ্রিয়ার সম্বন্ধীয় গল্পটি জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে ছাপা হইতেছে। আপনার পরামর্শমত পরিবর্তনাদি করিয়া দিয়াছি।"[১৪]

দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ যে পত্রে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেখানি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রভাতকুমার অপর একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে 'ভুল ভাঙ্গা' গল্পটির যে সারাংশ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন প্রকাশিত গল্পটির সহিত তাহার কিছু পার্থক্য আছে। আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শানুযায়ী সংশোধনের ফলেই ঐ পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সারাংশে আছে "যেদিন কারণ-সুধা পানে উন্মত্ত গুরুদেব হরিপ্রিয়াকে আত্মনিবেদন করিলেন সেদিন তাঁহাকে হরিপ্রিয়ার গর্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী হইতে হইল।"[১৫] কিন্তু গল্পে গুরুদেবের কারণ-সুধা পানের কোন প্রসঙ্গ নাই।

সারাংশে আছে—"তাহার উপর নানারূপ উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। অসহ্য হইলে সে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।"[১৬]

কিন্তু গল্পে দেখি হরিপ্রিয়া স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া দাদার আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে, শ্বশুর গৃহের অত্যাচারের প্রসঙ্গ গল্পে অনুপস্থিত।

এই সংশোধনের ফলে গল্পটি সুসংহত হইয়াছে এবং লেখকের বক্তব্যের গুরুত্বও বাড়িয়াছে।

'ভুল ভাঙ্গা' গল্পে প্রভাত-মানস বঙ্কিমধর্মী। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াও অবশেষে "সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর—গৃহস্থালীর কার্যে বাসন মাজায় ও সপত্নী বশীকরণে" আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রভাতকুমার অবশ্য হরিপ্রিয়াকে অতটা পণ্ডিত করিয়া গড়েন নাই তবে স্বামী পূজাই যে নারীর শ্রেষ্ঠ পূজা তাহা বলিয়াছেন। "তোমরা আমার স্পর্ধাখানা দেখিলে? তাঁহার সেই জুতা, তাহা লইয়া পূজা না করিয়া বলিলাম কিনা, জুতা পায়ে দিয়া আস কেন!"—হরিপ্রিয়া বলিয়াছে।

প্রফুল্ল বলিয়াছিল—

"কখনও স্বামী দেখ নাই তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"[১৭] হরিপ্রিয়ার সন্ন্যাস বেশধারণ 'আনন্দমঠে'র শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শান্তিও জনৈক লুব্ধ সন্ন্যাসীকে মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বামীর আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বাংলা ছোট-গল্পের জনৈক গবেষক 'ভুল ভাঙ্গা' এবং 'দেবী' গল্প দুইটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এই দুই গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'উদ্ধার' এবং 'বোষ্টমী' গল্পের প্রভাব অনুমিত হয়।"[১৮]

প্রভাতকুমারের গল্প দুইটির প্রকাশকাল, ১৩০৬ সাল, রবীন্দ্রনাথের 'উদ্ধার' এবং 'বোষ্টমী' গল্প দুইটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৩০৭ ও ১৩২১ সাল। এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে সমালোচক এইরূপ হাস্যকর অনুমানটি করিতেন না। অবশ্য প্রভাতকুমারের উক্ত দুইটি গল্পের একটির প্লট রবীন্দ্রনাথের দান এবং অপরটিতে রবীন্দ্রনাথকৃত সংশোধন আছে তাহা আমরা যথাস্থলে আলোচনা করিয়াছি। গুরুদেব চরিত্রকে হীনরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের 'স্বর্ণলতা' এবং 'মুক্তামালা' (১৯০১) উপন্যাসে। পরবর্তীকালে রাজশেখর বসুর রচনাতেও ভণ্ডগুরুর চিত্র পাওয়া যায়।[১৯]

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকগণের খ্যাতি সমসাময়িক শিক্ষিতা মহিলা সম্প্রদায়কে গল্প উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমারের 'উপন্যাস কলেজ' গল্পের নায়িকা সুষমা এইরূপ একজন সাহিত্য-যশ-প্রার্থিনী মহিলা। অবশ্য তাহার অধ্যাপক স্বামী অবিনাশের আগ্রহই বেশী। অবিনাশ তাহার স্ত্রীর সাহিত্য প্রতিভাকে সার্থক করিয়া তুলিবার আশায় তাহাকে উপন্যাস রচনার পাঠ লইবার জন্য উপন্যাস কলেজে ভর্তি করিয়া
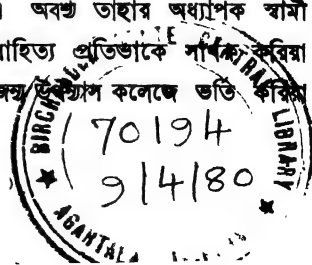
দিয়াছে। কিন্তু সেখানে তরুণ সাহিত্যিক-অধ্যাপক সরোজ সুষমার সহিত অশোভনভাবে ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিলে সুষমা কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। মহিলা ঔপন্যাসিক হওয়া আর ঘটিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুষমা যে একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই তাহার পরিচয় অন্য একটি গল্পে পাওয়া যায়।[২০]

'প্রেমের ইন্দ্রজাল' গল্পটিতে আমরা পুনরায় 'উপন্যাস কলেজে'র নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই। সুষমা 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' নামে একটি নাটক লিখিয়াছে। তাহার অধ্যাপক স্বামী ত বটেই, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দও নাটকটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া সেটি ছাপাইতে উৎসাহ দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থটি ছাপাইবার পর দেখা গেল 'ছয় মাসে মোট সতেরখানি মাত্র বহি বিক্রয় হইয়াছে'। এদিকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজারগণও নাটকটিকে মঞ্চস্থ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সুষমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইভাবে ধূলিসাৎ হইয়া গেলে সে কঠিন অসুখে পড়িল। তখন অবিনাশের অনুগত ছাত্র পঞ্চানন সুষমাকে নানারূপ মিথ্যা সংবাদ দিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিল। পরে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' অভিনয় করিয়াছে এবং সেই অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং লাটসাহেব লেখিকার স্বামী হিসাবে অবিনাশকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

গল্পটিতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এবং বাঙ্গালী পাঠকের নাটক পাঠে অনভিরুচির প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে হয়।

'নয়নমণি' সংসারত্যাগী এক যুবকের সংসারে ফিরিবার কাহিনী। সেবাব্রতধারী বিনোদ বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। হঠাৎ একদিন কাশীর রাস্তায় তাহার দুই শ্যালিকা তাহাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু বিনোদ নিজ প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া নিজেকে সুধীরচন্দ্র বসু বলিয়া পরিচয় দিল। অবশেষে শ্যালিকাদের আগ্রহাতিশয্যে বিনোদ একদিন তাহাদের বাসায় গেল। কিন্তু সেখানেও সে নিজ শ্বশুর, এমন কি নিজ পত্নীর নিকটও নিজেকে বিনোদ বলিয়া স্বীকার করিল না। এইভাবে সকলকে প্রতারণা করিয়া বিনোদ কিন্তু মনের শান্তি হারাইল এবং অবশেষে সংসারে ফিরিয়া আসিল। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ফিরিয়া আসা এবং সংসারত্যাগীর সংসারে প্রত্যাবর্তন প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই গল্পটির নায়ক বিনোদের চিন্তাধারাটিও প্রণিধানযোগ্য—

"....কেবলই মনে হয়, দীন দুঃখী ও আর্তের সেবা শুশ্রূষার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে চিরজীবন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উপায় কি করিলাম? নিজ ধর্মপত্নীকে চিরদুঃখে ডুবাইয়া আমি একি ধর্মপালন করিতে বসিয়াছি।[২১]"

গল্পের নায়কের এই চিন্তাধারার পশ্চাতে লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারাই ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়।

গল্পটির অংশবিশেষের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' (চৈত্র ১২৯৮) গল্পটির সাদৃশ্য আছে। 'মুক্তির উপায়' গল্পে ফকির সংসার ত্যাগ করিয়াছিল দজ্জাল-স্ত্রীদ্বয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, কিন্তু বিনোদ নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে মানব সেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি কৌতুক রসের এবং প্রভাতকুমারের গল্পটি কিঞ্চিৎ গুরু গম্ভীর।

'বিলাতী গল্পগুলিতে, আমাদের যুবকগণ বিলাতে যাইয়া কিভাবে জীবন যাপন করেন তাহা চিত্রিত হইয়াছে।' 'দেশী ও বিলাতী' গল্পগ্রন্থের এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। বিদেশী পটভূমিকায় গল্প রচনায় পথিকৃৎ প্রভাতকুমার স্বয়ং কিছুদিন বিলাতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁহার বিলাতী গল্পগুলিতে পাওয়া যায়। বিলাতের মাটিতে পৌঁছিয়া অনেক বঙ্গীয় যুবক যে উচ্ছৃংখলতা এবং আমোদপ্রিয়তার চূড়ান্ত পরিচয় দিত তাহার একটি সুন্দর চিত্র লেখক তাঁহার 'মুক্তি' গল্পে দিয়াছেন। গল্পের নায়ক নরেন যখন প্রথম বিলাতের মাটিতে পা দেয়, তখন তাহার চরিত্রে যে কমনীয়তা এবং আদর্শবাদিতা ছিল, ছয় মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে তাহার মুলোচ্ছেদ হইয়া গেল। যে নরেন মদ্যপানকে ঘৃণা করিত, ভারতীয় রীতি অনুযায়ী জ্যেষ্ঠের সম্মুখে ধূমপান করিত না, দেশের চিঠির জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইত, সেই নরেন নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গিনী লইয়া মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেশে অসুস্থা-স্ত্রীর সংবাদ লইবার কথা তাহার আর মনেও পড়ে না। লেখক নরেনকে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না কবিয়া উপযুক্ত সময়ে নরেনের স্ত্রীকে লণ্ডনে লইয়া আসিয়া তাহার হাতে নরেনকে সমর্পণ করিয়াছেন। ভাবখানা যেন এই যে স্ত্রীর সম্মুখে নরেনের আর কোন জারিজুরি খাটিবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রভাতকুমার ব্যভিচার এবং পাপের চিত্র বড় একটা আঁকেন নাই। তাহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কেহ কেহ বিপথে পা বাড়াইলেও অবশেষে তাহারা নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়া সৎপথে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'রাণী অম্বালিকা' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত প্রভাতকুমারের একমাত্র গল্প। গল্পটিতে মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের অন্তঃপুর অঙ্কিত হইয়াছে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রভাতকুমারের মনোভঙ্গির পরিচয় এই গল্পটিতেও পাওয়া যায়। মানসিংহের যে ছবি প্রভাতকুমার আঁকিয়াছেন তাহা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। আত্মমর্যাদা এবং আত্মসম্মানবোধহীন রাণী অম্বালিকার চরিত্রটিতেও গৌরবের কিছুই নাই। কিন্তু গল্পটিতে দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে প্রভাতকুমারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়

পাওয়া যায়। স্বামী যেমনই হউন স্ত্রীর অতিঅভিমান করিয়া সংসারে অশান্তি ডাকিয়া আনা উচিত নয়, বোধ করি প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি এইরূপই ছিল। তাঁহার 'শ্রী বিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'নূতন বউ' ইত্যাদি গল্পে এবং 'সিন্দুর কৌটা' ও 'সতীর পতি' উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাইয়াছি।

কৈশোর প্রেম

কবি গাহিয়া গিয়াছেন 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'।[২২] হিন্দু বয়েজ স্কুলের ছাত্র চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক মানিকলাল কুসুমের সহিত বাল্যকাল হইতে কত খেলা করিয়াছে, কিন্তু কখনও কোনরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। হঠাৎ একদিন স্নানান্তে গৃহ প্রত্যাগমনরতা কুসুমকে দেখিয়া মানিক হৃদয় হারাইল। কাহিনীর শেষে ডাক্তার পিতার চপেটাঘাতে মানিক শুধু যে তাহার অপহৃত হৃদয়ই ফিরিয়া পাইল তাহাই নহে, কুসুমের বিবাহদিনে বিস্তর লুচিও খাইল। সংক্ষেপে প্রভাতকুমারের 'প্রণয় পরিণাম' গল্পের বিষয়বস্তু উল্লিখিত রূপ। কৌতুক রসের অবাধ স্ফুরণে গল্পটি সার্থকসৃষ্টি। সমকালীন জনৈক দুর্মুখ সমালোচকও গল্পটির নিম্নরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন—

"সামাজিক বা সাময়িক 'সং' অতি সহজে প্রাকৃত জনের দন্তরুচি কৌমুদীর বিকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও সাহিত্যের অঙ্গীভূত বা চিরস্থায়ী হয় না। যাহা স্বভাবসঙ্গত ও মানব প্রকৃতির অনুগত, অথচ হাস্য রসের উদ্দীপক, সাহিত্যে তাহাই বরণীয়। প্রভাতবাবুর 'প্রণয় পরিণামে' সেই হাস্যরস নিপুণতার পরিচয় আছে"।[২৩]

সাহিত্যিক হাস্য কৌতুক সম্বন্ধে জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক লিখিয়াছেন—

"But the art of story-teller or the play-wright does not merely consist in concocting jokes. The difficulty lies in giving to a joke its power of suggestion i.e. in making it acceptable. And we only do accept it either because it seems to be the natural product of a particular state of mind because it is in keeping with circumstances of the cause."[২৪]

'প্রণয় পরিণাম' গল্পটির হাস্য কৌতুক অনায়াসসৃষ্ট এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। ফলে পাঠকের বিশ্বাসবোধকে তাহা কোথাও পীড়িত করে না।

'প্রণয় পরিণাম' গল্পটির ন্যায় 'হতাশ প্রেমিক' গল্পেও অতিরিক্ত কাব্য উপন্যাস পাঠে পরিপক্ক কিশোর নির্মলচন্দ্রের বাল্য প্রণয়ের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে।

'হৃদয়ের উদ্দাম প্রণয়' সহ্য করিতে না পারিয়া নির্মল তাহার বাল্যসখী শৈলজাকে

একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু সেই চিঠি শৈলজার বাবার হাতে এবং তাহার পরে নির্মলের বাবার হাতে পৌঁছিল। ফলে নির্মল বাবার নিকট কানমলা এবং মার নিকট গালি খাইল। 'প্রণয় পরিণামে'র মানিক পিতার চপেটাঘাতেই সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু নির্মলের সংশোধনের জন্য আরও গুরুতর শাস্তির প্রয়োজন ছিল। ইত্যিমধ্যে শৈলজার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে শ্বশুর ঘর করিতেছে। নির্মল মনে করে যে সে তার প্রণয়িনীকে হারাইয়াই প্রকৃত পক্ষে পাইয়াছে, কারণ—

"……লোকে যাহাকে পাওয়া বলে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে হারানো, এবং যাহাকে না পাওয়া বলে তাহাই যথার্থ পাওয়া। সেই ২২শে অগ্রহায়ণ, শ্যামবাজারের প্রবোধ গুপ্তের পরিবর্তে যদি আমার সঙ্গে শৈলজার বিবাহ হইত, তবে সেই হইত তাহাকে আমার না পাওয়া, সে এখন আমার বধু হইত বটে, কিন্তু কালক্রমে আমার পুত্র কন্যার জননী হইত এবং আমার গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যথাসময়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইত। কিন্তু তাহাকে পাই নাই বলিয়াই সে আমার হৃদয় মন্দিরে স্থির যৌবনা চিরবধু প্রেম প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিবে। এই ত যথার্থ পাওয়া। তাই বলিতেছিলাম আমি তাহাকে না পাইয়াই যথার্থ পাইয়াছি, এবং প্রবোধ গুপ্ত তাহাকে পাইয়া সম্যকরূপে হারাইয়াছে।"[২৫]

হারাইয়া পাইয়াই যদি নির্মল সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু প্রেমের তাড়নায় সে শৈলর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা যোগাড় করিয়াছে, তাহাদের বাড়ীর ঝিকে ঘুষ দিয়া শৈলকে পত্রাদি এবং বাঙ্গলা উপন্যাস পাঠাইয়াছে কারণ নির্মলের ধারণা শৈল এ বিবাহে সুখী নয়। সে ভাবে—

"আমার বড় ইচ্ছা করে শৈলজার সঙ্গে আমিও এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে অগাধ জলে একবার সাঁতার দিই এবং তাহাকে শৈ বলিয়া ডাকি। কিন্তু সাঁতার যে জানি না"।[২৬]

নির্মল কল্পনা করে যে শৈলও হয়ত তাহারই মত চিন্তা করিতেছে এবং প্রবোধের তিরস্কারে বলিতেছে—

"আমরা এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটিয়াছিলাম, তুমি ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?"[২৭]

নির্মল শৈলজাকে প্রেমতত্ত্ব শিখাইবার জন্য যে উপন্যাসগুলি পাঠাইয়াছে সেগুলির লেখকগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন—

……মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না। পরস্পরের প্রেম থাকিলে তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবলমাত্র লৌকিক বিবাহ বন্ধনই যাহাদের একমাত্র বন্ধন, তাহাদের পরস্পর সাহচর্যকে একটা অতি কদর্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনকেই তাহারা যথার্থ পবিত্র মিলন বলিয়া মনে করেন।"[২৮]

উপন্যাসের লেখকগণ আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে···“প্রেমহীন বিবাহের স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি নারী চিত্তের একটি সেকেলে অন্ধ সংস্কার মাত্র।”[২৯]

নির্মল ভাবে যে এই সমস্ত উপন্যাস পাঠ করিয়া শৈলর মন তাহার প্রতি ফিরিবে। শৈল উপন্যাসগুলি পড়িলে কি হইত বলা যায় না। কারণ ‘বিনোদিনী’ গল্পে এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে বিনোদিনীর চরিত্রে পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। কিন্তু শৈলজা নির্মলের চিঠি অথবা উপন্যাস কিছুই পড়ে নাই। সমস্ত কিছুই তাহার স্বামীর হাতে পড়িত। অতএব একদিন শৈলর স্বামীর হাতে নির্মলকে গুরুতররূপে লাঞ্ছিত হইতে হইল। বলা বাহুল্য নির্মলের প্রতি শৈলর কোন অনুরাগ ছিল না।

গল্পটি পরোক্ষ রীতিতে ডাইরির আকারে লিখিত। ফলে গল্পটি বিবৃতিমুলক হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া গল্পটিতে আধুনিক উপন্যাস লেখকদের প্রতি প্রভাতকুমারের কটাক্ষ একটু বেশী মাত্রায় প্রকট হইবার ফলে গল্পটির রসস্ফূর্তিতে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘উপবাসী’ শীর্ষক গল্পটির সহিত ‘প্রণয় পরিণামে’র আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবশ্য বিভূতিভূষণ ব্যক্তিগত আকর্ষণে ‘প্রণয় পরিণাম’ গল্পটি বহুবার পড়িয়াছেন[৩০] বলিয়া তাঁহার রচিত গল্পে প্রভাতকুমারের গল্পটির প্রভাব থাকা এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

অস্বাভাবিক প্রেম

প্রেম বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে ‘প্রিয়তম’ ভিন্ন প্রকৃতির। গল্পটিতে দুই যুবতী সখী, নব বিবাহিতা প্রিয়তমা এবং বালবিধবা তরঙ্গিনীর মধ্যে সমকামিতা (Homosexuality) বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন—“প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিনীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের, তাহাকে ঠিক সখীত্ব বলা যাইতে পারে না তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মতই আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে।” এইরূপ প্রেমসম্বন্ধ কিছুটা অস্বাভাবিক হইলেও বিরল নহে। আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা মনোবৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন “পুরুষে পুরুষে নারীতে নারীতে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় প্রীতিও বিরল নহে······প্রভাতকুমারের ‘ষোড়শী’ পুস্তকের ‘প্রিয়তম’ গল্পেও দুই সখীর মধ্যে এইরূপ প্রেমভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।”[৩১] সমকামিতাকে লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে সম্ভবত প্রভাতকুমারের পূর্বে আর কেহ গল্প লিখেন নাই। প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক সংযম ও সুরুচিবোধ গল্পটিকে যৌন বিকারের গল্পে পরিণত হইতে দেয় নাই। গল্পের শেষ অংশে গল্পের নায়িকা তরঙ্গিনীর করুণ মৃত্যুতে পাঠকের মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

প্রাক্ বিবাহ প্রেম

বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসের নায়িকারা "প্রেম করে স্বামীর সঙ্গে অথবা যার সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে তার সঙ্গে।"[৩২] ইহা অবশ্য প্রভাতকুমারের কালের কথা। সাম্প্রতিক কালে বাঙ্গলা সাহিত্যও পাশ্চাত্য সাহিত্যের মত 'মজাদার' হইয়াছে। আলোচ্য গল্পি-গুলির মধ্যে একমাত্র 'ডাগর মেয়ে' ছাড়া বাকী সবগুলিতেই প্রণয়ের পরিণামে পরিণয় ঘটিয়াছে।

এক বিবাহার্থী নব যুবক-যুবতীর সাইকেলে আরোহণ করিয়া হুগলী হইতে কলিকাতা যাত্রার কৌতুক-প্রদ বিবরণই 'গুরুজনের কথা' গল্পটির বিষয়বস্তু। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গল্পটির বিরূপ সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"প্রভার শাড়ী গাউন ঢাকিতে পারে নাই। স্বদেশী গঙ্গাজলে বিলাতী 'বোটকা' গন্ধ ধৌত করা যায় না।"[৩৩]

এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একথা স্বীকার্য যে বর্তমান নারী জাগরণের যুগেও বাঙ্গলা দেশের পথে সাইকেল আরোহিণী বঙ্গললনা দুর্লভ এবং বিবাহের দিনে পাত্রপাত্রীর একত্র সাইকেল যাত্রা প্রায় অসম্ভবের কোঠায় পৌঁছিয়াছে। ইহা লেখকের অতিমাত্রায় রোমাণ্টিক কল্পনার ফসল। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে প্রভাত-কুমার রোমান্স রসের সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন। গল্পটি কিছুটা অতিরঞ্জিত হইলেও উহার সুখপাঠ্যতা এবং রোমাণ্টিক পরিবেশ সহজেই পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে।

'আমার উপন্যাস' গল্পটিও রোমাণ্টিক মিলনান্তক কাহিনী। এখানেও কৌতুক সৃষ্টি হইয়াছে অতিরঞ্জনের ফলে। ডাক্তারী পাশ ধনী যুবক হারাধন অ্যাডভেঞ্চার লেশহীন পুর্বরাগবর্জিত বিবাহে অনিচ্ছুক। হঠাৎ তাহার জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ আসিল। সে জনৈক চাকুরে বাবুর গৃহে পাচকবৃত্তি গ্রহণ করিল এবং গৃহস্বামীর কিশোরী কন্যার প্রেমে পড়িয়া কৌতুককর ঘটনার মধ্য দিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ধনী কন্যা এবং ধনীর বধু হইয়াও ঘটনাচক্রে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেখানেই সে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। প্রভাতকুমারের নায়কও পাচকবৃত্তি করিতে আসিয়া পত্নী লাভ করিল।

'এডিনবরার' পটভূমিকায় রচিত 'প্রবাসিনী' রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প। একটি সুস্থ উজ্জ্বল কৌতুকবোধ গল্পটির বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে যাহা পাঠক-চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলে। বার্ণসের গান এবং কবিতা, রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ গল্পটিতে একটি অপূর্ব গীতিমুর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বার্ণসের রচনা এবং সুর রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত

করিয়াছিল। কবির 'কালমৃগয়া' (১২৮৯) 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮ খ্রীঃ) ইত্যাদি গীতিনাট্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রভাতকুমারও স্কচ সুর ও বার্ণসের অনুরাগী ছিলেন। তাহার 'ফুলের মুল্য' গল্পে এবং সিন্দুর-কৌটা উপন্যাসে এই অনুরাগের পরিচয় আছে।

'ভুল' গল্পটি দেশীয় খ্রীষ্টান যুবক যুবতী সরোজ রায় ও লীলা সান্যালের পারস্পরিক প্রেম ও বিবাহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। গল্পটিতে দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের পরিচয় আছে।

'সুধার বিবাহ' গল্পে সুধা রাজপুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দরিদ্র কলেজ মাষ্টারকে বরণ করিয়া প্রেমের মর্যাদা রাখিয়াছে। অবশ্য প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে ভগ্নী-ভগ্নীপতির সাহায্যে পিতামাতাকে প্রতারণা করিতে হইয়াছে। 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স' গল্পটির নায়িকাও অনুরূপভাবে পিতামাতাকে প্রতারণা করিয়া প্রেমকে সফল করিয়াছে।

'ছদ্মনাম' গল্পটিতে একসঙ্গে বন্ধুপ্রীতি ও প্রেম উভয়ই স্থান পাইয়াছে। লেখকের সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার কৌতুকপুর্ণ কিছু বিবরণ গল্পটিতে পাওয়া যায়। "অনেক লাজুক লেখক প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময় বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।"[৩৪] নূতন লেখকদের এই মানসিক দুর্বলতা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের বহু লেখকই প্রথম জীবনে এই দুর্বলতা দেখাইয়াছেন, স্বয়ং প্রভাতকুমারও ইহার ব্যতিক্রম নন।[৩৫]

'সুশোভনা' গল্পে সুশোভনা ও সুকুমারের বিবাহে বাধা ছিল সুশোভনার অজ্ঞাত কুলশীলতা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুশোভনা সুকুমারের বন্ধু অমরেন্দ্রর শৈশবে অপহৃতা ভগিনী প্রমাণিত হওয়ায় যথারীতি বিবাহের বাধা দুর হইয়া গেল। প্রভাতকুমারের পুর্বে লিখিত 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'প্রজাপতির পরিহাস' গল্পের নায়ক সুরেন্দ্র ঘোরতর পণপ্রথা-বিরোধী। কিন্তু প্রেমে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত সে পণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্রেমে পড়িবার পূর্বে, বিবাহে পণ লইয়া পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে সে অস্বীকৃত হয় এবং গৃহত্যাগ করে। কারণ যে আদর্শকে সে জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতে সে কোন মতেই বিচ্যুত হইতে পারে না। কিন্তু প্রেমে পড়িবার পর তাহার আদর্শ ভাসিয়া গেল। তখন সে মাতাকে লিখিল......"আমার পরমগুরু পিতৃদেবের মঙ্গলার্থে আমার আদর্শ আমার প্রতিজ্ঞা আমার কর্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই বলি দিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইব। "প্রতিজ্ঞাপুরণ" গল্পটিও এইরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কাহিনী।

এক প্রৌঢ় ব্যক্তির ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী 'ডাগর মেয়ে'। আধুনিক কবিদের ফ্যাসন সম্পর্কে গল্পটিতে কয়েকটি উপভোগ্য উক্তি আছে। "আজকাল পাড়াগাঁ বর্ণনা করা কবিদের ভারি ফেসান হইয়াছে কিনা, যত জেলে কলু হাড়ি-মুচির ঘরকন্নার কথা। পানাপুকুর পচাডোবা শ্যাওড়াবনের বর্ণনা কবিরা আদাজল খেয়ে বর্ণনা আরম্ভ করে দিয়েছেন।"৩৬ কাননবালা একজন আধুনিকা কবি। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার জন্য পাড়াগাঁয়ে আসিয়া সে নোট নেয় "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে একপ্রকার রঙ্গীন সূতা বাঁধা থাকে তাহাকে ঘুনসী বলে। মেয়েরা চেরা বাঁশে নির্মিত একপ্রকার লম্বা গোল (Cylindrical) পাত্রে পুকুর ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনে, ঐ পাত্রের নাম ধুচুনী, পল্লীগ্রামে তামাককে গুড়ক এবং দাড়ি কামানোকে খেউরী হওয়া বলে।"৩৭

'অলকা' গল্পের বিষয়বস্তু প্রভাতকুমারের পূর্বলিখিত গল্প 'সচ্চরিত্রে'র অনুরূপ। কলেজের ছাত্র বিনোদ তাহার ছাত্রী অলকার রূপগুণে মুগ্ধ। অতএব যখন অলকার মাতা পিতার নিকট হইতে অলকাকে বিবাহ করিবার আহ্বান আসিল তখন সে সাগ্রহে সম্মতি জানাইল। কিন্তু পরে যখন সে জানিতে পারিল যে অলকার মাতা অলকার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নয় তখন অলকার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও বিনোদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অবশ্য গল্পের শেষ অংশে সমস্ত ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়াছে এবং গল্পটি সুখকর পরিণতি লাভ করিয়াছে।

প্রভাতকুমার তাঁহার গল্প উপন্যাসে প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন নাই। কিন্তু আলোচ্য গল্পে প্রেম সঞ্চারের ক্রমবিকাশটি লঘু ভঙ্গীতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"……এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে লাগিল এবং এ বয়সে এরূপ সান্নিধ্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিনোদের প্রথমে মনে হইল, তাহার ছাত্রীর স্বভাব বড় মধুর। তারপর মনে হইল, তাহার দেহের গঠন বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি বড়ই সুন্দর, মেয়েটি যেরূপ রূপবতী, বাঙ্গালীর ঘরে সেইরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তারপর মনে হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বরটি বড় মিষ্ট। শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা করে। তারপর মনে হইতে লাগিল এ মেয়ে যাহার গৃহলক্ষ্মী হইবে তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান পুরুষ এ জগতে দুর্লভ। তাহার পর বিনোদ আবিষ্কার করিয়া বসিল, অলকাকে সে অতিশয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কেননা যতক্ষণ জাগিয়া থাকে তাহার চিন্তা এক দণ্ড মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহাকে ত চাই, নহিলে জীবনটা যে একান্ত বিস্বাদ হইয়া যাইবে। এখন উপায়? এ অবস্থা মাসখানেকের মধ্যেই উপস্থিত হইল।"৩৮

সুশীলা এবং পিপুলা যমজ ভগিনী, দুজনে দেখিতে হুবহু একরূপ। ইহারা দুজনে প্রতিবেশী বালক সুরেনের খেলার সঙ্গিনী। একদিন 'সুরোদাদা' খেলার প্রসঙ্গে উভয়কেই বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে বিবাহের বয়স হইলে সুশীলার সহিত সুরেনের বিবাহ হয়। পিপুলার অন্যত্র বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর সুশীলা এবং পিপুলা তাহাদের মাতা-পিতার সহিত বিদেশে বেড়াইতে যায়। সেখানে সুশীলার মৃত্যু হয়। সুরেন তখন গোপনে বিধবা পিপুলাকে শৈবমতে বিবাহ করে। কিন্তু এই বিবাহের ঘটনা বাহিরে গোপন রাখা হয়। সকলে জানে যে বিধবা পিপুলারই মৃত্যু ঘটিয়াছে। 'সুশীলা না পিপুলা' গল্পে এইরূপে সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

'ধর্মের কল' গল্পে সন্ন্যাসী শশিভূষণ মনোরমার প্রেমে পড়িয়া সংসারে ফিরিয়াছে। মনোরমা বালবিধবা। কিন্তু তখন বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইয়াছে। অতএব মনোরমার পিতা এবং শশিভূষণের পিতা যুক্তি করিয়া তাহাদের দুইজনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল এবং তাহারা পরম সুখে সংসার ধর্ম করিতে লাগিল। দেশে রটাইয়া দেওয়া হইল মনোরমার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। ৩৯

সমাজান্তর প্রেম

নরনারীর সমাজান্তর এবং অবৈধ প্রেম গল্পকারগণের এক প্রধান অবলম্বন। দাম্পত্য প্রেম লেখকদের নিকট বড় একটা স্থান পায় না। পূর্বরাগ ও নানা বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে নায়ক নায়িকার মিলন অথবা বাধার ফলে ব্যর্থতা পাঠকপাঠিকার চিত্তকে যতখানি আলোড়িত করে, দাম্পত্য জীবনের কলকূজন ততটা করে না। কারণ তাহার মধ্যে মাধুর্য যতই থাকুক না কেন নাটকীয়তা একেবারেই অনুপস্থিত। প্রভাতকুমারের প্রাক্ বিবাহ প্রেমের কাহিনীগুলি অধিকাংশই বিবাহের মাধ্যমে সার্থক হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সমাজান্তর প্রেমের অধিকাংশ গল্পেই মিলন সম্ভব হয় নাই। যেখানে সামাজিক বাধার ফলে বিবাহ সম্ভব ছিল না সেখানে লেখক মৃত্যুর মধ্য দিয়া নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইয়াছেন। 'হিমানী' এবং 'সতী' গল্প দুটি এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইতে পারে। বিবাহিত মণিভূষণ অধ্যাপককন্যা হিমানীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রেম বিবাহের মাধ্যমে সার্থক হইবার উপায় ছিল না। হিমানী মণিভূষণের অসুস্থা স্ত্রী নবদুর্গার শরীরে নিজ রক্তদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, বলিয়া গেল যে নবদুর্গার

সহিত আত্মার বিনিময় করিবে। হিমানীর রক্তে পুনর্জীবিত নবদুর্গার মধ্যে মণিভূষণ হিমানীকেই যেন ফিরিয়া পাইল। "এখন হইতে সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।" 'সতী' গল্পে শুধু নায়িকার নয় নায়ক নায়িকা উভয়েরই মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং মৃত্যুশয্যাই তাহাদের ফুলশয্যায় পরিণত হইয়াছে।

লণ্ডনপ্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের সহিত ইংরাজ দুহিতা মিস্, ক্যাম্বেলের অকৃত্রিম প্রেমের কাহিনী 'মাতৃহীন'[৪১]। সামাজিক বাধার ফলে তাহাদের বিবাহ হইতে পারে নাই। মিস্ ক্যাম্বেল আজীবন কুমারী থাকিয়া তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ক্যাম্বেলের চরিত্রটি ত্যাগে এবং নিষ্ঠায় দেশকালনিরপেক্ষ চরিত্র মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স' গল্পে লেখক আন্তঃ প্রাদেশিক বিবাহ ঘটাইয়াছেন, অবশ্য প্রেমের বিবাহ। কাহিনীটিতে একটি মধুর প্রতারণার মধ্য দিয়া প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে লাভ করিয়াছে। 'রেলে কলিসন' গল্পটিতেও আন্তঃ প্রাদেশিক বিবাহ ঘটিয়াছে। লেখক রেলে কলিসন রূপ ভয়াবহ ঘটনার মধ্যেও রোমান্স রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুইটি গল্পেই নায়ক নায়িকা ভিন্ন প্রদেশবাসী হইলেও তাহারা অসবর্ণ নহে। এইরূপ আন্তঃ প্রাদেশিক বিবাহের উল্লেখ 'অলকা' গল্পটিতেও আছে। সেখানেও পাত্র পাত্রী উভয়েই কায়স্থ।

'লেডি ডাক্তার'[৪২], 'বিলাতী রোহিনী' ও 'ঘড়ি' এই গল্প তিনটির নায়িকারাই এক একটি 'ঝানু' স্বামী-শিকারী। তিনটি ক্ষেত্রেই নায়কেরা হিতৈষীদের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তথাকথিত প্রেমের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতুকপূর্ণ পরিস্থিতির মাধ্যমে নায়িকাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে নায়কেরা প্রেমের ফাঁদ হইতে পরিত্রাণ পায়। 'লেডি ডাক্তার' গল্পটি সমসাময়িক কালে পাঠকমহলে কিছুটা বিরূপতার সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমার নিম্নরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন—

"সুবালাকে আমি অসচ্চরিত্রা করিয়া আঁকি নাই। আমি কেবল দেখাইয়াছি যে একটি স্বামী সংগ্রহের জন্য, ইংরাজীতে যাহাকে বলে husband hunting বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেছে। ইউরোপীয় সমাজে (অর্থাৎ যে সমাজের আংশিক অনুকরণে এই সকল সম্প্রদায় চলেন ফেরেন) ইহা কখনও পাপকার্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। তবে ইহার মধ্যে হীনতা আছে সন্দেহ নাই। একজন লেডি ডাক্তারকে আমি একটু হীনতার রঙে আঁকিয়াছি বলিয়া সকল লেডি ডাক্তারই ঐরূপ চরিত্রের একথা আমি বলিতেছি না।"[৪৩]

পরে প্রভাতকুমার অবশ্য জনৈকা সচ্চরিত্রা লেডি ডাক্তারের চিত্রও আঁকিয়াছেন 'ভুল' গল্পের নায়িকা লীলা সান্যালের চরিত্রের মাধ্যমে।

কঠিন সামাজিক সমস্যাকে অবলীলাক্রমে সহজ করিয়া দিতে প্রভাতকুমারের তুল্য লেখক বোধকরি বাঙ্গলা সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁহার 'ডোরা' গল্পটি আমাদের এই মন্তব্যের পরিপোষক। নিরঞ্জন খ্রীষ্টান নার্স ডোরাকে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল যে ডোরা তাহারই পিতার ঔরসজাত অবৈধ সন্তান অতএব সম্পর্কে তাহার ভগিনী। সঙ্গে সঙ্গেই নিরঞ্জনের মনে ভগিনী স্নেহের উদয় হইল। সে ডোরাকে নার্সের হোম হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধি করাইয়া বিলাত ফেরত সমাজে যোগ্য পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিল।

রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা পুরণ' (১৩০০) গল্পের নায়ক বিপিনও আকস্মিকভাবে জানিতে পারে যে যাহার বিরুদ্ধে সে মামলা লড়িতেছে সে তাহার পিতার মুসলমানী রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। একথা জানিয়া পিতার নির্দেশে সে মামলা তুলিয়া লইয়াছে বটে কিন্তু পিতার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু কবির লেখনীতে পিতা মহামহিমান্বিত রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

'সচ্চরিত্র' গল্পে থিয়েটার অভিনেত্রীর কন্যাকে ভালবাসিয়াছে সুরেন। সুরেন প্রভাত-কুমারের অন্যান্য নায়কের মত উপন্যাস পাঠ করিত কিনা জানা যায় না কিন্তু প্রেমে পড়িয়া তাহার পৌরুষত্ব উপন্যাসের আদর্শেই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রেমে উপন্যাস সুলভ উচ্ছ্বাস যতটা ছিল আন্তরিকতা তাহার শতাংশের একাংশ ছিল কিনা সন্দেহ। তাই সপ্তাহ পরে তাহার 'মোহ' ফিকা হইয়া আসিল এবং প্রেম ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে সংস্কারই জয়ী হইল। 'অলকা' গল্পের 'বিনোদ' চরিত্রটিও 'সুরেনের' অনুরূপ। কিন্তু বিনোদ সংস্কারকে জয় করিয়া প্রেমকে মর্যাদা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

"ষোড়শীর 'সচ্চরিত্র' এবং 'হতাশ প্রেমিকে'র 'অলকা' অনেকটা একই বিষয় লইয়া রচিত। দুইটি গল্পের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় বিশ বছরের। এই বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সংস্কারের বন্ধন কতটা শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ মিলে গল্প দুইটির বিভিন্ন পরিণামে। সচ্চরিত্রে নায়ক প্রেম উপেক্ষা করিয়া সংস্কার বজায় রাখিল, অলকায় সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া সে প্রেমের মর্যাদা স্বীকার করিল।"[৪৪]

অবশ্য গল্পের নায়ক সংস্কারকে উপেক্ষা করিলেও নায়কের স্রষ্টা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।[৪৫]

'সচ্চরিত্র' গল্পটির নামকরণে ঈষৎ ব্যঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়।

'যুবকের প্রেম', 'হীরালাল', 'বিনোদিনীর আত্মকথা' এই তিনটিই অবৈধ প্রেমের গল্প। প্রভাতকুমার যেমন খাঁটি প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন তেমনই কয়েকটি গল্পে অবৈধ বা

অসামাজিক প্রেমের চিত্রও আঁকিয়াছেন। তবে এই জাতীয় চরিত্রাঙ্কন প্রভাতকুমারের মানসিকতার অনুকূল ছিল না। তিনি সর্বত্রই জটিলতা পরিহার করিয়া চলিয়াছেন, অবৈধ প্রেমের জটিলতাও যে তাঁহার রচনায় বিশেষ স্থান পাইবে না তাহা স্বাভাবিক। তাঁহার এই শ্রেণীর কাহিনীগুলির সহজ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আধুনিক গল্প লেখক অবৈধ বা অসামাজিক প্রেমকে অবলম্বন করিয়া গল্প লিখিতে গিয়া সমাজধর্ম ও সনাতন নীতিবোধকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেন তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রভাতকুমারের সমসাময়িক লেখকগণের রচনায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রভাতকুমার যেন সযত্নে এই সনাতন মুল্যবোধকে ও সমাজব্যবস্থাকে তাঁহার গল্পে আশ্রয় দিয়াছেন।

'যুবকের প্রেম' গল্পে বিপত্নীক যুবক মহেন্দ্র মেজর গ্রীণের পত্নী এলসির সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হইবার ফলে মেজর গ্রীণ মহেন্দ্রকে খুন করিতে যান। তখন যথারীতি মহেন্দ্রর প্রেমের নেশা ছুটিয়া যায় এবং সে নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া একটি ডাগর মেয়েকে বিবাহ করে।

সমাজ ও শাস্ত্র নির্দিষ্ট রাজপথে মানুষ সব সময় তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে না। মানুষের যৌন সম্পর্ক যখন এই নির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে পরিচালিত হয় তখন অধিকাংশ সময়ই মর্মান্তিক অনুশোচনা, করুণতম ট্র্যাজেডী বা অসহায় শুন্যতাবোধ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। 'বিনোদিনীর আত্মকথা' এই ধরণের একটি গল্প। বিনোদিনী স্বামীকে ভালবাসিতে পারে নাই। কারণ বিবাহ-পুর্ব জীবনের প্রেমাস্পদ শচীন তাহার মন জুড়িয়া ছিল। অবশেষে এক আকস্মিক যোগাযোগের ফলে বিনোদিনী শচীনকে কাছে পাইল এবং স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্তন না করিয়া শচীনের সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিতে লাগিল।[৪৬] কিন্তু শচীনের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর বিনোদিনী কিভাবে ধাপে ধাপে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিতা হইয়া বারাঙ্গনা জীবনকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইল তাহাই কাহিনীটির বিষয়বস্তু। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'র সহিত কাহিনীটির অংশবিশেষের কিঞ্চিৎ মিল আছে। আধুনিক লেখকদের প্রতি গল্পটিতে কিছু কটাক্ষ আছে, লেখক সম্ভবত ইহাই বলিতে চাহেন যে স্বামী যেমনই হউক শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসন মানিয়া স্বামীর ঘর করিতে না চাহিয়া যদি কোন স্ত্রী গৃহত্যাগ করে তবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কখনও সুখের হইতে পারে না। স্বামী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নীতিবোধ এবং ধর্ম ভয়ের মুল শিথিল হইয়া যায়। অধিকতর সুখের আশায় প্রলোভনের ফাঁদে পড়িয়া সে অধিকতর দুঃখে নিমজ্জিত হয়।

'হীরালাল' গল্পটি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন—

"হীরালাল গল্পটি বোধ করি প্রভাতকুমারের একমাত্র নির্মম গল্প। এ গল্পটির

প্লট স্বচ্ছন্দে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অথবা জগদীশ গুপ্তের নির্মিত হইতে পারিত।"[৪৭]

হীরালাল ডোম নানা ধরণের ঔষধ বিক্রয় করে। একদিন গভীর রাত্রে এক অবগুণ্ঠিতা রমণী আসিয়া তাহার নিকট দুইটি শিয়াল মরিবার উপযুক্ত বিষ ক্রয় করিতে চাহিল। হীরালাল পঞ্চাশটি টাকা এবং একটি স্বর্ণবলয়ের বিনিময়ে রমণীটিকে বিষ দিল। হীরালাল পরে রমণীটিকে অনুসরণ করিয়া দেখিল যে রমণীটি গ্রামেরই জনৈক যুবক বিনোদলালের প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী নীরদা। গ্রামে নীরদার চরিত্রহীনতার কথা কানা-ঘুষায় শোনা যায়। হীরালাল ইহাও জানিতে পারিল যে বিনোদলাল তাহার স্ত্রীকে কর্মস্থলে লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই বাড়ী ফিরিবে। সে বুঝিল যে এই ব্যভিচারিণী রমণী স্বামীকে খুন করিয়া নিজ পথ নিষ্কণ্টক করিতে চায়। বিনোদ যেদিন ফিরিল সেইদিন গভীর রাত্রিতে হীরালাল নীরদাকে গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল, এবং বলিল "তোমাদের দলের লোক সেখানে ঢের আছে, তারা যেমন খায় তুমিও সেই রকম করে খাবে।" এইভাবে হীরালাল ব্যভিচারিণী নীরদাকে গ্রাম ছাড়া করিল। বলা বাহুল্য সে ব্যাপারটি অনুমান করিয়া নীরদাকে প্রকৃত বিষের পরিবর্তে গাঢ় ঘুমের ঔষধ দিয়াছিল। বিনোদলালও স্ত্রীর চরিত্র অবগত হইয়া পুনরায় বিবাহ করিল।

গল্পটির পরিণতি প্রভাতকুমারোচিত। কিন্তু নীরদা চরিত্রটির অভিনবত্বের কথা মনে রাখিলে ডঃ সেনের মন্তব্যের যথার্থতা বুঝা যায়। নীরদা চরিত্রে দৈহিক ও মানসিক সঙ্কোচহীনতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিষ্ঠুর উপায় গ্রহণে দ্বিধাহীনতা যেভাবে তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পরবর্তী বাস্তববাদী সাহিত্যিকগণের রচনাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। জনৈক আধুনিক সমালোচক সত্যই লিখিয়াছেন "পতিঘাতিনী এই শয়তান সহচরী নারী মূর্তির চরিত্র চিত্রণে প্রভাতকুমারের লেখনী ক্ষমালেশহীন।"[৪৮]

এই গল্পে লেখক নীরদার বিষ ক্রয়ের কাহিনীটি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সজ্ঞানে অনুসরণ করিয়াছেন। হীরু 'বিষবৃক্ষ' পড়ে নাই, ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া, স্ত্রীলোকটি বলিল, 'শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে। বুঝেছ। রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঘরে ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার?' বঙ্কিমচন্দ্রের হীরাও ঠিক এই একই ভাষায় বিষ বিক্রেতার নিকট বিষ চাহিয়াছিল।[৪৯] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র (১৮৮১-৮২) মঙ্গলা চরিত্রটি মনে পড়িয়া যায়।

'জামাতা বাবাজীর' অন্তর্ভুক্ত "মাতঙ্গিনীর কাহিনী" এই গল্পটির উৎস। মাতঙ্গিনী

তাহার উপপতির সাহায্যে স্বামীকে হত্যা করে, কিন্তু গ্রামের জনৈক ডোম থানায় খবর দিলে মাতঙ্গিনী ধরা পড়ে এবং তাহার দ্বীপান্তর হয়।

'রেলে কলিসন,' গল্পটিতে লেখক 'সিচুয়েশন' রচনায় অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন।

অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক অটলবিহারী কাঞ্জিলাল বোম্বাই মেলে কলিকাতা হইতে আমেদাবাদ যাইতেছিল। মাঝপথে ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়িল। ভাঙ্গা গাড়ীর স্তূপের ভিতর অটল এবং গুজরাটী ব্রাহ্মণকন্যা একত্র সমাধিস্থ হইল। তাহারা অবশ্য নিহত হয় নাই, কিন্তু গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। চারিদিক হইতে আহত নরনারীর কণ্ঠোত্থিত সমবেত আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল। এইরূপ ভয়াবহ পরিবেশে দুইটি ভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভাষাভাষী যুবক-যুবতী পরস্পরকে হৃদয় দান করিল। ব্যাপারটি ঘটিল নিম্নরূপে—

"……মানুষের মনের গতি বিচিত্র, মৃত্যুর মুখোমুখী হইয়াও তাহার এই নারী হস্তের মমতা মাখা সেবায় আমার মনে মধুর ভাবের সঞ্চার হইল। বলিলাম, 'এ জী! যদি আমরা বাঁচি, তুমি আমায় বিয়ে করবে?' বলিয়া আমি তাহার হাতখানি ধরিলাম। সে বলিল, 'আচ্ছা'।"[৫০]

এইরূপ সংক্ষিপ্ত বস্তুতান্ত্রিক প্রণয় বর্ণনা অবাস্তব বলিয়া মনে হইতে পারিত, কিন্তু লেখকের রচনা কৌশলের গুণে ঘটনাটি অবিশ্বাস্য ঠেকে না। কিন্তু গল্পে ভাষাগত একটু ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়।

অটল বাঙ্গালী এবং সরস্বতী গুজরাটী। অতএব তাহাদের সংলাপের ভাষায় হিন্দীর ব্যবহার অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু আহতা সরস্বতীর স্বতঃস্ফূর্ত কাতরোক্তির ভাষা তাহার মাতৃভাষায় হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু লেখক এইরূপ পরিস্থিতিতে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হিন্দী।

……সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আগে মাঈ গে মাঈ।" গুজরাটীতে অনুরূপ কাতরোক্তির ভাষা হওয়া উচিত ছিল—"বোই মা ওয় বাপ।"

অবশ্য ভাষাগত এই সামান্য ত্রুটিটুকু গল্পের রসগ্রহণে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

গল্পটির পটভূমিকায় আছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। প্রভাতকুমার তাহার রচিত গল্পগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যাকেই স্থান দেন নাই। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উভয় প্রকার সমস্যাকেই তিনি তাহার স্বাভাবিক কৌতুক সৃষ্টির কাজে লাগাইয়াছেন। আলোচ্য গল্পে পাঠে অমনোযোগী ছাত্রগণ কিভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের হুজুগে মাতিয়াছিল তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়—গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কাহিনীর বক্তা অটল বলিতেছে—

"বঙ্গবাসী কলেজে বি, এ, পড়িতেছিলাম, এমন সময় বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া সভাসমিতিতে ছুটাছুটি, ফেডারেশন হলের জন্য

চাঁদা সংগ্রহ, এবং স্বদেশী বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে লাগিলাম। দুই একটা সভায় বক্তৃতা করিবার পর, সুবক্তা বলিয়া কিছু খ্যাতিও অর্জন করা গেল। মনে আছে বিডন উদ্যানে এক সভা অন্তে স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুয্যে আমার পিঠ থাবড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "জিতা রও বেটা!" কে একজন, একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে "গোলামখানা" লিখিয়া সেনেট হাউসের দেওয়ালে আটকাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং অনেকের সঙ্গে আমিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মের ষাঁড় হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পড়াশুনার দিকে ঝোঁক কোনদিনই আমার ছিল না, পিতা-মাতাও জীবিত নাই যে তাড়না করিবেন। পড়িতাম শুধু ফ্যাসনের অনুরোধে, আর পাঁচজনে যাহা করে তাহা করাই উচিত বলিয়া, সে বালাই দূর হইল, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।[৫১]"

বন্ধুপ্রেম

সাধারণভাবে আমরা প্রেম প্রণয় ভালবাসাকে নরনারীর যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেম কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ভ্রাতৃ-প্রীতি, বন্ধুপ্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য, আশ্রিতানুরাগ, প্রভুভক্তি ইত্যাদি সবগুলিই প্রেমেরই বিভিন্নরূপ। রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও প্রেমের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পথে পদচারণা করিয়াছেন।

'বাল্যবন্ধু' গল্পে অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির ফলে সর্বনাশের শেষ সীমায় তলাইয়া যাওয়া বন্ধুকে তাহার বাল্যবন্ধু কিভাবে রক্ষা করিল তাহাই বলা হইয়াছে। প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের অনেককেই আমরা মদ্যপান করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু মদ্যপানের কুফল তিনি এই একটি গল্প ছাড়া আর কোথাও দেখান নাই। গল্পটিকে অনায়াসে মদ্যপান নিবারণী বিষয়ক গল্প বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মদ্যপান এবং তাহার প্রভাব বিষয়ে প্রভাতকুমারের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে তিনি একটি পত্রে কবি হেমচন্দ্রকে (১৮৩৮-১৯০৩) লিখিয়াছেন—

"P. G. Hamerton তাঁহার Intellectual Life পুস্তকে লিখিয়াছেন, সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় আঙুরের চাষ আরম্ভ হইবার পরে সে দেশের লোকের মস্তিষ্ক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। একথা Wine সম্বন্ধেই তিনি লিখিয়াছেন Spirits (হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি) সম্বন্ধে লেখেন নাই। ঐ গ্রন্থোক্ত মতবাদের উল্লেখ করিয়া আমি হেমবাবুকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি? হেমবাবু আমায় উত্তরে লিখিয়াছিলেন, এদেশের লোকের Wine এবং Spirits এর মধ্যে প্রভেদজ্ঞান নাই। সুতরাং আমার মত আমি ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।"[৫২]

'নীলুদা' গল্পে চাকুরীজীবী নিম্নবিত্ত নীলুদাকে তাহার ব্যবসায়ে কৃতী বাল্যবন্ধু সুধাংশু নিজ ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইয়া বন্ধুপ্রীতির পরিচয় দিয়াছে।

'যুগল সাহিত্যিক' গল্পে দুইটি কবিযশপ্রার্থী অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর মধ্যে একজনের সাহিত্যিক সিদ্ধি অপরের অন্তরে কিভাবে ঈর্ষার সঞ্চার করিল এবং পরিণামে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

গল্পটির অন্যতম প্রধান চরিত্র রাজেন্দ্রের যশের আকাঙ্ক্ষার কৌতুকপূর্ণ বিবরণের পশ্চাতে সমসাময়িক ব্যর্থকাম কবিদের প্রতি কিছু কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বহুবিস্তৃত হইলে অনেক ব্যর্থ কবির দল ঈর্ষাতুর হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজি প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইঁহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর, ইঁহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে রবি ঠাকুর আবার কবি।"[৫৩]

এই মন্তব্যের সাহায্যে আমরা ব্যর্থকবি রাজেন্দ্র এবং তস্য ভক্ত অধরচন্দ্রকে চিনিয়া লইতে পারি।

খ্যাতির কাঁটা যে অন্তরঙ্গতার দেওয়ালে গভীর ফাটলের সৃষ্টি করে তাহার পরিচয় রবীন্দ্র সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'নষ্টনীড়' (১৩০৮), 'দর্পহরণ' (১৩০৯) গল্প দুইটি এবং 'খ্যাতি' (১৩৩৯) কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লট লইয়া রচিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭—১৯৩৮) 'হের-ফের' (১৯১৮) উপন্যাসটির বিষয়বস্তুও অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতি' কবিতাটিতে প্রভাতকুমারের 'যুগলসাহিত্যিক' গল্পটির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

'অদৃষ্ট পরীক্ষা'ও দুই বাল্যবন্ধুর কাহিনী। পশারহীন উকীল হেমন্ত ট্রেনের কামরায় লক্ষ টাকা কুড়াইয়া পায়। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াও টাকার মালিকের সন্ধান করিতে না পারিয়া সে ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তাহার সুদ হইতে সংসার চালাইতে থাকে। ২৫ বৎসর পরের কথা। হেমন্ত এখন বড় উকীল। অপর দিকে বাল্যবন্ধু এবং জমিদার ইন্দ্রভূষণ দীর্ঘকাল অমিতাচারের ফলে মৃত্যুশয্যায়। অর্থাভাবে তাহাকে বড় বড়

মহাল বিক্রয় করিতে হইয়াছে এবং কিনিয়া লইয়াছে স্বয়ং হেমন্ত। অন্তিম অবস্থা বুঝিয়া ইন্দ্রভূষণ হেমন্তকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহার নিকট নিজের এক প্রবঞ্চনার ইতিহাস ব্যক্ত করিল। প্রকাশ পাইল যে ইন্দ্রভূষণ নিজের এবং হেমন্তর নামে লটারির টিকিট কিনিয়াছিল, তাহাতে হেমন্তের ভাগ্যে লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। ঈর্ষাকাতর ইন্দ্রভূষণ হেমন্তর সই জাল করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সেই টাকা ট্রেনে ফেলিয়া আসে। বলা বাহুল্য এই টাকাই হেমন্ত কুড়াইয়া পাইয়াছিল। দুই বন্ধু নিজ নিজ কাহিনী অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়া মানসিক মুক্তি পাইল। গল্পটিতে অনেক গোঁজামিল আছে। হেমন্ত বিখ্যাত ইংরাজী কাগজে ছয়দিন বিজ্ঞাপন দিয়াছে কিন্তু তাহা ইন্দ্রভূষণের নজরে পড়ে নাই। ইন্দ্রভূষণ হেমন্তের বাল্যবন্ধু কিন্তু হেমন্ত লক্ষ টাকা কুড়াইয়া পাইবার কথা তাহাকে বলে নাই। গোপন করার ইচ্ছা যে তাহার ছিল না তাহা বিজ্ঞাপন দেওয়াতেই বুঝা যায়। এই ত্রুটিগুলি গল্পটির রসপরিণতিতে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রভাতকুমারের বন্ধুপ্রেমের গল্পগুলির মধ্যে 'কুমুদের বন্ধু' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটিতে খাঁটি এবং আত্মবোধশূন্য প্রেমের একটি সুমধুর চিত্র পাই। বিদেশিনী এথেল এবং প্রবাসী বাঙ্গালী যুবক কুমুদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কাহিনী 'কুমুদের বন্ধু'। এথেল এবং কুমুদের ঘনিষ্ঠতা কতদুর অগ্রসর হইয়াছিল লেখক অবশ্য তাহা বলেন নাই। গল্পটিতে প্রেমিক প্রেমিকাভাব অপেক্ষা বন্ধুভাবই অধিকতর পরিস্ফুট এবং প্রেম প্রীতি ভালবাসা যে স্বদেশ স্বজাতি বা স্ববর্ণের উপর নির্ভর করে না এবং তাহা সর্বব্যাপী, যে কোন অবলম্বন পাইলেই তাহা দুকূল প্লাবিনীর বেগে প্রবাহিত হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুমুদের বিদেশিনী বন্ধু এথেল।

দেশীয় যুবক যুবতীর বন্ধুত্ব প্রভাতকুমার আঁকেন নাই কারণ আমাদের দেশে তাহা সম্ভব নয়। আমরা পুরুষ এবং নারীকে ঘি এবং আগুনের সহিত উপমা দিয়া সভয়ে উভয়কে পৃথক থাকিতে নির্দেশ দিই অতএব বন্ধুত্বের অবকাশ কোথায়? প্রভাতকুমারের একটি চরিত্র তাই বলে—

……স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব ফন্ধুত্ব আমি বুঝিনে। চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোক জানত? ঘি আর আগুন। ওসব সাহেবিয়ানা ছেড়ে দাও।"[৫৪]

প্রভাতকুমারের বন্ধু-প্রেম বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গল্প-গুলিতে বাল্যবন্ধুরা সমবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত আচরণ করিয়াছে, একজন অপর জনকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। নলিনী বিপিনকে (বাল্যবন্ধু), সুধাংশু নীলমণিকে (নীলুদা), হেমন্ত ইন্দ্রভূষণকে (অদৃষ্ট পরীক্ষা) দাদা বলিয়া সম্বোধন

করিয়াছে, যদিও তাহারা সতীর্থ এবং সমবয়স্ক। 'যুগল সাহিত্যিক' গল্পের রাজেন্দ্র 'বড় ভাই ও ছোট ভাই' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনকড়িকে বলে "আমরা দুই ভাই। বড় ভাই যেখানে, ছোট ভাই সেখানে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'সতীর পতি' উপন্যাসে বিপিন ও বন্ধু হীরালালকে 'দাদা' সম্বোধন করিয়াছে। এস্থলে আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—বন্ধুদের মধ্যে এক পক্ষ ধনী অপর পক্ষ নির্ধন। ফলে গল্পগুলির মধ্যে কোথাও প্রকৃত বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠে নাই, বরং উপকারী এবং উপকৃতের ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র কুমুদের বন্ধু গল্পটিতেই আমরা প্রকৃত বন্ধুত্বের আস্বাদ পাই।

ভ্রাতৃপ্রেম

ভ্রাতৃপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া প্রভাতকুমারের একটি সার্থক গল্প 'ফুলের মূল্য'। পারিবারিক স্নেহ প্রীতি ভালবাসার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা গল্পটিতে পাই। 'ফুলের মূল্যে'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিকে স্মরণ করা যাইতে পারে। উভয় গল্পে কাহিনীগত কোন সাদৃশ্য অবশ্য নাই, কিন্তু লেখকদ্বয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনার স্পর্শে দুইটি গল্পই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'র বিষয় পিতৃস্নেহ এবং 'ফুলের মূল্য' গল্পের বিষয় ভ্রাতৃস্নেহ। মিনির পিতা কাবুলিওয়ালাকে টাকা দিয়া দেশে ফিরিয়া তাহার কন্যার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই টাকা দান করিবার ফলে তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহের উৎসব সমারোহের দুই একটি অঙ্গ ছাঁটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ত্যাগ শুধু মিনির পিতৃগৃহ নহে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যকে পিতৃস্নেহের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। 'ফুলের মূল্য' গল্পটিও হৃদয়ধর্মের অনুরূপ অপরূপ আলেখ্য। বিদেশে মৃত ভ্রাতার কবরে ফুল দিবার জন্য গল্প বক্তার হাতে ম্যাগি তাহার একটি কষ্টার্জিত শিলিং বাহির করিয়া দিয়াছে। বক্তা অনায়াসে সেই শিলিংটি ফেরৎ দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন—

"এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে শ্রম লব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য, সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া লাভ কি?"[৫৫]

ভ্রাতৃস্নেহকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি গল্প আছে, যেমন 'দানপ্রতিদান' (১২৯৯), 'দিদি' (১৩০১), 'পণরক্ষা' (১৩১৮) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রাতৃপ্রেমকে টাকা পয়সার মাধ্যমে যাচাই করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বার্থ ও ভ্রাতৃপ্রেমের

দ্বন্দ্বে ভ্রাতৃপ্রেমকে জয়ী করিয়াছেন। কিন্তু 'ফুলের মূল্যে' এরূপ আপেক্ষিক যাচাই প্রচেষ্টা নাই। গল্পটি একটি নিটোল মুক্তার মত, সুকুমার গীতিধ্বনির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পটিকে অনায়াসে প্রভাতকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলা যায়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠের ভক্তি ভালবাসা এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞের অন্তঃসারশূন্যতা 'যজ্ঞভঙ্গ' গল্পটিতে স্থান পাইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশের জন্য তান্ত্রিকের সাহায্যে যজ্ঞ করিতেছেন জানিয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাতৃভক্তি বিন্দুমাত্র টলে নাই। এরূপ ভ্রাতৃভক্তি দুর্লভ। গল্পের শেষে অবশ্য দুই ভাইয়ে মিলন ঘটাইয়াছেন লেখক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রনাথের চরিত্রটির নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা অতিরঞ্জিত—ফলে চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই। বঙ্কুবাবুর চরিত্রটি অত্যন্ত সজীব। তান্ত্রিক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভণ্ডের সাক্ষাৎ প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্প উপন্যাসেও পাওয়া যায়।

সন্তান বাৎসল্য

সন্তান বাৎসল্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত 'কাশীবাসিনী' প্রভাতকুমারের একটি উৎকৃষ্ট গল্প। যৌবনে প্রকৃতির তাড়নায় পদস্খলিতা বিধবা হয়ত পতিতাজীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহার হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা সমাজ সংসারের আরও পাঁচজন গৃহস্থ নারীর অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। কাশীবাসিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়া এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। কাহিনীর শেষাংশে পদস্খলিতা মাতার অনুশোচনা, কন্যার দ্বিধা এবং প্রবল আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি অল্প আয়োজনে—লেখককে মোটেই বাগাড়ম্বরের সৃষ্টি করিতে হয় নাই।

"মালতীর একবার একটু একটু কান্না পাইতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়া ও ইঁহার প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'কেন তুমি জানালে তুমি কে' ?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল এ মা ! নাই দেখতাম।[৫৬]

উদ্ধৃত অংশে ভাবাবেগ প্রকাশে সংযত এবং সুসংহত ভাষার এরূপ প্রয়োগদৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মাতৃস্নেহের বিকৃত রূপ পাই 'বন্যশিশু' গল্পে। কুমুদনাথ এবং তাহার স্ত্রী সিমলার তারাদেবী পাহাড়ে পরিত্যক্ত একটি বন্যশিশুকে দয়ার বশবর্তী হইয়া গৃহে লইয়া আসেন,

কিন্তু কয়েকদিন পরেই শিশুটি মারা যায়। শিশুটি জনৈকা পার্বত্য রমণীর সন্তান। রমণীটির ধারণা জন্মিল যে কুমুদনাথ মারিয়া ফেলিবার জন্যই তাহার শিশুটিকে পাহাড় হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাই সে প্রতিশোধ লইবার জন্য কুমুদনাথের একমাত্র শিশুসন্তানটিকেও হত্যা করিয়া গেল। গল্পটিকে আমরা বাৎসল্য রসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে গল্পটি ভয়ানক রসের। গল্প হিসাবে 'বন্যশিশু' উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সরলবুদ্ধি পার্বত্যরমণী ভুল ধারণার ফলে বন্য পশুর মত যেভাবে তাহার নির্বোধ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছে এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ দম্পতি যেভাবে অকারণ ভয়াবহ শাস্তিলাভ করিয়াছে, প্রভাতকুমারের গল্পে তাহা অভিনব বলিয়াই গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

গল্পটি 'ভারতী'তে বাহির হইলে "দার্জিলিঙে কোনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী তাহা পড়িয়া এতদুর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ছেলে মেয়ের জন্য যে লেপ্‌চা আয়া ছিল তাহাকে তিনি বিদায় করিয়া দেন।"[৫৭]

'দুধ-মা' গল্পে ব্যভিচারিণী মাতার সন্তান বাৎসল্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়। যৌন সম্পর্কের জটিলতা প্রভাতকুমারের গল্পে বিশেষ স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ গল্প 'দুধ-মা' ব্যভিচারের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

আয়া ফুলটুসিয়া এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীর পুত্র জোসেফের অবৈধ সংসর্গের ফলে একটি সন্তানের জন্ম হয়। তাহারা সেই সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে নিঃসন্তান ডাক্তার ভাদুড়ীর বাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসে। ডাক্তারের স্ত্রী বিভাবতী শিশুটিকে পালন করিতে ইচ্ছুক হন। স্তন্যদান এবং পরিচর্যার জন্য ফুলটুসিয়া 'দুধ-মা' নিযুক্ত হয়। কিন্তু 'খোকা'র নামকরণ লইয়া সমস্যা দেখা দেয়। খোকার নাম 'থিওডোর' রাখিতে বলেন পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী। বিভাবতী কৌতুক করিয়া বলেন যে পুলিশ তদন্তে যদি প্রকাশ পায় যে খোকা মুসলমান তাহা হইলে তাহার নাম 'খোদাবকস' রাখা হইবে। সমস্যা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কারণ দু বছর সাত মাস বয়সে খোকা বসন্ত রোগে মারা গেল। তখন জানা গেল খোকার প্রকৃত পরিচয়। খ্রীষ্টান ধর্মানুযায়ী খোকাকে কবর দেওয়া হইল।

অসামাজিক যৌনমিলন অথবা ব্যভিচারের চিত্র প্রভাতকুমার বড় বেশী চিত্রিত করেন নাই। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রুচিবোধ এইরূপ চিত্রাঙ্কনের বিরুদ্ধ ছিল। প্রভাতকুমারের মৃত্যুর পর 'মাসিক বসুমতী'র মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"......প্রভাতকুমারের রচনা জাহ্নবী ধারার ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্র। সামান্য অশ্লীলতার ইঙ্গিতও তাঁহার বিপুল সাহিত্য সম্পদের মধ্যে নাই। দেবী ভারতীর পূজা প্রাঙ্গণে অমেধ্য ও অস্পৃশ্য বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই, ইহা প্রভাতকুমার জানিতেন, বিশ্বাস করিতেন এবং

বলিতেন। তিনি দেবীর চরণে শুধু চন্দনসিক্ত সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বপত্রই নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।......"[৫৮]

প্রভুভক্তি

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় গৃহভৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অন্তত কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত যেমন সমাজে তেমনই গল্প উপন্যাসেও প্রভুভক্ত হিতৈষী গৃহ ভৃত্যদের দেখা পাওয়া যাইত। সন্দেহ নাই আরও বহু জিনিষের মত এই শ্রেণীর ভৃত্যরাও ক্রমশ সমাজ হইতে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। প্রভাতকুমার 'অযোধ্যার উপহার' গল্পটিতে এইরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যের একটি মনোরম চরিত্র আঁকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গৃহভৃত্যের অপূর্ব আলেখ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় এবং 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১২৯৮) গল্পে। তাঁহার সৃষ্ট কেষ্টা এবং রাইচরণ বাঙ্গালী পাঠকের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়াছে। প্রভাতকুমারের অযোধ্যাও পাঠকের সহিত চিরন্তন আত্মীয়তা দাবী করিতে পারে।

অযোধ্যার সহিত খুকীর সংলাপের অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' (১২৯৯) গল্পের মিনি ও কাবুলিওয়ালার সংলাপ স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রভাতকুমারের 'ডোরা' গল্পে গৃহভৃত্য রামকৃষ্ণের চরিত্রটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পশুপ্রীতি

'আদরিণী' গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। লেখকের স্বীকৃতি উদ্ধৃত করি—

"আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে ক্বচিৎ কখনও বাস্তব জীবনের দুই একটি ঘটনা থাকে বটে। কেবল 'আদরিণী' গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চৌদ্দ আনা সত্য। গল্পে এত সত্য ঘটনা আর কখনও লিপিবদ্ধ করি নাই।"[৫৯]

জয়রাম মুখোপাধ্যায় যৌবনে হাতী কিনিয়াছিলেন অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য। আদরিণী সেই হাতীটিরই নাম। আদরিণী যেন জয়রামেরই পৌরুষদৃপ্ত চরিত্রের প্রতীক। অথচ জীবনের পড়ন্ত বেলায় অর্থের প্রয়োজনে আদরিণীকে বিক্রয় করিবার জন্য হাটে পাঠাইতে তিনি বাধ্য হইলেন। যৌবনের তেজ, অহঙ্কার, অর্থের প্রাচুর্য একে একে সবই গিয়াছিল, বাকী ছিল প্রাণ, আদরিণীর মৃত্যুর পর তাহাও গেল।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির সহিত 'আদরিণী'র তুলনা অনেকেই করিয়াছেন। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"বলদ মহেশের চাইতে হস্তিনী আদরিণী আয়তনে অনেক বিশাল হলেও শরৎচন্দ্রের

গল্পের ট্রাজিক বিশালতা তার মধ্যে পাওয়া যায় না। আদরিণীর ক্ষেত্রটি ছোট তার বেদনাও সংকীর্ণ।"৬০ সমালোচকের এই মন্তব্য অসার্থক নয়। কিন্তু প্রভাত এবং শরৎ এই দুই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই গল্প দুটির ভিন্ন রস পরিণতি ঘটাইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অতএব আদরিণীতে মহেশের ট্রাজিক মহিমার অভাব তুলনায় গল্পটির নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে না। 'মহেশ' গল্পটিতে মহেশের অসহায় মৃত্যুতে পাঠক দরিদ্র জনগণের প্রতি তীব্র সহানুভূতি অনুভব করে এবং ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার মন বিদ্দিষ্ট হইয়া উঠে। সমাজ সচেতন শিল্পী শরৎচন্দ্র মহেশ চরিত্রটির মাধ্যমে শোষক এবং শোষিত শ্রেণীর নগ্নচিত্র আঁকিয়াছেন, মহেশ সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। পারিবারিক জীবনের শিল্পী প্রভাতকুমার আদরিণীকে পরিবারের একজন করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহার করুণ মৃত্যুতে পাঠকের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে। এখানে আদরিণীই লক্ষ্য।

হাতীকে লইয়া 'গণেশ জননী' শীর্ষক সুন্দর একটি গল্প লিখিয়াছেন বনফুল (১৮৯৯—)। এটিও পারিবারিক ভালবাসার কাহিনী। পরবর্তীকালে আরও অনেকে পশুচরিত্র লইয়া গল্প লিখিয়াছেন। কিন্তু পথিকৃৎ প্রভাতকুমার। 'কুকুরছানা' গল্পটি লণ্ডনের পটভূমিতে লিখিত। ইংরাজ জাতির কুকুরপ্রীতির কথা সুবিদিত। শরৎ রীজেণ্টস পার্কে একটি কুকুর ছানা কুড়াইয়া পাইয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। পরের দিনই এক বাণ্ডিল চিঠি শরতের নিকট আসিয়া পৌছিল। কিন্তু কুকুরটির প্রকৃত মালিকের হদিশ মিলিল না। অবশেষে সেই রীজেণ্টস পার্কেই পাঁচ মাস পরে কুকুরটির প্রকৃত অধিকারিণী তাহার কুকুরটিকে চিনিতে পারিল এবং শরতের অনুমতি লইয়া কুকুরটিকে ফেরৎ লইয়া গেল। এই পাঁচ মাসে শরৎ টোবির সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়াছে। টোবিও তাহার খুব অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভদ্রতার অনুরোধে টোবিকে বিদায় দিতেই হইল। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া টোবি এবং শরৎ উভয়েই নিদারুণ কষ্ট পাইতে লাগিল। শরৎ কল্পনায় দেখিল টোবি কাঁদিতেছে সঙ্গে সঙ্গে তাহারও চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অবশেষে একদিন টোবি শিকল ছিঁড়িয়া তাহার পুরাতন বন্ধুর নিকট ফিরিয়া আসিল। সেদিন অবধি শরৎ টোবিকে আর রীজেণ্টস পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায় নাই। হাইড পার্কে গিয়াছে, কেনসিংটন পার্কে, কিউ বাগানে কুকুরকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে কিন্তু রীজেণ্টস পার্কের মাটী আর মাড়ায় নাই। গল্পটিতে পশু আর মানুষের সখ্য বন্ধনের সুন্দর মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রভাতকুমারের 'সত্যবালা' উপন্যাসেও কুকুর প্রেমিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উপন্যাসের নায়ক তাহার পালিত কুকুরটির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে লেখক সেই দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়াছেন—

"টমির ঝুড়ির নিকট হাঁটু গাড়িয়া তাহার গা চাপড়াইয়া সজল নয়নে কিশোরী বলিল, 'টমি এখন চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, আর তুই বেঁচে থাকিস, তবে হয়তো একদিন আবার দুজনে দেখা হবে। নইলে এই পর্যন্ত। যাহোক, তোকে বেশ ভাল আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি, তুই কোনও কষ্ট পাবিনে। এখন বিদায়।'—বলিয়া কিশোরী ঝুঁকিয়া কুকুরের মুখে চুমো খাইল, তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া টমির গাত্র-লোম আর্দ্র করিয়া দিল।"[৬২] আধুনিক গল্প লেখক 'বনফুলে'র রচনাতেও কুকুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।[৬৩] প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের কুকুর প্রীতির কথাও উল্লেখ করিতে পারা যায়।[৬৪]

পণপ্রথা ও কন্যাদায় বিষয়ক গল্প

'অঙ্গহীনা' গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের কন্যাবিবাহ সমস্যার একটি চিত্র পাওয়া যায়। শ্যামাচরণবাবু জমিদার পুত্র মোহিনীর সহিত তাঁহার কন্যা শৈলবালার বিবাহ দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু পাত্রপক্ষের সর্বমোট তিন হাজার টাকা দাবী মিটাইতেও তিনি অক্ষম। অতএব সে আশা তাঁহাকে ছাড়িতে হইল। অবশেষে একটি দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের সহিত শৈলবালার বিবাহ স্থির হইল। কিন্তু কন্যা অঙ্গহীনা এই অভিযোগে বিবাহের রাত্রে বর পলাইয়া গেলে মোহিনী শৈলবালাকে বিবাহ করে। মোহিনীর পিতা পরে এ কথা জানিতে পারিয়া বধুকে সাদরে গ্রহণ করেন।

গল্পটিতে পণপ্রথার এবং কন্যাবিবাহ সমস্যার ভীষণতা সৃষ্টির যে সুযোগ ছিল লেখক তাহা পরিহার করিয়াছেন, ফলে গল্পটির বাস্তবতা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছে। বাংলা দেশ পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে অনেক কন্যার পিতাকেই বলি দিয়াছে। এই সমস্যা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্প দুটি পণপ্রথাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। বিশেষ করিয়া 'দেনা পাওনা' গল্পে পাত্রের পিতার অর্থগৃধ্নু রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অঙ্গহীনা'র রায় মহাশয়কেও অনুরূপ রঙ্গে রঞ্জিত করিবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু লেখক সেদিক দিয়া যান নাই।

'অঙ্গহীনা' গল্পটির পিছনে একটি বাস্তব ঘটনা আছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম কন্যা সুরবালা যখন পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা সেই সময় একদিন একটি ঘটির উপর হাত রাখিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ দোতলার কার্নিসের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া তাহার হাতের উপর পড়ে। ফলে তাহার দুইটি অঙ্গুলির দুইটি পর্ব কাটিয়া যায়। প্রভাতকুমার এই ঘটনাটিকে তাঁহার কাহিনীতে ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের জীবনীকার লিখিয়াছেন, "বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার

'অঙ্গহীনা' নামক গল্পের নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই গল্পের অন্যান্য ঘটনা তাঁহার কল্পনা প্রসূত।"৬৫

'গহনার বাক্স' গল্পে উদারতা দেখাইয়াছেন পাত্রের মা। এক হাজার টাকার জন্যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া তিনি নিজেই টাকাটা আনিয়া মেয়ের মায়ের হাতে দিয়া বলিয়াছেন—

"এ কি কম আপশোষ যে হাজার টাকার জন্য এমন বউটি আমি হারাব? তাই ও টাকাটা আমি সঙ্গে করেই এনেছি, এই নাও ক'খানা নোট। আমার টাকা তুমি আমাকেই দেবে, তুমি ত আর নিচ্চ না। তুমি মনে কিছু 'কিন্তু' কোর না ভাই।"৬৬

সাবজজ গৃহিণীর চরিত্রটি অত্যন্ত মধুর। লেখক চরিত্রটির সংলাপের মধ্য দিয়াই তাহার চরিত্রের সারল্য এবং মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'একালের ছেলে'৬৭ গল্পে উদার হৃদয় পাত্রের পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'কুড়ানো মেয়ে' এবং 'স্বর্ণ সিংহ' এই দুইটি গল্পেই এক একটি অর্থগৃধ্নু বৃদ্ধের চরিত্র আছে। 'কুড়ানো মেয়ে'তে সীতানাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'স্বর্ণ সিংহে' বাবু জোয়ালাপ্রসাদ —দুইটি চরিত্রই লেখকের চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কনিষ্ঠ পুত্রবধুর মৃত্যুর পর বৈবাহিককে পীড়ন করিয়া মৃতা বধুর গহনাগুলি আদায় করিয়া ফিরিবার পথে সীতানাথের নৌকাডুবি হইল। জনৈক ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বাঁচাইলেন বটে কিন্তু গহনা ফেরৎ দিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তাহলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে, পুরস্কার স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে।"

'স্বর্ণ সিংহ' গল্পটির কন্যাদায় অবশ্য বাঙ্গালী সমাজের নয়—বিহারী-সমাজের। সেখানেও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ যতদিন না জানিয়াছেন যে তাঁহার পুত্রের মনোনীতার ঘরে ত্রিশ সের ওজনের একটি সোনার সিংহ আছে ততদিন পুত্রের বিবাহে তিনি মত দেন নাই।

গল্প দুটিতে শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হইয়া গেলেও অর্থলোভী বৃদ্ধদ্বয় ফাঁকিতে পড়িয়াছেন। সীতানাথ গহনা ফিরিয়া পান নাই কারণ গহনা নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিল। ভূধর মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। বাবু জোয়ালাপ্রসাদ পুত্রের বিবাহের পর যৌতুক প্রাপ্ত স্বর্ণ কেশরীটিকে গলাইয়া মাত্র দুই শত টাকার সোনা পাইয়াছেন। কারণ সিংহটির অধিকাংশ পিতল নির্মিত।

এ পর্যন্ত যে কয়েকটি গল্প আলোচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র 'স্বর্ণ সিংহ' ছাড়া অন্য সব কয়টি গল্পে কন্যার পিতা দরিদ্র অন্ততঃ কন্যার বিবাহে উপযুক্ত অর্থ ব্যয়

করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। 'সুধার বিবাহ' গল্পে সুধার পিতা কিন্তু রীতিমত বিত্তশালী ব্যক্তি। কন্যার মনোনীত ১৫০ টাকা মাসিক বেতনের কলেজ মাস্টার অতুলের হাতে কন্যাদান করিতে তিনি নারাজ। কারণ আজন্ম প্রাচুর্যে প্রতিপালিতা সুধা দরিদ্রের ঘরে কষ্ট পাইবে। অবশেষে অবশ্য অতুলের সহিতই সুধার বিবাহ হইয়াছে।

ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি বিষয়ক গল্প

ধর্মীয় সংস্কার মানুষের মনে অনেক সময় এমন দৃঢ়মুল বিস্তার করে, এমনভাবে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া সমগ্র মনকে অধিকার করিয়া বসে যে ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, সমস্ত বোধই তাহার নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় সংস্কার, তাহার ঔচিত্যবোধ হইয়া উঠে সংস্কার ভিত্তিক। অথচ মানুষের যা সত্যকার ধর্ম হওয়া উচিত তাহার সহিত এই সংস্কারবদ্ধ ধর্মবোধের বিরাট পার্থক্য। সত্যকার ধর্ম মানুষকে ভালবাসিতে শেখায় মানুষকে সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে শেখায়। আর সংস্কারবদ্ধ ধর্মবোধ মানুষকে এক সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করে। প্রভাতকুমার তথাকথিত এই ধর্মবোধকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহার 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে। তিনি এই গল্পে আক্রমণ চালাইয়াছেন হিন্দু এবং খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এই ধর্মীয় ভণ্ডামি তাঁহার নিকট এতদুর অসহ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে যে তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-বোধকে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

রামনিধি রজক বলিয়া তাহার সহপাঠীরা তাহাকে 'মেসের বাসা' হইতে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। হিন্দু ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া রামনিধি ভাবিল সে খ্রীষ্ট ধর্মের উদার ছত্রছায়াতলে আশ্রয় লইবে। কিন্তু খ্রীষ্টান সমাজের সম্পর্কেও তাহার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হইল। তাহার ধারণা ছিল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই খ্রীষ্টধর্মে সমান। কিন্তু পুঁথিগত ধর্মে যাহাই থাক বাস্তবে রামনিধি দেখিল সাদা খ্রীষ্টান এবং কালো খ্রীষ্টানের পৃথক গোরস্থান। তখন তাহার মনে হইল 'যীশুখ্রীষ্ট যদি আজ সহসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে নিজ শিষ্যগণের আচরণ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া যান।'[৬৮] খ্রীষ্টান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজও চরম অনুদার। ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তির মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ অনুদারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"হাজারই বড়লোক হও, তোমরা সেই ধোপাই ত বটে। তা তোমাদের ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাবার দরকার কি ছিল? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায়?"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যাবর্তন গল্পটি পড়িয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন এবং ইহার একটি প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন।[৬৯]

'অন্ধ ধর্ম সংস্কারের বেদীমূলে জীবনের অপচয়'কে লইয়া প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পটি রচিত। প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পই কৌতুকরসের। 'ট্রাজিক' গল্প রচনাতেও যে তিনি সমান সার্থক 'দেবী' গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৭০] গল্পটির প্লট অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দান, প্রভাতকুমার স্বয়ং এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

"দেবী গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই, এখন করিলাম।"[৭১]

প্রভাতকুমার একবার অপূর্বমণি দত্তকে বলিয়াছিলেন—"দেখুন রোগে শোকে, অনাহারে বহু লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, তার উপর আবার জল্লাদ বৃত্তি করিবার কি দরকার? নাই বা মরল আপনার নায়িকা, বেঁচে বর্তে থাকুক না সে।……কি দরকার করুণ রসের, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসটাই বরং দুর্লভ, তাই নিয়ে লিখুন না।"[৭২]

এই মানসিকতার জন্যই প্রভাতকুমার 'দেবী' গল্প দিয়া 'নবকথা' গল্পগ্রন্থটির উপসংহার করিতে চাহেন নাই।

"দেবী tragedy উহাকে একেবারে শেষ গল্প করা সঙ্গত মনে করি না"[৭৩]

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লটে গল্প রচনা করিয়া প্রভাতকুমার গল্পটি পাঠাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিকট। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ হয় নাই এবং তিনি কোন বর্জন বা সংযোজনের নির্দেশও দেন নাই। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমারের পত্রাংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুনিলাম আমার 'দেবী' গল্প পড়িয়া আপনি নিরাশ হইয়াছেন। তাহার 'সাইকলজি' পরিস্ফুট হয় নাই দেখিয়া। পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া মানুষ করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি, যতই যত্ন কর, তার মায়ের মন কিছুতে উঠে না।…দেবীর একটা ফাইল পাঠাইতেছি এই ডাকে। একটু touch করিয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া, কিন্তু একটু শীঘ্র চাই।…যদি নিতান্ত সময়াভাবে বা অন্য প্রকারের বাধা বর্তমান থাকে, তবে মেয়েকে ফিরিয়াই পাঠাইবেন। কিন্তু গরীবের ঘরের বধু, ধনী পিতার নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া থাকে, এ প্রথা বঙ্গদেশময় প্রচলিত আছে।"[৭৪]

পরের একটি পত্রে প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—

"দেবী যথা সময়ে ফিরিয়া পাইয়াছি।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে প্রভাতকুমার যে 'অভিশাপ' নামক ব্যঙ্গ কবিতাটিতে কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন এই পত্রে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু 'দেবী'র কোন উল্লেখ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে 'দেবী'র জন্য কোন পরামর্শ দিয়া থাকিলে প্রভাতকুমার অবশ্যই তাহারও উল্লেখ করিতেন।

'বউচুরি' গল্পে যে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মুলে রহিয়াছে নায়ক অনাথশরণের বিচিত্র মনোভাব। গল্পটিতে ব্রাহ্ম ধর্মানুরাগী নব্যযুবকদের প্রতি মৃদু কটাক্ষ যে আছে, তাহার পরিচয় গল্পটির প্রথম পংক্তিটিতেই পাওয়া যায়—

"যে সময়ে নব্য বঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।"

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ তখন একটা হুজুগে পরিণত হইয়াছিল, ব্রাহ্ম হইতে না পারিলে নব্য যুবক সম্প্রদায় নিজেদের যথেষ্ট আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। এইভাবে কোমর বাঁধিয়া নিজেদের উদার মতাবলম্বী আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টার পিছনে যে কত সময় কত হাস্যকরতা লুকাইয়া থাকে তাহা আমরা উপলব্ধি করি গল্পটি পড়িয়া। অনাথশরণ নিজ স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে না, কারণ সে বলে "যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী।" বালিকার দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমরা উভয়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্ম বিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব, ও তখন ভালবাসিয়া, আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।"

অনাথ স্ত্রীকে 'ভগিনী' সম্বোধন করে, তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করে না অথচ সেই স্ত্রীও হয়ত তাহাকে ভালবাসেনা এমন সিদ্ধান্ত করিতে তাহার মনে ব্যথা লাগে। বলা বাহুল্য গল্পটির উপসংহারে অনাথশরণের নূতন মতাদির ক্রমশঃ পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাদের দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

'আমার উপন্যাস' গল্পের নায়ক ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন না হইলেও, পূর্বরাগবর্জিত বিবাহ করিতে চাহে নাই, বিবাহ সম্বন্ধে তাহারও 'মতাদি' অনাথের অনুরূপ। কিন্তু 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' গল্পের ভবতোষ ইহাদের বিপরীত। সে নব্য হইয়াও প্রাচীনপন্থী।

'খোকার কাণ্ড' গল্পে লেখক হিন্দু এবং ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়কে লইয়াই কৌতুক করিয়াছেন। ব্রাহ্ম হরসুন্দরবাবু যতক্ষণ না নিজে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন ততক্ষণ বিশ্বাস করিতেন যে "ত্রিশ বৎসরের নিচে যে কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হলে তার পক্ষে বিবাহ করাই কর্তব্য।" কিন্তু যখন তাঁহার নিজের স্ত্রীটির প্রায় ত্রিশে বিধবা হইবার অবস্থা হইল তখন হইতেই তাঁহার মতাদি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে।

"এখন আমার মনে হয়, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয়েছে, স্বামী মারা গেলেও যার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না—এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধবা বিবাহ করা বোধহয় সঙ্গত নয়।"[৭৬]

বলাবাহুল্য অবস্থাগুলি তাঁহার স্ত্রী পঙ্কজিনীর সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্ম হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী পঙ্কজিনী আবার অন্তরে অন্তরে গোঁড়া হিন্দু। মা দুর্গা মা কালী প্রমুখ হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমাপরিসীমা ছিল না। কঠিন রোগাক্রান্ত স্বামীকে সুস্থ করিবার জন্য তিনি বাবা ষণ্ডেশ্বরের নিকট মানত করেন, অবশ্যই স্বামীর অজ্ঞাতে।

একই পরিবারে গোঁড়া ব্রাহ্ম স্বামী ও তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু পত্নীর কার্যকলাপ কাহিনীর শেষাংশটিতে কৌতুকরসের সঞ্চার করিয়াছে। ট্রেনের কামরায় আকস্মিকভাবে এক হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পঙ্কজিনীর পট্টবস্ত্র পরিহিতা পুজারিণী মূর্তিটি পূজার ফুল বেলপাতা সমেত হরসুন্দর বাবুর চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

সংসারের পনের আনা মানুষ জোর গলায় যে সমস্ত মতকে সরবে ঘোষণা করিয়া বেড়ায় অনেক সময় তাহাদের নিজেদের মধ্যেই থাকে সেই মতাদির প্রতি অসমর্থন। অন্যের বেলায় বিধান দিতে বাধে না, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে মন কাঁপে। চিন্তা ও কর্মের এই অসঙ্গতিকে লইয়া প্রভাতকুমার অনেকগুলি গল্পে কৌতুক করিয়াছেন। 'প্রতিজ্ঞা পুরণ' এই শ্রেণীর একটি গল্প।

ভবতোষ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নহে। তাহার বিশ্বাস ইহার ফলে দেশে আর্যভাব হ্রাস পাইতেছে। বিবাহের ব্যাপারে তাহার মত হইতেছে কালো কুৎসিত মেয়েকে বিবাহ করা। কারণ সুন্দর মেয়ে দেমাকে হয় এবং লেখাপড়া জানা মেয়েও বিবাহ করিতে নাই কারণ তাহারা শুধু নভেল পড়ে, স্বামীকে ধর্মপথে সাহায্য করে না। তাহারা সহধর্মিনী 'না হইয়া হয় সহ বিলাসিনী।'[৭৭] কিন্তু ভবতোষ প্রতিজ্ঞার চাপে পড়িয়া জগদম্বার ন্যায় কুৎসিত মেয়েকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেও সে যতই জগদম্বাকে নিজ স্ত্রীরূপে ভাবিতে চেষ্টা করিল ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা পুরণজনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভবতোষের কপালে সুন্দরী বধুই জুটিল এবং কি আশ্চর্য ভবতোষের মত কঠোর নীতিপরায়ণ ছেলেও বধুর চিঠি পাইবার অপেক্ষায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল।

প্রভাতকুমার সমসাময়িক বাংলা দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা এবং সমকালীন মানসিকতাকে তাঁহার গল্পের পটভূমিকারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। 'বউচুরি' ও 'খোকার কাণ্ডে' যেমন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের হুজুগ 'প্রত্যাবর্তন' ও 'প্রতিজ্ঞা পুরণে' তেমনই হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ লইয়া নব্য হিন্দুদের বাড়াবাড়ি। 'প্রত্যাবর্তনে'র পটচিত্র আঁকিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন—

"যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। ……অধিকাংশ ছাত্রের মস্তকে টিকি। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করে না। বঙ্কিমবাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' সন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্বত্র হরিনাম ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে হরিসভা। ষ্টেজের উপরেও শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গদেব সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।"[৭৮]

'প্রতিজ্ঞা পুরণ' গল্পের নায়ক ভবতোষও এই ধরনের একজন নব্যহিন্দু। নব্য হিন্দুদের মধ্যে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কমলাকান্ত শর্মা বলিতেছে—

"ছোবড়া, স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার—পরিত্যাগ করাই ভাল।"[৭৯] কিংবা "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্র মুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে……।"[৮০] কিংবা 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম-চন্দ্রের সেই বিখ্যাত মন্তব্য "হায় রমণী রূপ লাবণ্য ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।"

ভবতোষও ভাবিতে চেষ্টা করে "দেখ এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প অতল জলে ডুবিয়া যাইত।……না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না, আমি ধর্মের জন্য সংসারের জন্য আদর্শ হিন্দু গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি।"[৮১] কিন্তু এই ভাবালুতার ফানুস যে কত ক্ষণভঙ্গুর তাহা ভবতোষের মানসিক অবস্থা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

'কানাইয়ের কীর্তি' গল্পে প্রভাতকুমার দেখাইয়াছেন যে ধর্মান্তরিত হইলেই উদার হওয়া যায় না। আচার আচরণে বাহ্য চাকচিক্য হয়ত দেখা যায় কিন্তু মনের গোঁড়ামি থাকিয়াই যায়। বস্তুত সে যুগে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া কিছু হিন্দু ধর্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন বর্ণের হিন্দু। অল্প সংখ্যক বর্ণহিন্দুও অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অনেকেই পূর্ব-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই দেখি খ্রীষ্টান ব্যানার্জি সাহেব কন্যার প্রণয়ীর হস্তে কন্যাদান করিতে রাজী নহেন। পাত্রের পিতা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ধোপা ছিলেন বলিয়া ব্যানার্জি সাহেবের আপত্তি। ব্যানার্জি সাহেব বলেন "না হয় খ্রীষ্টানই হয়েছি, বামুনের ছেলে হয়ে ধোবা জামাই প্রাণ থাকতে আমি করতে পারব না।"

গল্পটিতে মিস. বীণার প্রণয়ী শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করায় ব্যানার্জি সাহেব নিজ মনোনীত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই ভাবে লেখক পিতা পুত্রী উভয়ের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। গল্পটির মুল নায়ক অবশ্য কানাই। তাহারই গোয়েন্দাগিরির ফলে কাহিনীর সুখান্তক পরিণতি ঘটিয়াছে। কানাই চরিত্রটির মাধ্যমে সমসাময়িক বাংলা

দেশের বেকার সমস্যার কথা গল্পটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। "গেল বছর পাস করেছি। একটা কেরানীগিরিটিরির চেষ্টাতেই আমি কলকাতায় আসি। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। শেষ কালে ভাবলাম, দুর হোক্ যে চাকরী পাই সেই চাকরীই করব। হুজুরের বেয়ারার দরকার আছে শুনে তাই হুজুরের কাছে চাকরী প্রার্থনা করেছিলাম। লেখা পড়া শিখে বেয়ারার কার্য করবো, তাই নিজেকে মুর্খ বলে পরিচয় দিয়েছিলাম।"৮২

'সারদার কীর্তি'৮৩ গল্পটি মুলতঃ এক প্রতারকের কাহিনী। সারদা পুর্বজন্মের মাতার পাদোদক প্রার্থী হইয়া ব্যারিস্টার অতুল ব্যানার্জির সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস অবশ্য ব্যারিস্টার অথবা ব্যারিস্টার পত্নী কেহই করিতেন না। তবে ব্যারিস্টার সাহেবের মনে ছিল কিছুটা হলেও হতে পারে জাতীয় ভাব। "দেখ ইচ্ছাশক্তিতে বোধ হয় কিছু কার্য হয়। তুমি পাদোকজল দেবার সময় মনে মনে খুব আগ্রহের সহিত ভেবো, এই জলে এর রোগ ভাল হবে।" অবশ্য কিছুটা পরোপকার প্রবৃত্তিও কাজ করিয়াছে। "কত রকমে লোকে পরের উপকার করে। এই সামান্য উপায়ে যদি ইহার উপকার, যদি ইহার প্রাণটা বাঁচে তাহা হইলে করা উচিত।"

এই দুর্বলতাই সারদাকে আশ্রয় দিয়াছিল। আবার তাহার তস্করবৃত্তি ধরা পড়িবার পর ব্যারিস্টার যখন সামাজিক কর্তব্য হিসাবে সারদাকে জেলে দিতে চাহিলেন তখন তাহার স্ত্রীও কিছুটা মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয় এই মহৎ বাক্যের অনুসরণে তিনি সংশোধনের আশায় সারদাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু ছাড়া পাইয়া সারদা মোটেই চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিল না বা অনুতাপও করিল না 'সে মিউনিসিপ্যালিটীর বারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন' করিল। থিওরীর সহিত বাস্তব অবস্থা মিলিল না।

'বাস্তু সাপ' গল্পে আমাদের দেশের একটি প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কারের হাস্যকরতার কথা বলা হইয়াছে। আমাদের গ্রামীণ সমাজে বহু গৃহেই বাস্তু সাপের পুজা প্রচলিত ছিল। ধারণা ছিল যে এই সাপ কুল দেবতা, ইনি গৃহবাসীকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

"সর্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বী ধরস্ত বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে॥"

এই সাপকে যদি কেহ হত্যা করে তবে সংসারে অমঙ্গল অনিবার্য। আলোচ্য গল্পে সংসারটি অবশ্য 'ছারেখারে' যায় নাই।

প্রভাতকুমারের এই ধরণের গল্পগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে তিনি এমন ভাবে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টানিয়াছেন যে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কাহারও মনঃক্ষুন্ন হইবার কারণ ঘটে

নাই। 'বাস্তু বাবা' খুন হইলেন, যথারীতি স্বস্ত্যয়ন করা হইল। পরে হত্যাকারী ভজুয়া আরও দুইটি সাপ আনিয়া গৃহকর্তার পায়ের কাছে ছাড়িয়া দিল। সাপ দুইটি গৃহকর্তার পায়ে রীতিমত ছোবল মারিল। কিন্তু জানা গেল সাপদুটির বিষদাঁত ভাঙ্গা ছিল। যাঁহারা সংস্কারাচ্ছন্ন তাঁহারা বলিবেন, স্বস্ত্যয়নের ফলেই অল্পের উপর দিয়া ফাঁড়া কাটিয়া গেল, আর যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহারা সংসারের কোন ক্ষতি না হওয়াটাই প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করাইবেন সন্দেহ নাই। 'খোকার কাণ্ড' গল্পেও ঠিক একই ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছে। কাস রোগ হরসুন্দর বাবুদের কৌলিক ব্যাধি, তাঁহার পিতার এবং দুই সহোদর ভ্রাতার এই রোগে অকালমৃত্যু হইয়াছিল, তিনি নিজেও প্রায় শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন, এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার পর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন "আজিকার রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।" কিন্তু দেখা গেল বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়া মালিশ করিবার পরই হরসুন্দর ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। লেখক কিন্তু কোন পক্ষকেই ক্ষুন্ন করেন নাই।

"নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতেই হউক, অথবা বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়ার গুণেই হউক, ডাক্তারি ঔষধের প্রভাবেই হউক অথবা রোগ ভোগের কাল পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হরসুন্দর বাবু দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন।"[৮৪]

'যজ্ঞ ভঙ্গ' গল্পটিকেও আমরা আমাদের এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে দাঁড় করাইতে পারি। বড় ভাই চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথকে মারিবার জন্য জনৈক কালিকানন্দকে দিয়া যজ্ঞ করাইতেছে। অথচ স্বয়ং কালিকানন্দ সুরেন্দ্রনাথের হাত দেখিয়া তাহার পরমায়ু 'চুয়াত্তর বৎসর পাঁচ মাস দ্বাবিংশতি দিবস' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরিষ্কার বুঝা গেল তান্ত্রিকটি একটি জুয়াচোর। কিন্তু সুরেন্দ্রর শ্যালক বঙ্কু বাবু বলিলেন "এ থেকে এই মাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তোমার দাদার মারণ যজ্ঞটি মাঝ খানেই শেষ হয়ে যাবে······পূর্ণাহুতি ঘটবে না।" সত্যই পূর্ণাহুতি শেষ পর্যন্ত ঘটিল না, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় পক্ষই খুশী রহিলেন। 'দেবী'ই প্রভাতকুমারের একমাত্র গল্প যেখানে ধর্মীয় কুসংস্কায়ের প্রতি তিনি নির্মম ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে প্রভাতকুমার যেন সংস্কারক, বিচারক। অন্যান্য গল্পগুলিতে এই সংস্কারকের মনোভাবের পরিচয় নাই। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র 'দেবী'ই সিরিয়াস গল্প, অন্যগুলি কৌতুক রস প্রধান।

আপাত ভৌতিক গল্প

পাঠক সমাজের কাছে ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত রসের গল্প চিরদিনই আদরের সামগ্রী। এই শ্রেণীর গল্পগুলি এক অলৌকিক জগতের সৃষ্টি করিয়া পাঠকমনকে অভিভূত করে, তাহার মনে রহস্য ও রোমাঞ্চের এক শিহরণ জাগায়। আত্মা, ভূত, জন্মান্তর ইত্যাদি

ব্যাপারগুলি এত রহস্যময় যে অবিশ্বাস করিয়াও যেন ইহাদের প্রতি আমাদের কৌতূহল থাকিয়া যায়, আর বিশ্বাসীদের ত কথাই নাই। প্রভাতকুমারের গল্পে অবশ্য সব ভূতই ভূত নয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে ভৌতিক বা অপ্রাকৃত রসের গল্প বলিতে আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয় প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সেই ধরণের নয়। সেই জন্যই আমরা প্রভাতকুমারের তথাকথিত ভৌতিক গল্পগুলিকে আপাত ভৌতিক বলিয়াছি। তাঁহার গল্পগুলি মানুষের অপ্রাকৃতে বিশ্বাসকেই অস্বীকার করিয়াছে। 'রসময়ীর রসিকতা', 'ভূত না চোর', 'খুড়া মহাশয়' তিনটি গল্পেই ভৌতিক কাণ্ড কারখানার অন্তরালে মানুষই ক্রিয়াশীল। ভূতের গল্পের পরিবেশ এবং বর্ণনা এমন হওয়া উচিত যে পড়িতে পড়িতে পাঠকের গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। এই ভীতি শিহরণের সৃষ্টি করিতে না পারিলে ভূতের গল্প জমিতে পারে না। প্রভাতকুমারের বর্ণনার মধ্যে এমন একটি হাস্যোদ্রেককারী ভঙ্গী থাকে যাহা কাহিনীতে ভীতিশিহরণ সৃষ্টির পরিপন্থী। কিন্তু ভূতের গল্প হিসাবে না হউক কৌতুক গল্প হিসাবে তাহারা অত্যন্ত সার্থক। বিশেষ করিয়া 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি অতুলনীয়। মৃত্যুর পরও স্বামীর উপর অসপত্ন অধিকার কায়েম রাখিবার জন্য অত্যাশ্চর্য দুরদৃষ্টি সম্পন্না রসময়ী যে ভৌতিক পত্রাবলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা পাঠকের কৌতুকবোধকে প্রবলভাবে উদ্রিক্ত করে। একথা ঠিক যে যতক্ষণ না আমরা জানিতেছি যে রসময়ীর লিখিত পত্রগুলি তাহার ভগিনী বিনোদিনী অবস্থানুযায়ী পাঠাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সন্দেহ আর বিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান থাকি। কিন্তু 'গা শিউরে ওঠা' জাতীয় ভাব আমাদের মনে জাগে না। প্রকৃত পক্ষে প্রভাতকুমারের এই শ্রেণীর গল্পে একমাত্র গল্পের চরিত্রগুলিই ভয় পাইয়াছে, গল্পকে ছাপাইয়া সেই ভীতি শিহরণ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয় নাই। অবশ্য তাহাতে ক্ষতিও হয় নাই, কারণ প্রভাতকুমার ভূতের গল্প লিখেন নাই লিখিয়াছেন কৌতুকরসের গল্প এবং সেখানে তিনি সার্থক। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে ত আবার কৌতুকরসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গের সংমিশ্রণ সোনায় সোহাগার কাজ করিয়াছে। এই ব্যঙ্গরস স্ফুরিত হইয়াছে থিওজফিষ্ট মনোহরবাবুর কার্যকলাপে। তাহার চেহারার বর্ণনাটি কৌতুকজনক। "মাথায় ঝাঁকড়াচুল মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আবৃত হাতে বড় বড় নখ এক কথায় লোকটি থিওজফিষ্ট।" গল্পটি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য "রসময়ীর রসিকতার মত গল্প যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের প্রতিযোগী। প্লটের গঠন কৌশলে অতি অনায়াসে ডিটেকটিভ গল্পের ঔৎসুক্য ও ভূতের গল্পের শিহরণ একত্র সঞ্চারিত।"[৮৫] গল্পটিতে ডিটেকটিভ গল্পের ঔৎসুক্য (suspense) সঞ্চারিত হইয়াছে এই কথাটি যে কতখানি খাঁটি তাহা পাঠক মাত্রই অনুভব করিবেন।

বস্তুতঃ গল্পটি পাঠকালে গোয়েন্দা জনোচিত একটি অনুসন্ধিৎসাই প্রবল হইয়া উঠে ভূতের গল্পের ভীতি শিহরণ সঞ্চারিত হয় না।

বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক রথী মহারথীই ভূতকে গল্পের আসরে নামাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কঙ্কালকে দিয়া কথা বলাইয়াছেন, প্রমথ চৌধুরী অশরীরি আত্মাকে দিয়া টেলিফোনে কথা বলাইয়াছেন, পরশুরামের ভূত মানুষের মত আত্মহত্যা করিয়াছে এবং ভূতের সর্বশ্রেষ্ঠ কারবারী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূতের তেল পর্যন্ত বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ভূতকে লইয়া তাঁহারা রঙ্গ, ব্যঙ্গ, উপহাস যাহাই করুন না কেন এবং তাঁহাদের ভূত নষ্ট দুষ্ট গোবেচারা যাহাই হউক না কেন তাহারা যে ভূত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভাতকুমার কোপ মারিয়াছেন একেবারে গোঁড়ায়, ভৌতিক অস্তিত্বের মূল ধরিয়াই তিনি টান মারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গল্পে ভূতুড়ে গল্পের ভীতি শিহরণ যে পাওয়া যাইবে না তাহাই স্বাভাবিক। অবশ্য ভূত সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত প্রভাতকুমার তাঁহার গল্পে ভূতকে ঠিক সেইভাবেই রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার ভূতেরা আনুনাসিক স্বরে কথা বলে, ঘাড় মটকাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়, গাছের মগ্ ডাল তাহাদের প্রিয় বাসস্থান এবং তাহারা রাত্রে খট্ খট্ শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

রসময়ী যেমন ভয় দেখাইয়া কার্য সিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিল 'খুড়ো মহাশয়' গল্পে নবকুমারও তাহাই করিয়াছে। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত করিয়া এবং আনুনাসিক স্বরে কথা কহিয়া শেষ পর্যন্ত নবকুমার খুড়া মহাশয়ের কবল হইতে পিতৃধন উদ্ধার করিয়াছে।

দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিল। 'ভূত না চোর' গল্পে দেশী সাহেব ভাড়াটিয়াটিও অনুরূপ অবস্থা চক্রে পড়িয়া নিজ অজ্ঞাতসারে ভূত বনিয়া যান। গল্পটিতে বিদেশী ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে সংযোজিত 'একটি ভৌতিক কাণ্ডের'[৮৬] উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রভাতকুমার ভূতের গল্প লিখেন নাই, কিন্তু এই কাহিনীটি ভূতের গল্প ত বটেই, তাহার উপর সত্য ঘটনামূলক। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক স্বয়ং তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব লেখকের ভূতে বিশ্বাস ছিল না একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গল্প

রাজনৈতিক গল্প প্রভাতকুমার লিখেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন যাহা স্বদেশী আন্দোলন নামে সমধিক পরিচিত তাহার স্পর্শ প্রভাতকুমারের গল্পেও

লাগিয়াছে। কিন্তু লেখক সেখানেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। রাজনীতির ভিতরে প্রবেশ না করিয়া প্রভাতকুমার তাহার হাস্যকর দিকটিই পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

'উকিলের বুদ্ধি' গল্পের নায়ক সুবোধ আন্দোলনের মত্ততাকে নিজ চাকুরী লাভের সুবিধার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। সে যে স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে অথবা ইংরাজের দমন নীতির স্বপক্ষে তাহা নহে। কিন্তু সর্বাগ্রে নিজ অস্তিত্ব রক্ষাই কর্তব্য ইহাই তাহার বিশ্বাস।

'হাতে হাতে ফল' গল্পটিতে দারোগা বদনচন্দ্র তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। চরিত্রটি 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের দারোগাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরাজ শাসক স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য যে প্রচণ্ড দমন নীতি চালাইয়াছিল তাহাতে তাহাদের প্রধান সহায় ছিল আমাদের স্বদেশবাসী আমলারাই। বদন ঘোষ এই জাতীয় আমলাদের প্রতিনিধি। ইহাদের না ছিল চক্ষুলজ্জা না ছিল নীতিবোধের বালাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহারা পারিত না এমন কাজ নাই, বিশেষতঃ পুলিশের তক্‌মা থাকায় ইহারা প্রায় ছোট খাট রাজা মহারাজার সামিল হইয়া উঠিয়াছিল। বদন দারোগার নিম্নোদ্ধৃত স্বগতোক্তি তাহাকে বুঝিতে সাহায্য করিবে—

"ছেলে দুটোকে তো এখনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকর্দমা খাড়া করতে হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরদের কাছ থেকে অল্প মুল্যে চোরাই মাল কেনে। খানাতল্লাসী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের করে ফেলব এখন, তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত ? হবে না আবার ? দারোগা হল ডেপুটি বাবুদের গুরুপুত্তুর। ছেড়ে দেবেন ! সাধ্যি কি ! পুলিশ সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করাব অমনি ডেপুটি বাছাধনের তিনটি বছর প্রোমোসন ষ্টপ্। দারোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে ? এই জন্যেই ত ! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয় ?···তার চেয়ে ইয়ে করা যাক এবং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই।"[৮৭]

যে ডাক্তারকে ফাঁসাইবার জন্য দারোগার এত পরিকল্পনা সেই ডাক্তারের চিকিৎসাতেই শেষ পর্যন্ত দারোগাটি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসে।

দারোগার লিখিত একটি পত্রের অপূর্ব বানান কাহিনীতে কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এইরূপ ভুল বানানের চিঠির সাহায্যে কৌতুক সঞ্চার 'লেডী ডাক্তার', 'রসময়ীর রসিকতা' এবং 'ঔপন্যাসিক' গল্পেও করা হইয়াছে।

'খালাস' গল্পে একজন হাকিমের অবস্থাসংকটের কথা বলা হইয়াছে। একদিকে

চাকুরী, পদোন্নতি ইত্যাদি অন্যদিকে দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি এই দোটানায় পড়িয়া হাকিম সাহেব নাকানি চোবানি খাইতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর পরামর্শই তাহাকে উদ্ধার করিল, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া তিনি খালাস হইলেন—দেশপ্রেম জয়ী হইল।

'খালাস' গল্পটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজটীকা' (১৩০৫) গল্পটির কথা মনে পড়ে। 'রাজটীকা'র নবেন্দুশেখর ঘটনাগতিকে কংগ্রেসে চাঁদা দিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের কোন পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। 'মাদুলী' গল্পটিকে 'হাতে হাতে ফল' গল্পের বিপরীতে স্থাপন করিলে দেখা যাইবে কুট বুদ্ধিতে তথাকথিত স্বদেশ ভক্তরাও কম যান না। লেখক উভয় সম্প্রদায়কে লইয়াই ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতি দেশের গরীব নিরক্ষর অথচ ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের প্রতি। গল্পটিতে শৌখীন দেশ সেবার প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ আছে। গল্পটির পরিণতিতে দেশ সেবক কর্তৃক তাঁতী রাইচরণকে লাথি মারার দৃশ্যটি অতিরঞ্জিত। ফলে লেখকের উদ্দেশ্যপরায়ণতা যতটা প্রকট হইয়াছে, গল্পের স্বাভাবিকতা ততটাই ক্ষুন্ন হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিকটির সহিত আমরা পরিচিত। অপর পিঠে তাহার মধ্যে যে একটা ফাঁকি ছিল তাহার পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথে। তাঁহার 'চার অধ্যায়' এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুইটি এবং 'নামঞ্জুর গল্প' (১৩৩২) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী শাসকের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ তখন দেশসেবার পথটিকে সুলভ খ্যাতির পথে পরিণত করিয়াছিল। এই খ্যাতির লোভে ও মোহে, জনসাধারণের প্রশংসাধন্য দৃষ্টি লাভের উৎসাহে অনেকেই স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। দেশবাসীর প্রতি সত্যকার দরদ তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল না। এই জাতীয় চরিত্রের প্রতিনিধি 'মাদুলী' গল্পের দেশ সেবকটি। 'নামঞ্জুর গল্পে'র নায়িকা অমিয়া তাহারই নারী সংস্করণ।

'পোষ্ট মাস্টার' গল্পের মুল কাহিনী অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন ভিত্তিক নহে। গ্রাম্য পোষ্ট মাস্টার বিমল অপরের প্রেম পত্র চুরি করিয়া পড়ে এবং সেই পত্র সঙ্কেত অনুযায়ী অপরের হইয়া প্রেমাভিসার করিতে গিয়া সে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির ফলে এই লাঞ্ছনাই তাহার পক্ষে শাপে বর হইল। পোষ্ট অফিসের তহবিল হইতে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়া সে রটাইয়া দিল যে স্বদেশী ডাকাতেরা তাহাকে গুরুতররূপে আহত করিয়া পোষ্ট অফিস লুঠ করিয়াছে। ফলে "বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্নমেণ্ট তাহাকে ইন্‌স্‌পেক্টার পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।"

গল্পটির সহিত 'বনফুল' রচিত 'চান্দ্রায়নে'র টেকনিকগত কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই গল্পে আর এম এস-এর সটার চন্দ্রনাথ বাবুরও পরের প্রেমপত্র চুরি করিয়া পড়িবার রোগ ছিল।

'সখের ডিটেক্‌টিভ' গল্পে এক গোয়েন্দা-কাহিনী লেখকের কার্যকলাপের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাই। বাংলা দেশের রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষ অত্যন্ত উপভোগ্য।

"আমার আর কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন?"

"আজ্ঞে আর কিছু পড়িনি, তবে পাঁজিতে আপনার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে······আচ্ছা মশায়, ও সব ঘটনা কি সত্যি, না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইংরাজী নভেল হইতে না বলিয়া গ্রহণ—তাই গোবর্দ্ধনবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মাথা থেকে বের করেছি।"[৮৮]

একজন বরযাত্রী যুবক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গোবর্দ্ধন দত্তের লিখিত একখানি বই ফেলিয়া যায়। সেই বইটির মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। চিঠিতে রহস্য করিয়া কন্যাগৃহকে 'শত্রুদুর্গ' এবং বিবাহারম্ভকে 'যুদ্ধারম্ভ' লেখা ছিল। উর্বর-মস্তিষ্ক গোয়েন্দা-কাহিনী লেখক চিঠিটি পড়িয়া ভাবিলেন ইহা কোন স্বদেশী ডাকাতদলের চিঠি। অতএব তিনি ডাকাতদলকে ধরাইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে 'রায়বাহাদুর' খেতাবলাভের আশা করিলেন। কিন্তু তাহার আশা কি ভাবে ব্যর্থ হইল তাহা লইয়াই গল্পের পরবর্তী ঘটনা।

সমসাময়িক কালে স্বদেশী ডাকাতদের কথায় জনসাধারণের মনে কিরূপ ভীতির সঞ্চার হইত তাহার কৌতুকপূর্ণ পরিচয় ছোটবাবু এবং গোবর্দ্ধন দত্তের ব্যবহারে পাওয়া যায়।

'জামাতাবাবাজী' গল্পে নববিবাহিত যুবক পূর্ণচন্দ্র কলিকাতার কলেজে পড়িতে গিয়া নিরুদ্দেশ হয়। পরে পত্র লিখিয়া স্ত্রীকে জানায় যে সে জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

"মার শৃংখল যতদিন না ভগ্ন করিতে পারি, ততদিন আমাদের গৃহসংসার নাই, কিছুই নাই, আছে কেবল দেশ (আনন্দমঠ দেখ)। এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব, তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে, আবার আমি সংসারী হইব, নচেৎ এই শেষ।"[৮৯]

কিন্তু আনন্দমঠের অনুকরণে সন্তানধর্মে দীক্ষিত 'পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী' এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। ডাকাতি করিতে গিয়া শ্বশুর এবং দারোগা মামাশ্বশুরের

হাতে ধরা পড়িয়া সে সুবোধ বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনও স্বদেশী করিবে না এবং মন দিয়া পড়াশোনা করিবে।[৯০]

জামাতাবাবাজীর মহৎ ব্রতের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি গল্পটিতে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনকে প্রভাতকুমার সমর্থন করিতে পারেন নাই। কোন গল্পেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সমর্থন অথবা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য গল্পে জামাতা বাবাজীর শ্বশুর বলেন—

"স্বদেশী হয়েছিস বেশ ত! মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর, দেশী চিনি করকচ নুন ব্যাভার কর, বিড়ি খা কেউ ত মানা করছে না। একেবারে গৃহত্যাগ পত্নীত্যাগ।"[৯১]

এই গৃহত্যাগ এবং পত্নীত্যাগেই প্রভাতকুমারের ঘোরতর আপত্তি। উক্তিটি ব্যঙ্গাত্মক হইলেও প্রভাতকুমারের মানসিকতা অনেকটা অনুরূপ।

প্রতারণা বিষয়ক গল্প

প্রতারণা বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে 'অদ্বৈতবাদ' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ রচনা। অদ্বৈতচরণ এবং নিতাইচরণ দুই ভাই। তাহাদের একটি কাঠের ব্যবসায় আছে। তবে নিতাই পড়াশোনা লইয়া থাকে, অদ্বৈতের উপরই ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব। অদ্বৈত বীমা কোম্পানীর টাকা পাইবার জন্য কাঠ গুদামের হিসাবের খাতা বদলাইয়া ফেলিল। গুদামে প্রকৃত পক্ষে মাল ছিল ৪।৫ হাজার টাকার। কিন্তু নূতন খাতায় দেখান হইল যে মাল ছিল ৬৫ হাজার টাকার। তাহার পর অদ্বৈত নিজের গুদামে নিজেই আগুন দিল। আদর্শবাদী ছোট ভাই এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলে অদ্বৈত তাহাকে এই বলিয়া নিজের কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখাইল—"হ্যাঁ, এমন যদি হত যে, একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি ও টাকাটা আমায় দিয়ে তার ব্যবসা মাটী হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম আছে, তার ক্ষতি করছি। এ যে কোম্পানী হে কোম্পানী। এ কি একজনকার? এই ধর শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে গিয়ে একটা কুল গাছ থেকে আমি যদি দুটো কুল পেড়ে খাই, তাতে কি কোনও পাপ আছে! লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো আমি যদি পেড়ে খাই-ই যার কুল গাছ সে ত জানতেও পারবে না। অধর্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ।"[৯২]

নিতাই কিন্তু এই ন্যায়ের ফাঁকিতে ভুলিল না এবং দাবী পত্রে সই না করিয়া গৃহত্যাগ করিল। তখন অদ্বৈত নিতাইয়ের সই জাল করিয়া বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের 'ন্যায্য পাওনা' আদায় করিয়া লইল।

গল্পটিতে অদ্বৈত চরণ এবং নিতাই পত্নী গোলাপসুন্দরীর চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব রেখায় চিত্রিত।

গল্পটি সম্বন্ধে জনৈক শ্রদ্ধেয় সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন "অদ্বৈতবাদ অত্যন্ত রিয়ালিষ্টিক ও উজ্জ্বল গল্প।"[৯৩] মন্তব্যটি সার্থক।

'কলির মেয়ে' গল্পের বিনোদও প্রতারণাবিদ্যায় কিছু কম যায় না। সে বহুদিন গৃহ ছাড়া ছিল। অবশেষে অর্থ কষ্টে পড়িয়া সে অর্থ সংগ্রহের এক অভিনব ষড়যন্ত্র করিল। সে হঠাৎ গৃহে ফিরিয়া নিজেকে ভাল চাকুরিয়া বলিয়া প্রচার করিয়া দিল এবং তাহারই ফলে নিকটস্থ গ্রামের জমিদার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে জানিত যে 'বড় চাকরী শুনলে বিয়ে হতে এক দণ্ডও দেরী হবে না।' তাহার পরিকল্পনা ছিল, বিবাহের পর প্রাপ্ত নগদ টাকাগুলি লইয়া সে পুনরায় পলায়ন করিবে। কিন্তু দেখা গেল বিবাহের পরই তাহার বিবেকবোধ ক্রমশঃ জাগ্রত হইতেছে। তাই স্ত্রীকে সমস্ত খুলিয়া বলিল…"তবে দুজনে পালাই এস।…শোবার আগে হাত বাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেবো। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দু'জনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস, জীবন নতুন করে আরম্ভ করব।"

গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে সে দাদার নামে একখানি চিঠি লিখিয়া গেল "যদি কোনওদিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি তবে আবার দেখা দিব।"

জনৈক আধুনিক গল্পলেখক 'কলির মেয়ে' গল্পটির প্লটের অনুকরণে একটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন। কাহিনীটি অবশ্য উপন্যাস নামে প্রকাশিত, কিন্তু তাহা না হইয়াছে উপন্যাস আর না হইয়াছে গল্প।[৯৪]

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পে রাম অবতার অপরকে প্রতারণা করিতে গিয়া নিজেই ঠগের পাল্লায় পড়িয়া কিভাবে নাকাল হইয়াছে তাহার কৌতুকপূর্ণ কাহিনী।

সংবাদপত্রের ছিন্ন পত্রাংশে রামঅওতার একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া জানিতে পারিল যে জনৈক প্রার্থনা-সমাজ-ভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার জন্য কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। রামঅওতার আবাল্য বিবাহিত হইলেও ভাবিল "কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।" এই ভাবিয়া সে যে পত্রটি লিখিল তাহা গিয়া পড়িল কাশীর দুই প্রসিদ্ধ গুণ্ডার হাতে। তাহারা কন্যার পিতার জবানীতে রামঅওতারকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে আসিলে তাহাকে ধুতুরামিশ্রিত ভাঙ খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া ফেলিল। তাহার পর দেহ হইতে ঘড়ি, চেন, হীরের আংটি, রৌপ্য নির্মিত পানের ডিবা, নগদ দুইশত টাকা

এমন কি তাহার পোষাকটি পর্যন্ত তাহারা খুলিয়া লইল এবং রামঅওতারের সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখাইয়া গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া ছাড়িয়া দিল। দিন কয়েক পরে সকলে শুনিল যে রামঅওতার সংসার বিরাগী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিল। তাহার মাতুল তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। তখন হইতে ধার্মিক বলিয়া তাহার খ্যাতি জন্মিয়া গেল। গল্পের সমাপ্তিটুকু প্রভাতকুমারের নিজস্ব ষ্টাইলের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 'পোষ্ট মাস্টার' গল্পটির সমাপ্তিও অনুরূপ। সেখানে বিনোদ কৌশল করিয়া রাজভক্তি এবং কর্তব্যপরায়ণতার খ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করিয়াছে। গল্পটি রচনাচাতুর্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আছে, আমি দুই চারিটা ভণ্ড সন্ন্যাসীর চিত্রও আঁকিয়াছি তাহাতে যদি কেহ বলেন যে আমার মতে সন্ন্যাসী মাত্রেই ভণ্ড, তাহা হইলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে নাকি!"[৯৫]

লেখকের এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও বলা যায় যে সন্ন্যাসী মাত্রেই ভণ্ড না হইলেও অধিকাংশ সন্ন্যাসী বেশধারীই যে ভণ্ড এই ধরণের একটি বিশ্বাস প্রবণতা তাঁহার নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে এত অসাধু সন্ন্যাসী তাঁহার গল্প উপন্যাসে ভীড় জমাইত না, দুই চারিটি খাঁটি সন্ন্যাসী যে তিনি আঁকিতে পারিতেন না তাহা নয়, কিন্তু আঁকেন নাই।

প্রভাতকুমারের এই বিশ্বাস প্রবণতা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাহাও নহে। আমাদের দেশে বিশ্বাস করিবার ক্ষমতাকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদুর" ইহাই আমাদের মর্মগত ধারণা। ঈশ্বরীয় লীলার অপ্রাকৃতত্বে বিশ্বাস, গুরুবাদ ইত্যাদি আমাদের মনে এমন একটি ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে যে তাহার মুখে আমাদের সমস্ত বিচারবোধ ভাসিয়া যায়। আমাদের এই বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগে 'গুরুগিরি' বা 'সাধুগিরি' একটি অর্থকর ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তবে বর্তমান যুগটাই নাকি বিজ্ঞানের। গাঁজা ভস্মকারী মুখে অশ্লীল-গালাগালি, গেরুয়াধারী দেখিলেই অন্তত শিক্ষিত মানুষ আজ আর তাহাকে 'সাধুবাবা' বলিয়া প্রণিপাত করিতে রাজী নয়। কিন্তু এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্যাঁচে ফেলিবার জন্য আছেন আধুনিক সন্ন্যাসী। প্রভাত-কুমারের 'আধুনিক সন্ন্যাসী' নামাঙ্কিত গল্পে দেখি সাধুজী শেক্সপীয়র কোট করিতেছেন, সেবাকারীকে **thanks** দিতেছেন, এবং প্রণামীতে প্রাপ্ত অর্থ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যে দান করিয়া থাকেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সাধুটি একটি জুয়াচোর, "ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া" সাধুর ছদ্মবেশে পলাইয়া বেড়াইতেছেন। সাধুজী জুয়াচোর হইলেও তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। কাহাকে কোন্ প্যাঁচে ফেলিয়া নরম করা যাইবে তাহা তিনি বেশ ভালই জানেন। তাই অল্পশিক্ষিত

'হিন্দুস্থানী'র নিকট তুলসীদাসের রামায়ণের প্রশংসা করিয়া, আবার নব্য হিন্দু শিক্ষিত ছাত্রের নিকট ইংরাজি বলিয়া, দেশ সেবার প্রসঙ্গ তুলিয়া, তিনি আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

"অদ্বৈতবাদ', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'আধুনিক সন্ন্যাসী' এবং 'কলির মেয়ে', গল্পের নায়কেরা প্রতারক শ্রেণীতে নৈকষ্যকুলীন। 'বায়ুপরিবর্তন' এবং 'পুনর্মূষিক' গল্পের নায়কদ্বয় অতটা উঁচুদরের প্রতারক হইতে পারে নাই।

'বায়ু পরিবর্তন' গল্পের হরিধন প্রতারক হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারিলেও অকৃতজ্ঞ হইবার ক্ষমতা তাহার অসীম।

ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত, হরিধন জ্ঞাতি ভ্রাতা ভূপালবাবুর মুঙ্গেরের বাসাতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার নীচতা, মিথ্যাচরণ, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি দেখিয়া ভূপালবাবু তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সহ্যসীমা অতিক্রম করিল যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে হরিধন মিথ্যা পরিচয়ে ভাঁওতা দিয়া জামালপুরের জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং দেশ হইতে টাকা আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া সেই ভদ্রলোকের নিকট হইতে ৫০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। ভূপালবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। হরিধন তাহার 'হইলে হইতে পারিত' শ্বশুরের দান পাঁচটি টাকার সাহায্যে টিকিট কাটিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল এবং চণ্ডীমণ্ডল কাব্যের ভাঁড়ু দত্তর ন্যায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"মুঙ্গেরের ভূপালদাদার বাড়ীতে যে রকম খৃষ্টানী কাণ্ডকারখানা, তাতে তার বাসায় থেকে হিঁদুর ছেলের জাত বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর। মুর্গীত তাঁহার দুটি বেলার আহার, আর বিকেলের জলযোগ। তাতেও অনেক কষ্টে সৃষ্টে নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কোনও রকমে জাত রক্ষে করে পড়েছিলাম। কিন্তু যেদিন স্বচক্ষে দেখলাম দাদার মুসলমান আরদালী বেটা, দাদার জন্য গোমাংস কিনে নিয়ে এল সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। অমনি জিনিষ-পত্তর বেঁধে, কুলি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম।"[৯৬]

গল্পটিতে হরিধনের চরিত্রটি সুচিত্রিত। তাহার স্বার্থপরতা, কুটিলতা, নীচতা সমস্তই লেখক তাহার আচার আচরণের মধ্যে দিয়া নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হরিধনের 'হইলে হইতে পারিত' শ্বশুরটির চরিত্রটিও অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হরিধন তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে কিন্তু সেই প্রতারণা তাহার দাদা ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন, ইহাতে এই সরল, নিরীহ, উদারহৃদয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণটির হৃদয়ে প্রতারকের প্রতিও সহানুভূতি জাগিল, তিনি হরিধনকে গাড়ী ভাড়া স্বরূপ পাঁচ টাকা দান করিলেন। এস্থলে অবশ্য আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং

গল্পকারও যেন কাহারও উপর কারণ থাকা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না ঘটনাটি তাহারই পরিচায়ক।

'পুনর্মূষিক' গল্পের পটভূমি লণ্ডন। মিস্ টেম্পল একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী। ইংলণ্ড-প্রবাসী চপলমতি বাঙ্গালী যুবক বারীন্দ্র তাঁহার সহিত কৌতুক করিয়া নিজেকে একজন শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিল। মিস্ টেম্পলের অর্থের অভাব ছিল না। তিনি বারীনকে হিন্দুধর্মের অনন্যসাধারণ অনুরাগী জানিয়া তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। বারীন্দ্রের অর্থাভাব ঘুচিল, কিন্তু তাহার আহার বিহারে অসুবিধা দেখা দিল, কারণ মিস্ টেম্পলের ব্যবস্থানুযায়ী তাহাকে 'কঠোর অধ্যয়ন করিতে হইত এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায়' থাকিতে হইত। দুইটিতেই বারীনের সমান আপত্তি। সে প্রায়ই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়িতে যাইবার নাম করিয়া অন্যত্র গিয়া স্ফূর্তি করিরা আসিতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন লণ্ডনের এক অভিজাত রেস্তোরাঁতে স্ফূর্তিরত বারীনের সহিত মিস্ টেম্পলের দেখা হইয়া গেল—'সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তিজনক নারীমূর্তি।' বলা বাহুল্য বারীনকে বিতাড়িত হইয়া পুনর্মূষিক হইতে হইল।

'উকীলের বুদ্ধি' গল্পের সমগোত্রের লোক 'ঢাকার বাঙ্গাল' গল্পের নায়ক পরেশ। উভয়েই পশারহীন উকীল। উভয়েই অবস্থার সুযোগ হইয়া ডেপুটিত্ব জোগাড় করিয়া লইয়াছে।

ঢাকার জুনিয়ার উকীল পরেশ প্র্যাকটিসে সুবিধা করিতে না পারিয়া কলিকাতার এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিল। তাহাকে সুদর্শন এবং শিক্ষিত দেখিয়া গৃহকর্তা নিজ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন এবং তাহার জন্য একটি ডেপুটির চাকুরীও করিয়া দিলেন। পরেশ যে পুর্বেই বিবাহিত সে কথা চাপিয়া গিয়া চাকুরীটি হস্তগত করিল এবং বিবাহ এড়াইবার জন্য মুর্চ্ছা-রোগের এমন অভিনয় করিল সে তাহার ভাবী শ্বশুর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

গল্পটিতে শিক্ষিত বেকারের সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাতকুমারের 'কানাইয়ের কীর্তি' গল্পেও বেকার সমস্যার পরিচয় আছে।

'বিষবৃক্ষের ফল' গল্পটি চারিটি নবযুবকের কীর্তিকলাপের কৌতুকময় কাহিনী। 'পরের চিঠি', 'একদাগ ঔষধ' গল্প দুইটিতে নাটকনভেল পড়া নায়িকা পাইয়াছি। 'প্রণয় পরিণামে' পাইয়াছি অতিরিক্ত উপন্যাস পাঠে পরিপক্ক কিশোরকে। বর্তমান গল্পটির নায়কচতুষ্টয় নভেল পড়া, উত্তেজিত মস্তিষ্ক তরলমতি যুবক। বাস্তবজীবনে উপন্যাসের

অনুকরণ করিতে গেলে কি উদ্‌ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাই এই গল্পের কৌতুকের উৎস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র অনুকরণে তাহারা বৈষ্ণবী সাজিয়া, চারিবন্ধুর অন্যতম চারুর শ্বশুরালয়ে গমন করিল। তাহাদের এই উদ্‌ভট খেয়াল ও তাহার পরিণতি গল্পে উচ্চ হাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

'বেনামী চিঠি' গল্পে একটি বালিকা ভগ্নীপতিকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পিতাকে বেনামী চিঠি লিখিয়াছিল—"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।" অবশেষে ঐ সামান্য চিঠির ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে ভগ্নীপতিটিকে বিলাত যাইতে হইল।

'বাজীকর' গল্পটি প্রভাতকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এখানে প্রভাতকুমার শুধু হাস্যস্রষ্টা নহেন, তিনি যন্ত্রনাজর্জর জীবনেরও ভাষ্যকার।

রামরতন বসু ম্যাজিক দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করেন। অথচ—আজ ছোঁড়াগুলো বলে কিনা ম্যাজিক আর দেখব কি। গ্রাম্য লোকেরাও তাঁহার ম্যাজিক দেখিতে প্রস্তুত নয়। কারণ······"না একটা বিটিছাওয়া, না কিছু, শুধুই পয়সা দিমু হঃ।" বিগত পৌষমাসে এখানে এক সার্কাস কোম্পানি আসিয়াছিল। গোলাপী রঙ্গের গেঞ্জি পরিহিতা যুবতীগণের ব্যায়ামলীলা দেখিয়া ইহারা খুব খুশী ছিল, এখন লোলচর্ম বৃদ্ধের বক্তৃতা ও বুজরুকি তাহাদের পছন্দ হইল না। কিন্তু বৃদ্ধের সংসার আছে, কন্যাদায় আছে, তাহার উপর স্ত্রীর পত্র, কনিষ্ঠা কন্যার জ্বর, অর্থাভাবে চিকিৎসা বন্ধ। অন্ততঃ ২৫টি টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ এদিকে চারি আনার টিকিটও বিক্রয় হয় না। মরিয়া হইয়া রামরতন এক ভয়ানক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন যে জীবন্ত মানুষ সর্বসমক্ষে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবেন। প্রচুর টিকিট বিক্রয় হইল, সমস্ত দায় দেনা মিটাইয়া দিয়াও প্রচুর টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। কিন্তু দর্শকেরা ম্যাজিক দেখাইবার সময় ফাঁকি ধরিয়া ফেলিল এবং সেদিন ক্রুদ্ধ দর্শকদের হাতে বৃদ্ধের চরম লাঞ্ছনাই হইত যদি না স্বয়ং পুলিশ সাহেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে বাঁচাইতেন।

মোটামুটি এই ত গল্প। পড়িয়া হয়ত পাঠকের মুখেও হাসি ফুটিবে, পুলিশ সাহেবের অনুকরণে তাহারও বলিতে ইচ্ছা হইবে।—"তুমি বড় শয়তান আছ—**A downright scroundel**" কিন্তু এই শয়তানীর পশ্চাতে কতখানি অশ্রুজল, কতখানি জীবন সমস্যা আছে তাহা অনুধাবন করিলে মনে হয়, আমাদের জীবনে হাসিকান্নার সূত্র দুটি এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে তাহা হইতে একটিকে পৃথক করা বোধকরি অসম্ভব।

'মাষ্টার মহাশয়' প্রভাতকুমারের একটি সুপরিচিত গল্প। কুট কৌশলী ব্রজ মাষ্টার

সরল এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীগণকে কিভাবে প্রতারিত করিয়াছিল—কাহিনীটি তাহারই কৌতুকপ্রদ বিবরণ। হারাণ মাষ্টারের ইংরাজী শিক্ষা হয়ত বেশী ছিল, কিন্তু ব্রজ মাষ্টারের লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা ছিল বেশী। শেষ পর্যন্ত 'I don't know' এই ইংরাজী বাক্যটির অনুবাদের ফেরে পড়িয়া বিদ্বান হারাণ মাষ্টারকে গ্রামছাড়া হইতে হইল, বুদ্ধিমান 'ব্রজমাষ্টার অপ্রতিহতপ্রভাবে মাষ্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য-নির্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।'

প্রভাতকুমারের গল্পে প্রায় প্রত্যেকটি বিপত্নীকই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে।[৩৭] 'হারানো মেয়ে' গল্পেও দ্বিতীয় বিবাহে অনিচ্ছুক কুলদাচরণ পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। কুলদাচরণ প্রত্যহ শিবপুরের বাগানে গিয়া মৃতা স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া কাঁদে এবং কবিতা লেখে। একদিন সেখানে একটি ক্রন্দনরতা কুমারী কন্যাকে দেখিতে পাইল এবং প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে মেয়েটি পিতার সহিত বেড়াইতে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। বাধ্য হইয়া কুলদা এই হারানো মেয়েকে বাড়ীতে লইয়া আসিল এবং তাহাব অভিভাবকের খোঁজ খবর চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য কুলদা এই মেয়েটিকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিতে রাজী হইবার পরই মেয়েটির পিতা সারদাবাবুর সন্ধান পাওয়া গেল। প্রকৃত পক্ষে কমলার পিতা সারদা এবং কুলদার পিতা ভগবতীচরণ ষড়যন্ত্র করিয়া কুলদাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন। এইরূপ ফাঁদ পাতিয়া ছেলেধরার টেকনিক্ প্রভাতকুমার তাঁহার 'প্রজাপতির পরিহাস' গল্পেও ব্যবহার করিয়াছেন। কন্যার পিতা স্বয়ং কন্যাকে সম্ভাব্য স্বামীর সহিত প্রেম করিতে আগাইয়া দিতেছেন, আমাদের সমাজে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ। ফলে দুইটি গল্পই যেন সাজান অর্থাৎ কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে।

ভ্রান্তি বিষয়ক গল্প

'ভুল মানুষ মাত্রেই করে' এই রকম একটা কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভুল সংশোধন হইয়া গেলে আক্ষেপের কোন কারণ থাকে না, কিন্তু সর্বত্র সে সুযোগ পাওয়া যায় না। তখন জীবনের একটি ভুলই হয়ত সারাজীবনের অনুতাপের কারণ হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা মানুষের ভুল ভ্রান্তিকে কাজে লাগাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভাতকুমার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সংশোধনের পথ খুলিয়া রাখিয়াছেন। ফলে প্রভাতকুমারের ভ্রান্তি-ভিত্তিক গল্পগুলির রসপরিণতি ঘটিয়াছে হাসির মধ্য দিয়া। ভিন্ন-রুচির লেখকের হাতে হয়ত এই গল্পগুলিই করুণরস সৃষ্টি করিতে পারিত। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী সমালোচকের উক্তি মনে পড়ে।

"Even the participants in a comedy or tragedy can themselves be aware of the antithesis. Persons involved in a comical situation often exclaim: 'If this were not so terribly funny, it would be really tragic.' Persons involved in a tragical situation exclaim just as often: 'If this were not so dreadfully serious it would be really funny.' ৯৯

অন্য একজন খ্যাতনামা সমালোচক বলিয়াছেন, "হাস্যরসের যে হাসি তাহা রোদনেরই প্রকারভেদ মাত্র। যে দুর্ঘটনা একটু গুরুতর হইলেই আমাদের হৃদয়কে পীড়ন করিতে পারে অল্পমাত্রায় তাহাই হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়।"৯৯

আসলে সর্বত্রই মাত্রা রাখিয়া চলাটাই প্রধান। 'পঞ্চভূতের' ভূতনাথবাবু বলিয়াছেন "অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"১০০

প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্পই এই বিস্ময় আর অশ্রুজলের ঠিক মধ্যস্তরে মুক্তার মত টল্‌টল্ করিতেছে। বোধকরি আর একমাত্রা চড়িলেই হাসি কান্নায় পরিণত হইত। পূর্বে আলোচিত 'বাজীকর' এবং আলোচ্য 'বলবান জামাতা' 'সম্পাদকের আত্ম-কাহিনী', 'হারাধন' ও 'বিলাসিনী' গল্পগুলি আমাদের মন্তব্যটিকে সমর্থন করিবে।

প্রভাতকুমারের 'বলবান জামাতা' গল্পটি সুপরিচিত। নবনী-কোমল-দেহ নলিনী শ্যালিকার শ্লেষবাক্যে মর্মাহত হইয়া দুই বৎসরের ব্যায়াম সাধনায় শরীরটিকে পুরুষোচিত কঠিন করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার বাসনায় শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নাম বিভ্রাটের ফলে ভুল বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং সেখান হইতে যখন তিনি নিজ শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছিলেন তখন শ্বশুর এবং শ্যালিকা দুজনেই তাহাকে চিনিতে না পারিয়া এবং ডাকাতভ্রম করিয়া কটু বাক্যে বিতাড়িত করিলেন। পরে অবশ্য ভুল সংশোধন হয় এবং নলিনীও জামাইআদর লাভ করে। গল্পটি যে কৌতুক রসের তাহার পরিচয় গল্পটির নামকরণের মধ্যেই রহিয়াছে।

ঠিক একই প্লট লইয়া সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় একটি গল্প লিখিয়াছেন 'সাবজজের বাঙ্গলা'। এই গল্পটিতেও জামাই শ্বশুরবাড়ী ভ্রমে ভুল বাড়ীতে পৌঁছায় এবং পরে বহু কষ্টে বাড়ী চিনিয়া নিজ শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু 'বলবান জামাতা'য় ঘটনা সংস্থাপনের যে অপূর্ব কৌশল গল্পটিতে উচ্চ হাসির সৃষ্টি করিয়াছে 'সাবজজের বাঙ্গলা'তে তাহার একান্ত অভাব। 'সাবজজের বাঙ্গলা' 'বলবান জামাতা'র ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু জনৈক গবেষক মন্তব্য করিয়াছেন :—

"সাবজজের বাঙ্গলা গল্পে প্রভাতকুমারের 'জামাতা বাবাজী' গল্পের প্রভাব রহিয়াছে। উভয় গল্পের বিষয়বস্তু এক।......প্রভাতকুমার হইতে, সৌরীন্দ্রমোহনের গল্প অধিক সুখকর এবং মধুর।"[১০১]

লেখক ভ্রমক্রমে 'বলবান জামাতা'র স্থলে 'জামাতা বাবাজী'র উল্লেখ করিয়াছেন। 'জামাতা বাবাজী'র সহিত 'সাবজজের বাঙ্গলা' গল্পের কোন সাদৃশ্য নাই। আর প্রভাত কুমারের কোনও গল্পের সহিত সাদৃশ্য থাকুক অথবা নাই থাকুক সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পটি কষ্টকল্পনার ফলে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

'সম্পাদকের আত্মকাহিনী' গল্পটি আর্যশক্তি সম্পাদক মনতোষ[১০২] ও তস্য সহকারী অবিনাশকে লইয়া রচিত গল্প। গল্পটি উত্তমপুরুষে লিখিত, পটভূমি স্বদেশী আন্দোলন।

"যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমেই চলিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের মরাগাঙ্গেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে, আমিও "আর্যশক্তি"তে উদ্দীপনাপুর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘি, বিডন-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে, কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি।"[১০৩]

কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে কলিকাতা হইতে পলায়ন করিতে হইল পুলিশের ভয়ে। পশ্চিমের নানাস্থানে তিনি পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানেই যান শ্মশ্রু-গুম্ফধারী এক ব্যক্তি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। হঠাৎ একদিন রেলওয়ে স্টেশনে অনুসরণকারী মনতোষ বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই কি মনতোষবাবু?" অমনি মনতোষবাবু ভয়ে মুর্চ্ছা গেলেন। মুর্চ্ছা ভাঙ্গিলে জানিলেন যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি মৃত-প্রায় তিনি আর কেহই নহেন, তাঁহারই পত্রিকার অন্যতম লেখক ঢাকার উকীল অনাদিবাবু।

গল্পটিতে পত্রিকার বিজ্ঞাপন কৌশল এবং 'লোমহর্ষক সত্য কাহিনী' বলিয়া যে সমস্ত কাহিনী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহার অধিকাংশের গোপন কথাটি লেখক ফাঁস করিয়া দিয়াছেন।

"সম্মুখেই পূজা, প্রেসের দেনা শোধ করিতে হইবে, কাগজের দোকানেও অনেক টাকা বাকী, যে ফারম আমাদের ছবির ব্লক প্রস্তুত করে, তাহারাও তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া রঙ্গীন কাগজে এক লম্বা চৌড়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলিকাতায় অজস্র বিলি করিলাম এবং মফঃস্বলেও নানাস্থানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিলাম—এ বৎসর আর্যশক্তি পুর্ব পুর্ব বৎসরের অপেক্ষা কয়েক সহস্র (ঠিক কয় সহস্র লিখিয়াছিলাম মনে নাই)

অধিক ছাপাইয়াও কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারিতেছি না। দামোদরের বন্যার মত হু-হু করিয়া গ্রাহক সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আর অধিক দিন যে নুতন গ্রাহকদিগকে সম্পূর্ণ সেট কাগজ দিতে পারিব এমন ভরসা নাই। অতএব যাঁহারা আর্যশক্তির নুতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন, ইত্যাদি।"[১০৪]

পুলিশের ভয়ে পলাতক মনতোষ বাবুকে অবিনাশ দুই বছর গা ঢাকা দিয়া থাকিবার পরামর্শ দিতেছে—

"আমি বলিলাম তা যেন হল। কিন্তু বছর দুই পরে যখন আমি বেরুব তখন লোকে কি বলবে? অবিনাশ বলিল তখন এই সংবাদ প্রচার করা যাবে যে, কয়েকজন দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ আপনি ধৃত হয়ে তিব্বতে কিংবা চীনে ঐ রকম একটা জায়গায় নীত হয়েছিলেন, এখন মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অমুক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে আপনার এই দুই বৎসরের আত্মচরিত বেরুবে—সে কাহিনী পাঠ করে পাঠক যুগপৎ হর্ষে, ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠবেন—তা শত উপন্যাসের ঘনীভূত নির্যাস—এই সব বলে টলে আরও খুব এক চোট গ্রাহক বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"তারপর।"

"সে রকম একখানা উপন্যাস আমি ইতিমধ্যে রচনা করে রাখব এখন, তাই আপনার বেনামীতে মাসে মাসে ছাপা যাবে।"[১০৫]

'হারাধন' গল্পে রামলোচন হারাধনকে বিধবা কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর গোপন প্রণয়ী বলিয়া সন্দেহ করেন এবং তাঁহাকে খুন করিতে যান। কিন্তু প্রকাশ পায় যে হারাধন তাঁহার ভ্রাতৃবধুরই সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ফেরারী আসামী হীরালাল। নাম ভাঁড়াইয়া তাহাদের সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ভগ্নীর নিকট হইতে কিছু টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে।

'ভুল শিক্ষার বিপদ' গল্পটি করুণ রসের। একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার ফলে মদন-মোহন বাবু কমলালেবু খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্মালেড শব্দটির প্রকৃত অর্থ না জানায় তিনি কমলালেবুর মোরব্বা বা মার্মালেড খাইয়া ফেলিলেন। এইভাবে বাল্যের ভুল শিক্ষার ফলে বার্ধক্যে বিপদ ঘটিল। ইহারই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধ মদনমোহন তাঁহার জীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। মুহূর্তের ফুৎকারে যেন হাস্যপরিহাসরত বৃদ্ধের সহাস মুর্তির অন্তরালস্থিত বেদনার্ত হৃদয়টি উদ্ঘাটিত হইয়া গল্পটিকে একটি মর্মস্পর্শী পরিণতি দান করিয়াছে। ভ্রান্তি পর্যায়ে এই একটি

মাত্র গল্প যেখানে ভ্রান্তি সংশোধনের উপায় নাই। তাই গল্পটি অনিবার্যভাবে ট্রাজিক হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ মদনমোহনের চরিত্রটি প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

'একালের ছেলে' গল্পে আমরা 'গহনার বাক্স' গল্পের বিপরীত চিত্র পাই। গহনার বাক্সে উদারহৃদয়া গৃহিণীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আলোচ্য গল্পে উদারহৃদয় কর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

করালীচরণের স্ত্রী দরিদ্র বৈবাহিকের প্রেরিত পূজার তত্ত্ব পছন্দ না হওয়ায় ঘোষণা করিলেন যে এইরূপ ছোটলোকের মেয়েকে তিনি নিজ গৃহে স্থান দিতে পারেন না এবং পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবেন। তিনি পুত্রকেও কঠোর নির্দেশ দিলেন সে যেন শ্বশুর বাড়ীর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে। করালীচরণের স্ত্রী 'খাণ্ডারণী' হইলে কি হয় করালীচরণ নিতান্তই ভাল মানুষ এবং উদার হৃদয়। তিনি গোপনে বৈবাহিককে দুইশত টাকা পাঠাইয়া ভাল করিয়া শীতের তত্ত্ব পাঠাইতে লিখিলেন। যথাসময়ে মুল্যবান তত্ত্ব আসিল। অতএব গৃহিণীর মনও গলিল। তিনি বধূকে গৃহে আনাইলেন। বধূ গর্ভবতী। অতএব তাঁহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া গৃহিণী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বধুর এবং বধুর চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া তদ্দণ্ডেই বধুকে পিত্রালয়ে ফেরৎ পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কাহিনীর এই সংকট মুহূর্তে জানা গেল যে মাতার কঠোর নির্দেশ অমান্য করিয়া 'একালের ছেলে' প্রফুল্ল প্রতি শনিবারেই কলেজের ছুটির পর বর্ধমান হইতে তাহার শ্বশুর বাড়ী কামারহাটীতে যাইত। তাহার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া এই কথা আর কেহই জানিত না এবং তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও এ ব্যাপার গোপন রাখিত। এইভাবে কাহিনীটি মধুরেণ সমাপয়েৎ হইল।

কাহিনীর প্রথমাংশে কিছুটা আধুনিকতার স্পর্শ থাকিলেও শেষাংশ একেবারেই প্রভাতকুমারীয়। খাণ্ডারণী স্ত্রী চরিত্র প্রভাত সাহিত্যে দুর্লভ—আর দুইটি মাত্র আছে 'রসময়ীর রসিকতা'র রসময়ী এবং 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'র সরোজবাসিনী।

'বিলাত ফেরতের বিপদ' গল্পটি একটি কৌতুককর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আলিপুরের সাবজজ অতুলবাবুর কন্যা সুপ্রভা বিলাত ফেরত নব্য ব্যারিস্টার প্রকাশ চন্দ্রের বাগ্‌দত্তা। কিন্তু একটি পত্রের ভুল ব্যাখ্যা উভয়ের বিবাহে বাধার সৃষ্টি করিল। প্রভাতকুমারের কোন গল্পেই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই গল্পের ভ্রান্তিটিও বিদুরিত হইলে প্রকাশের সহিত সুপ্রভার মিলনের আর কোন বাধা থাকিল না। গল্পটিতে বিলাত ফেরত বাঙ্গালী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

'কুঙ্কুম কুমারীর গুপ্তকথা' গল্পটি লেখকের কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক।

বাড়ীর ছোট বউ কুঙ্কুম কুমারীকে একদিন রাত্রে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তায় বাড়ীর সকলের রাত্রি কাটিল। পরদিন ভোরবেলায় গোয়াল ঘরের ছাদের আলসের উপর কুঙ্কুমের শাড়ীর আঁচল উড়িতে দেখিয়া বাঙ্গলা উপন্যাসের অক্লান্ত পাঠক, ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসভক্ত ছোট কর্তা ধরিয়া লইলেন যে কে বা কাহারা ছোট বউকে হত্যা করিয়া গোয়াল বাড়ীর ছাদের উপর লাস তুলিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বড় কর্তার ডাকে লাস পাশ ফিরিয়া চক্ষু মেলিল এবং তিন শ্বশুরকে তথায় সমবেত দেখিয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। পরে প্রকাশ পাইল যে ছোট বউ দুপুরে গোয়াল ঘরের পিছনে মই লাগাইয়া আম খাইতে উঠিয়াছিল। বড় কর্তা মইখানা সেখান হইতে সরাইয়া লওয়াতে ছোট বউ লজ্জায় কাহাকেও ডাকিতে পারে নাই।

উপন্যাস পাঠক মেজ কর্তার চরিত্রটি গল্পে যথেষ্ট কৌতুক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভাষান্তর হইতে গৃহীত গল্প

প্রভাতকুমার অনুবাদ কার্যে দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এবং নিজের কয়েকটি গল্প তিনি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন।[১০৬] কিন্তু কোন বিদেশী গল্পের বাঙ্গলায় অনুবাদ তিনি করেন নাই। অবশ্য তাঁহার রচিত কয়েকটি গল্পে বিদেশী গল্পের ছায়া আছে বলিয়া অনুমিত হয়। 'একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবন চরিত' এইরূপ একটি গল্প। গল্পটির সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক ও হেনরির **'The tale of a tainted Tenner'** এর তুলনা চলিতে পারে।

'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' প্রভাতকুমারের প্রথম প্রকাশিত গল্প। বাঙ্গলা সাহিত্যে অচেতন পদার্থকে গল্প কথকেরভূমিকা দিয়াছেন সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই সর্ব প্রথম তাঁহার 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা' গল্প দুইটিতে। প্রভাতকুমারের গল্পটিতে একটি শ্রোতার ভূমিকাও আছে যাহার নিকট রৌপ্যমুদ্রা তাহার জীবন কাহিনী বিবৃত করিতেছে। 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' এবং 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' গল্প তিনটি সার্থক ছোটগল্প হইয়াছে কিনা সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে. কিন্তু তিনটি গল্পেই অচেতন পদার্থের আত্মকাহিনী রচনার টেকনিক গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব 'অচেতন পদার্থের আত্ম-কাহিনী ইংরেজী সাহিত্যে পাওয়া গেলেও বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের পুর্বে পাওয়া যায় নাই।'[১০৭] জনৈক সমালোচকের এইরূপ মন্তব্য সমীচীন নয়। অবশ্য লেখক 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা'কে আত্ম-কাহিনী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। ইহা যেন অনেকগুলি গল্পের খণ্ড খণ্ড অংশের একত্র সংযোজন। প্রভাতকুমারের পরবর্তী গল্পগুলিতে যে সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাদের অনেকের প্রাথমিক রূপ এই গল্পটিতে পাওয়া যাইবে। চারুর কাহিনীটির মধ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনীর আভাস রহিয়াছে। চারুর ন্যায় সুশীলা, সহিষ্ণু, সেবাগতপ্রাণা নারী চরিত্রই পরে হেমাঙ্গিনী (বাল্যবন্ধু), প্রিয় (আমার উপন্যাস), নূতন বৌ (নূতন বৌ), সুরবালা (নবীন সন্ন্যাসী, সতীর পতি), বকুরাণী (সিন্দুর কৌটা) প্রভৃতির মধ্যে দেখা দিয়াছে। এই গল্পের টিকিট বাবুটিই পরে 'নবীন-সন্ন্যাসী' উপন্যাসে স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ধন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা এবং মেয়েলি ইডিয়ম ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এই গল্পটিতেও লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক লেখক 'বনফুল'ও অচেতন পদার্থের জবানীতে গল্প লিখিয়াছেন।[১০৮]

'ভোজরাজের গল্পে'র উৎস বল্লাল সেন (আঃ চতুর্দশ শতাব্দী) কৃত 'ভোজপ্রবন্ধ'। প্রভাতকুমার প্রাচীন কাহিনীটিকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস এবং কৌতুক-রসসিক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের ভাষায় 'গল্পটিতে সেকালের উইটের সঙ্গে একালের হিউমারের যোগ হইয়াছে'।[১০৯] 'শাহজাদা ও ফকীর কন্যার কাহিনী', 'কাজীর বিচার', 'কাটামুণ্ড', 'গুলবেগমের আশ্চর্য গল্প'[১১০] এই গল্পগুলির উৎস 'আরব্য উপন্যাস' বলিয়া মনে হয়। ভাষান্তর হইতে গৃহীত গল্পগুলি অবশ্য আধুনিক ছোট গল্পের বিচারে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু প্রভাতকুমারের সরল ও সরস ভাষার গুণে এগুলির রমণীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'ভূত না চোর' গল্পটিও ভাষান্তর হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

সত্য ঘটনামূলক গল্প

'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর', 'সতীদাহ', 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী' এবং 'বেশ্যাখুন' গল্পগুলি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। গল্পগুলিকে অবশ্য ছোট গল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মাতঙ্গিনীর কাহিনীর মুল কাহিনীটি লইয়া প্রভাতকুমার 'হীরালাল' গল্পটি লিখিয়াছেন। 'সতীদাহ' প্রভাতকুমারের মৌলিক রচনা নয়। 'পত্র পুষ্প' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় প্রভাতকুমার সেকথা স্বীকার করিয়াছেন।[৯৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সতীত্ব সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁহার এই শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় তাহার বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'আরতি' উপন্যাসের অংশ বিশেষে তাঁহার এই শ্রদ্ধার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

……"যে স্থানটিতে তাঁহার স্বামীর চিতা সজ্জিত হইয়াছিল, সে স্থানের দহন চিহ্ন তখনও স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান ছিল, বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ করিয়া, ঠিক সেই স্থানটিতেই ইহার চিতা রচনার জন্য নির্বাচিত করিলেন। আগুন ধূ ধূ জলিয়া উঠিল, বৈধব্যের মুখে পদাঘাত করিয়া, ডংকা বাজাইয়া পতিব্রতা স্বামীর অনুগমন করিবেন।"[১১১]

প্রভাতকুমারের প্রায় সকল স্ত্রী চরিত্রই পতিব্রতা। সতীত্বের অর্থ যদি একনিষ্ঠ প্রেম হয় তাহা হইলে 'সতী' গল্পের বার্থা, 'মাতৃহীন' গল্পের মিস্ ক্যাম্বেল এবং 'সত্যবালা' উপন্যাসের সত্যবালাকে সতী রমণী বলিতে বাধা নাই। ভারতীয় রমণীর সতীত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল।[১১২]

পূর্বে আলোচিত 'আদরিণী' গল্পটিও সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

বিচিত্র গল্প

প্রভাতকুমারের শতাধিক গল্পের মধ্যে এমন কতকগুলি গল্প আছে যেগুলিকে আমরা পূর্বালোচিত শ্রেণীগুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি নাই। সেই গল্পগুলিকে 'বিচিত্র' আখ্যা দিয়া আলোচনা করিতেছি।

'ভিখারী সাহেব' একটি বাঙ্গালী বালিকার প্রতি জনৈক বিদেশীর স্নেহ সম্পর্কের মধুর কাহিনী। স্যার হেনরি রবিনসন মধ্যে মধ্যে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তখন তিনি নিজেকে নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। এইরূপ উন্মাদ অবস্থায় জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং ভদ্রলোকটি তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যান। ভদ্রলোকটির বালিকা কন্যা গিরিবালাকে রবিনসন নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে থাকেন। গিরিবালার একবার কঠিন পীড়া হইলে প্রমাণ পাওয়া গেল যে হেনরি একজন সুচিকিৎসক। ইতিমধ্যে হেনরির পাগলামির ভাব কমিয়া আসিল এবং পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে হেনরির ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সন্ধান পাইয়া বিলাত হইতে আসিয়া হেনরিকে লইয়া গেল। হেনরি গিরিবালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু গিরিবালার মাতা তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না।

প্রভাতকুমারের গল্পে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা ঘরে ফিরিয়া আসে। বর্তমান গল্পেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্রসঙ্গত আমরা 'ধর্মের কল', 'সুশোভনা', 'নয়নমণি', 'কলির মেয়ে', 'জামাতা বাবাজী', 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পগুলির নামোল্লেখ করিতে পারি। প্রত্যেকটি গল্পেই হারানো অথবা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রভাতকুমারের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন একজন খ্যাতনামা আধুনিক সাহিত্যিক তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গল্পে।[১১৩]

'আম্রতত্ত্ব' একটি উৎকৃষ্ট কৌতুক রসের গল্প। রেলের গার্ডেরা রেলওয়ে পার্শেল হইতে জিনিষ সরাইয়া নিজেরা ভোগ করে এইরূপ একটি অপবাদ আছে। বর্তমান গল্পে গার্ড ডিসুজা ব্রেক ভ্যানে উৎকৃষ্ট ল্যাংড়া আম দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিলেন না। ক্ষুধাও পাইয়াছিল। সুতরাং তিনি একটির পর একটি আম খাইতে লাগিলেন এবং বিভিন্ন স্টেশনে পরিচিত রেলকর্মচারীদের মধ্যে আম বিতরণও করিতে লাগিলেন। আমের ঝুড়ি প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া খালাসীকে দিয়া কতকগুলি পাথর উঠাইয়া ঝুড়িতে ভরিয়া দিলেন এবং গাড়ী ছাড়িলে সাহেব সহাস্যে ঝুড়ির মুখ আবার সেলাই করিয়া দিলেন। 'গুণ ছুঁচ, দড়ি প্রভৃতি গার্ড সাহেবদের বাক্সেই থাকে।' গল্পটির কৌতুকরস চরমে উঠিয়াছে যখন গার্ড সাহেব বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন যে তাঁহার মা বলিতেছেন "আজ দ্বিপ্রহরে তোমার হবু শ্বশুরের পত্র পাইলাম, ১৫০টা ভাল ল্যাংড়া আম পাঠাইতেছেন, খুব সম্ভব ১৫ নম্বরে তাহা এখানে পৌঁছিবে।......ট্রেন পৌঁছিবার আধ ঘণ্টা পরেই আমি গিয়া বাস্কেট আনাই। আনিয়া খুলিয়া দেখি আম সব চুরি গিয়াছে। দেখ দিকি কাণ্ড, আমের স্থানে পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে।.. ...ফিফ্‌টিন আপ-এ গার্ড কে ছিল খবর নাও ত।"[১১৪]

বলা বাহুল্য ফিফ্‌টিন আপ-এর গার্ড ছিলেন ডিসুজা স্বয়ং।

'গুণীর আদর' গল্পে লেখক আমাদের তথাকথিত সঙ্গীতপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীত আমাদের দেশে 'শাস্ত্র' আখ্যায় ভূষিত, কিন্তু সঙ্গীত চর্চা কিছুকাল পুর্বেও আমাদের সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় ছিল না। সঙ্গীত সাধনার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাও আমাদের দেশে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। গায়কদের ডাক পড়িত সাধারণত ধনী গৃহে অথবা বাগান বাড়ীতে। সঙ্গীত শিক্ষক ছাত্রী পাইতেন রক্ষিতা অথবা গণিকার কন্যাকে। 'গুণীর আদর' গল্পের বিনয় বিলাতের 'কেনসিংটন কলেজ অব মিউজিক' হইতে ডিগ্রী পাইয়া দেশে ফিরিয়া সঙ্গীতের সাহায্যেই স্বচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে এইরূপ উচ্চাশা পোষণ করিত। কিন্তু দেশে ফিরিয়া দেখিল গুণীর আদর নাই। শেষ পর্যন্ত বিনয় বেসরকারী কলেজে 'প্রফেসরী' লইয়া সঙ্গীতের স্বাধীন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল।[১১৪(ক)]

সাধু সন্ন্যাসী এবং জ্যোতিষীদের লইয়া প্রভাতকুমার তাঁহার অনেকগুলি গল্প উপন্যাসে কৌতুক করিয়াছেন। 'জ্যোতিষী মহাশয়' গল্পের জ্যোতিষী মহাশয়ের কার্যকলাপেও বোঝা যায়, তাঁহার এই ব্যবসায়ের পিছনে 'ভণ্ডামি' ছাড়া আর কিছু নাই।

"জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া বিশেষ মনোযোগের ভান করিয়া সুধীরের করাংক পরীক্ষা করিলেন......।"[১১৫]

কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষী মহাশয়ের ধন সম্পত্তি লাভের আশা নষ্ট হইয়া গেলেও

তাঁহার নিজের খরচ চল্লিশ টাকা আট আনা তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন। জ্যোতিষী মহাশয়ের স্ত্রীর চরিত্রটি গল্পে কৌতুক রস সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বাঙ্গলা উপন্যাসের একনিষ্ঠ পাঠিকা। ফলে তিনি উচ্চ কল্পনাশক্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। তাই হরিহরবাবু আজন্ম পিতৃহীন কোন যুবকের সন্ধান করিতেছেন শুনিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে ইহার মধ্যে লাখ লাখ টাকা সম্পত্তির ব্যাপার আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পাঠে পরিপক্ক বুদ্ধি স্ত্রী চরিত্রের সাক্ষাৎ প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্প উপন্যাসেও পাওয়া যায়।

উঠতি গুণ্ডা কেবলরামের চরিত্রটি তাহার সংলাপের মধ্য দিয়া লেখক সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তাকে প্রেহার ট্রেহার দিতে হবে কি? তা যদি দরকার হয় ত বলবেন। কিন্তু সে ১০ টাকার কমে হবে না, আরও ২।১ জন সঙ্গে নিতে হবে কিনা।"[১১৬]

কেবলরামের চেহারার বর্ণনাটিও উল্লেখযোগ্য—"পেনছুট চুলে টেড়ি কাটা চক্ষুবসা, খালি গা এক যুবক।"[১১৭]

পতিতার প্রতি প্রীতি শরৎ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্রের মতে নারীত্ব এবং সতীত্ব এক জিনিষ নয়, দেহ অপেক্ষা অন্তর বড়। যৌবনের দুঃসহ তাগিদে অথবা সমাজের অত্যাচারের ফলে কোন নারী যদি তাহার দেহটাকে পবিত্র না রাখিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার চরিত্রের অন্যান্য মানবিক গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষায়—

"এরাও মানুষ, এদেরও হৃদয় আছে এবং হৃদয়ের যে সব সৎ প্রবৃত্তি, তাও এদের মরে যায়নি। আর কেন যে এরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে সেজন্য দায়ী তো এরা নয়, দায়ী আমাদের সমাজ। এই হৃদয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের সংসারের সতী সাধ্বীদের চাইতে এরা কোন অংশে কম নয়।"[১১৮]

শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের উপর শরৎচন্দ্রের পতিতাপ্রীতির প্রভাব পড়িয়াছিল অপরিসীম। সমসাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাইলেই শরৎ প্রভাবিত গল্পের দেখা পাওয়া যাইত। সম্ভবত ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই 'পরশুরাম' লিখিয়াছেন—

"নিবারণ প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকাই এক একটি সতী সাধ্বী বারাঙ্গনা।"[১১৯]

প্রভাতকুমারও যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহার যুগের আধুনিক লেখকদের

একহাত লইয়াছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রভাতকুমারের স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁহার শেষদিক-কার গল্পগুলিতে বিদ্রূপের তিক্ততা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'উপন্যাসিক' এইরূপ একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প। গল্পটির মাধ্যমে আধুনিক লেখকদের কটাক্ষ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। গল্পটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইহা দেখিয়া নগেন্দ্রবাবুও আবার খাতা বাঁধিলেন। ৩।৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্ট মুলক একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই মুল্যবান জিনিষ নহে, যাহার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে তাহার মুলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই।……………এই উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের মুর্খ অন্ধ সমাজ যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া দুরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই যথার্থ স্বর্গের দেবী, তাহাদের হৃদয়গুলি কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র,—দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, পরদুঃখ-কাতরতা, আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতি সৎগুণাবলীতে তাহারা ভূষিত, অপর পক্ষে গৃহস্থ মেয়েদের মন অতি নীচ, অতি সঙ্কীর্ণ, তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী, কটুভাষিনী এক কথায় তাহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী।"[১২০]

জনৈক উপন্যাস লেখক পতিতাজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে গিয়া—কিভাবে নাকাল হইয়াছিলেন—'ঔপন্যাসিক' গল্পের মুল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এই প্লটটিকে ভিত্তি করিয়া। কিন্তু আধুনিক লেখকগণকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য কিছু অধিক-মাত্রায় প্রকট হইবার ফলে গল্পটির রসস্ফুর্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

'কালিদাসের বিবাহ' এবং 'পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প' লোক প্রচলিত কাহিনীর সংগ্রহ।[১২১]

॥ টীকা ॥

১। 'নবকথা' (১৩০৬), 'ষোড়শী' (১৩১৩), 'দেশী ও বিলাতী' (১৩১৬), 'গল্পাঞ্জলি' (১৩২০), 'গল্পবীথি' (১৩২৩), 'পত্রপুষ্প' (১৩২৪), 'গহনার বাক্স' (১৩২৮), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৩৩০), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৩৩৩), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫), 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প' (১৩৩৫) 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৩৩৮)।

২। "বঙ্কিমবাবুর কাজীর বিচার', লেখাটি আমার নহে। উহা আমার পুজনীয় পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত……।"

২ (ক)। 'কাজীর বিচার', 'কাটামুণ্ড', 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'শাহজাদা ও ফকীরকন্যার প্রণয়কাহিনী', 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।'

২ (খ)। " 'ভুত না চোর', 'কাটা মুণ্ড', এবং 'শাহজাদা ও ফকীরকন্যার প্রণয়কাহিনী' এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত, অনুবাদ নহে…স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি।" 'নব কথা' : ভূমিকা (২য় সং)।

৩। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৬৪।

৪। নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প পৃঃ ১৩৪-৩৫।

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : পৃঃ ২৭৮।

৬। নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প পৃঃ ১৬৪।

৭। ঐ: পৃঃ ২১০-১১।

৮। বনফুলের গল্প সংগ্রহ (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৩৭।

৯। যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প : পৃঃ ১১১-১২।

১০। বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় : দৈনন্দিন ('স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' এবং 'বর্ত্তমান' পরিচ্ছেদ দুইটি দ্রষ্টব্য)।

১১। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'তনু' (কড়ি ও কোমল) কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে চতুর্দশ কাটিয়া 'পঞ্চদশ' করিয়াছেন।

১২। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃ. ১৪০।

১৩। 'বনফুলের 'ব্যতিক্রম' গল্পের নায়িকা আভার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ—"আমি কিছুদিন চাকরী করে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোন সত্য আশ্রয় নাই।" 'ব্যতিক্রম' : পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' পৃঃ ৩৭৭।

১৪। "দেশ" : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ১৬৫।

১৫। ঐ, পৃঃ ১৬৪।

১৬। ঐ।

১৭। 'দেবী চৌধুরাণী' : ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৮১৩।

১৮। সরোজ মোহন মিত্র "ছোটগল্পের বিচিত্র কথা", পৃঃ ১৬১।

১৯। এই প্রসঙ্গে 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পের বিরিঞ্চি বাবা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

২০। পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২১। প্র, গ্র, (ব) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬।

২২। 'মায়ার খেলা' : র র—৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫১৫।

২৩। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, 'সাহিত্য' আশ্বিন ১৩০৮।

২৪। Henry Bergson : Laughter, P, 64.

২৫। হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প : পৃঃ ২০৩।

২৬। ঐ পৃঃ ১২।

২৭। ঐ

২৮। ঐ পৃঃ ২৫।

২৯। ঐ পৃঃ ২৬।

৩০। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার : পৃঃ ৮০।

৩১। গিরীন্দ্রশেখর বসু : 'স্বপ্ন' পৃঃ ১২৬।

৩২। 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প'।

৩৩। 'সাহিত্য' : চৈত্র ১৩১১।

৩৪। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২৬।

৩৫। প্রভাতকুমার 'রাধামণি দেবী', 'ব্রজবালা দেবী', শশিভূষণ ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন।

৩৬। প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩০।

৩৭। ঐ, পৃঃ ২৩২।

৩৮। হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প : পৃঃ ৪৮।

৩৯। বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ প্রভাতকুমারের 'পোষ্ট মাষ্টার' ও 'ডাগর মেয়ে' গল্পে এবং 'নবীন সন্ন্যাসী' ও 'আরতি' উপন্যাসেও পাওয়া যায়।

৪০। **Byron ; Don Juan.**

৪১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রমক্রমে এই গল্পটির নাম 'মাতৃহারা' লিখিয়াছেন। দ্রঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং) পৃঃ ২১০।

৪২। গল্পটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। প্রভাতকুমার স্বয়ং বলিয়াছেন—"এই গল্পটা আমি কতকটা কর্তব্যানুরোধে লিখিয়াছিলাম। আমার একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমাকে বলেন যে এখন মফঃস্বলে প্রায় প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া লেডী ডাক্তার হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই ব্রাহ্ম নহেন, অথচ নিজেদের ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কেহ কেহ এমন দুষ্কর্ম করেন যে তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের পর্যন্ত একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া যায়। আমি ত তবু একটু মোলায়েম করিয়া লিখিয়াছি, উহারা ইহার চেয়ে আরও ভীষণতর কর্ম করিয়া থাকে। এইজন্যই আমি এইরূপ একটি গল্প লেখা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। "মনীষা মন্দিরে" : সঙ্কল্প : অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃঃ ৪৭৮।

৪৩। ভূমিকা গল্পবীথি (১ম সং)।

৪৪। বা, সা, ই, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

৪৫। আরও আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৪৬। তুঃ 'গৃহদাহ', শরৎচন্দ্র।

৪৭। বা, সা, ই, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

৪৮। জগদীশ ভট্টাচার্য : প্র, কু, মু, শ্রে, গ, পৃঃ ১৫।

৪৯। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩২৭-২৮।

৫০। বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প, পৃঃ ১২৪।

৫১। ঐ, পৃঃ ১১৪।

৫২। মন্মথ নাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র (৩য় খণ্ড) পরিশিষ্ট (প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা) পৃঃ ৪০৭।

৫৩। চিত্রা : প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩৯৪।

৫৪। লেডি ডাক্তার : গল্পবীথি : পৃঃ ১৪২।

৫৫। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২১৪।

৫৬। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৭৬।

৫৭। মনীষা মন্দিরে : সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃঃ ৪৭৮।

৫৮। মাসিক বসুমতী : চৈত্র ১৩৩৮, পৃঃ ১০৪৭-৪৮।

৫৯। ভূমিকা : 'গল্পাঞ্জলি' (১ম সং)।

৬০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোট গল্প', পৃঃ ৩৩৩।

৬১। 'বনফুলের গল্প সংগ্রহ' (২য় খণ্ড) পৃঃ ১০৪।

৬২। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৯৩।

৬৩। 'ধেঁকি' ও 'বাধা' গল্প দুইটি এবং 'মন্ত্রমুগ্ধ' উপন্যাসটির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬৪। শরৎচন্দ্রের পালিত প্রিয় কুকুরটির নাম ছিল 'ভুলু'।

৬৫। মন্মথ নাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র, 'মানসী ও মর্মবাণী', বৈশাখ ১৩৩০, পৃঃ ২৫৬-৬৬।

৬৬। প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৮।

৬৭। গল্পটির আলোচনা ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬৮। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৬৬।

৬৮ (ক)। ঐ পৃঃ ১৫১।

৬৯। গল্পটির একাদশীতত্ত্ব নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদটি 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সায়ংসন্ধ্যা একাদশী ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার প্রতি প্রভাতকুমার তাঁহার গল্প উপন্যাসের অনেক জায়গায় কটাক্ষ করিয়াছেন।

৭০। 'আদরিণী', 'কাশী বাসিনী', 'বন্যশিশু', 'ফুলের মূল্য' ইত্যাদি গল্পেও Pathos সৃষ্টি করিয়াছেন লেখক। কিন্তু এই ধরণের গল্প প্রভাতকুমারের বেশী নাই। করুণ রস তাঁহার মানসধর্মের অনুকূল ছিল না বলিয়া মনে হয়।

৭১। ভূমিকা : 'নব কথা' (২য় সং)।

৭২। 'সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার' পৃঃ ৩৮।

৭৩। 'দেশ' : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ১৬৭।

৭৪। ঐ।

৭৫। ঐ।

৭৬। 'গল্পবীথি' : পৃঃ ৬।

৭৭। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৫৯।

৭৮। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৩০-৩১।

৭৯। 'কমলা কান্তের দপ্তর' ব র (২য় খণ্ড) পৃঃ ৫৩।

৮০। ঐ পৃঃ ৬২।

৮১। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৬৩।

৮২। 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প'।

৮৩। 'সাম্নার কীর্তি'র বস্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'তে উল্লিখিত আছে।' (বালক অংশ দ্রষ্টব্য), বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫১।

৮৪। 'গল্পবীথি' : পৃঃ ১২-১৩।

৮৫। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৮।

৮৬। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৯২।

৮৭। ঐ (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৯৬।

৮৮। 'পত্র পুষ্প' : পৃঃ ৪৪।

৮৯। 'জামাতাবাবাজী ও অন্যান্ত গল্প' : পৃঃ ৪।

৯০। রাজশেখর বসু রচিত 'রাতারাতি' গল্পের নায়ক কার্তিকও চুরি করিতে গিয়া মামাশ্বশুরের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

৯১। 'জামাতা বাবাজী ও ও অন্যান্ত গল্প', পৃঃ ৪।

৯২। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৮৬।

৯৩। ডঃ সুকুমার সেন, বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৮।

৯৪। 'স্বর্ণমৃগ' : নীহার রঞ্জন গুপ্ত, শারদীয়া কথা সাহিত্য, ১৩৬৯।

৯৫। ভূমিকা : 'গল্পবীথি' (২য় সং)।

৯৬। 'গল্পবীথি' পৃঃ ৫১।

৯৭। ব্যতিক্রম একমাত্র 'ডাগর মেয়ে'র নন্দলাল।

৯৮। John Palmer : 'Political & Comic Charecters of Shakespeare' P. 340.

৯৯। ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য 'সমীক্ষা' পৃঃ ১০৭।

১০০। র, র, (১৪ শ খণ্ড) পৃঃ ৬৯২।

১০১। 'ছোট গল্পের বিচিত্র কথা' পৃঃ ১৯৯।

১০২। 'মনতোষ' শব্দটি সংস্কৃতমতে ব্যাকরণ দুষ্ট হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত এবং প্রভাতকুমার এই বানানই ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে লক্ষণীয় যে প্রভাতকুমার মনোতোষ না লিখিয়া ব্যাকরণের মর্যাদাও রক্ষা করিয়াছেন।

১০৩। 'গল্পবীথি' পৃঃ ৫৩।

১০৪। ঐ পৃঃ ৫২-৫৩।

১০৫। ঐ পৃঃ ৭৭।

১০৬। প্রভাতকুমারের দশটি গল্প ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া Stories of Bengali Life (১৯১২) নামে বাহির হইয়াছিল। চারিটি গল্পের অনুবাদ প্রভাতকুমার স্বয়ং করিয়াছিলেন। 'উকীলের বুদ্ধি', 'খালাস', 'হাতে হাতে ফল' ও 'কাশী বাসিনী' এই চারিটি গল্প যথাক্রমে 'The Wiles of a Pleader', 'His Release', 'Swift Retribution', 'The Lady From Beneras' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা পূরণ', 'রাজ টীকা', 'কঙ্কাল', 'সম্পত্তি সমর্পণ' এবং 'ত্যাগ'—এই গল্পগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গল্পগুলি যথাক্রমে 'The Riddle Solved', 'We Crown the King', 'The Skeleton', 'The Trust Property', 'The Renunciation' নামে ১৯০৯-১০ সালের Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১০৭। 'ছোট গল্পের বিচিত্র কথা' পৃঃ ১৭৩।

১০৮। দ্রঃ 'অক্ষমের আত্মকথা', 'বনফুলের গল্প সংগ্রহ' (১ম খণ্ড) পৃঃ ১২৮।

১০৯। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৯।

১১০ (ক)। "সতীদাহ' শীর্ষক সত্য ঘটনাটি শেষ গল্পরূপে মুদ্রিত হইল। ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডলে নামক এক ব্যক্তি বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম করিতেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'Scenery Costumes and

Architecture Chiefly on the Westernside of India' এই আখ্যায়িকা সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি হইতে অনূদিত।"

১১১। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ২।

১১২। 'মাভৈঃ বিচিত্র প্রবন্ধ, র, র, (১৪শ খণ্ড)।

১১৩। প্রমথনাথ বিশী : 'সুলতার বিয়ে', 'দেশ', ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃঃ ৩৮-৩৯।

১১৪। প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৬।

১১৪ (ক)। গল্পটির লেখককৃত প্রাথমিক খসড়ার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১১৫। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৯৫।

১১৬। ঐ পৃঃ ২৯১।

১১৭। ঐ।

১১৮। গোপাল চন্দ্র রায় : 'শরৎচন্দ্র', পৃঃ ২০৫।

১১৯। পরশুরাম 'বিরিঞ্চি বাবা ও অন্যান্য গল্প' পৃঃ ৫।

১২০। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৬৬-৬৭।

১২১। 'পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত গল্প', ১। এস মূর্খ ২। দারিদ্র দাহন ৩। গর্বিত কবি ৪। মূর্খ ব্রাহ্মণ ৫। আসল ও নকল ৬। কালিদাসের বৈরাগ্য, এই ছয়টি কাহিনীর সংকলন। 'মানসী ও মর্মবাণী', ভাদ্র ১৩২৫।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প : সামগ্রিক আলোচনা

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"ছোট গল্পে চরিত্রবিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই যাহাতে পর্দায় পর্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায়, অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে।··· যদি ছোট গল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে যাহা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে না অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, তাহা হইলে সে ছোট গল্প ভাল হইল না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল, তাহা হইলে দুই-ই বিফল।"[১]

দেখা যাইতেছে ছোট গল্প বলিতে প্রভাতকুমারের ধারণা ছিল যে ছোট গল্পে ঘটনার বাহুল্য থাকিবে না, ঘটনার সহিত চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিবে এবং গল্পে বর্ণিত চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বিকশিত ভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রভাতকুমারের পর ছোটগল্প সম্পর্কে পাঠকের ধারণা বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে, ছোটগল্প লেখাও হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রভাতকুমার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা আজও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ছোটগল্প সম্পর্কে জনৈক বিদেশী সমালোচক বলিয়াছেন—

" .....a short-story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness af aim and directness of method".[২]

জীবনের অসংখ্য তরঙ্গ, অগণিত সমস্যা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে মাত্র একটি তরঙ্গ, একটি সমস্যা, একটি অভিজ্ঞতার একমুখী বিবরণ হইতেছে ছোটগল্প—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প।"[৩]
অন্যত্র কবিতায় বলিয়াছেন—

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,

সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রু জল
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"[৪]

প্রভাতকুমার ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের গুণগ্রাহী। ছোটগল্প বিচার করিতে বসিয়া তিনি ফরাসী সাহিত্যেই ছোটগল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

"ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টা কিছুই নহে, ঘটনা তুচ্ছ বলিলেও হয়, কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্রভাবের লহরী খেলিতে থাকে।"[৫]

প্রভাতকুমারের ছোটগল্পগুলিও ফরাসী ছোটগল্পের সহিত তুলনীয় এবং এই তুলনা ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫) স্বয়ং করিয়াছেন। একটি পত্রে তিনি প্রভাতকুমারকে লিখিয়াছেন—

"......তোমার গল্প আমার খুবই ভাল লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে···।"[৬]

প্রভাতকুমারকে মোপাসাঁর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অদ্যাবধি সমালোচকেরা সেই তুলনার জের টানিয়া চলিয়াছেন। জনৈক আধুনিক সমালোচক লিখিয়াছেন—

"প্রভাতকুমার মোপাসাঁর মতই ছোটগল্পের রূপদক্ষ শিল্পী। মোপাসাঁর মতই প্রভাতকুমারও জীবনের ভাষ্যকার নন, উন্মেষকার। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মোপাসাঁর সঙ্গেই তাঁর শিল্পের গোত্রবর্ণের সমধিক সাদৃশ্য।"[৭]

অন্য একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়।......মপাসাঁর মত প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মত তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দুজনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিকরূপে মপাসাঁ ফ্রানসে বিশেষ সম্মান পাননি, বাঙলাদেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।"[৮]

মোপাসাঁর সহিত প্রভাতকুমারের উপরোক্ত সমালোচকদ্বয়ের প্রদর্শিত সাদৃশ্য বহিরঙ্গমূলক। রসপরিণতি অথবা দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া উভয় লেখকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মোপাসাঁ ছিলেন দুঃখবাদী, জীবনের নির্মম অংশটিই তাঁহার নজরে বেশী করিয়া

পড়িয়াছে, অপর দিকে প্রভাতকুমার ছিলেন আনন্দবাদী। আমরা Horace Walpole-এর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিতে পারি—"This world is a comedy to those who think, a tragedy to those who feel". মপাসাঁ জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন প্রভাতকুমার সেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। অবশ্য প্রভাতকুমার জীবনের ট্রাজেডি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না একথা বলা চলে না, কিন্তু সম্ভবত তাঁহার মনের কথা ছিল—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"[৯]

জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচন করিতে গিয়া প্রভাতকুমার দুঃখ এবং গভীর বেদনাবোধকে এড়াইয়া গিয়াছেন। দুঃখ, হতাশা এবং আশাভঙ্গের বেদনা যে প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে নাই তাহা নহে, কিন্তু দুঃখ সেখানে সুখকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার পটভূমিকা মাত্র। 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'আদরিণী' ইত্যাদি করুণরসাত্মক গল্পগুলির কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছি। কারণ এই গল্পগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অগভীর। এইজন্যই তিনি উপন্যাস রচনায় বিশেষ সার্থক হইতে পারেন নাই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যই তাহাকে বাঙলা সাহিত্যের আসরে সার্থক ছোট-গল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। প্রভাতকুমার একদিকে জীবনের ছোটখাট ভুল ভ্রান্তি, বৈষম্য, অসঙ্গতি ও স্বার্থবুদ্ধি অপরদিকে মানুষের উদার আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব, সংযমকে গল্পে রূপায়িত করিয়াছেন।

কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মিল যেন বেশী। ছোটগল্প সাধারণত উপন্যাসের ন্যায় পুরাপুরি বিষয়মুখ (objective) রচনা নয়, বরং অনেকাংশে গীতিকবিতার ন্যায় আত্মমুখ[১০] (subjective) রচনা। ছোটগল্পের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রতিফলিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য ঘটনা আমাদের মানসপুকুরে ছায়া ফেলিতেছে। এই সকল ঘটনার দর্শন অথবা শ্রবণ জনিত প্রতিক্রিয়া সকলের পক্ষে সমান হয় না। একই ঘটনা, একই পরিবেশ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। তাই কবিদের চিরসুন্দর চাঁদ আধুনিক কোন কবির নিকট ঝলসানো রুটি[১১] বলিয়া মনে হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ছোট গল্প লেখকও যখন বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের ভিতর হইতে একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে, একটি বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকের দ্বারা বিচার করিতে বসেন, তখন তাঁহার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিই তাহাকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে ছোট গল্পের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে গল্প লেখকের জীবন দর্শনই প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে সমারসেট মমের মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য—

"The subject a writer chooses, the character he creates, his attitude towards them are conditioned by his bias. What he writes is the expression of his personality and manifestation of his instincts, his emotions, his institutions and his experience". [১২]

প্রভাতকুমারের গল্পগুলি আলোচনা করিলে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। আমরা অন্যত্র প্রভাতকুমারের 'পয়ের চিঠি' গল্পটির সহিত 'বনফুল' রচিত 'স্ত্রী চরিত্র' গল্পটির তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি যে উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই প্রকাশ পাইয়াছে গল্প দুইটির মধ্য দিয়া যদিও গল্প দুইটির প্লট ও টেকনিকে সাদৃশ্য বর্তমান। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) প্রভাতকুমারের অগ্রজ লেখক। তাঁহার একটি গল্প 'রূপসী হিরণ্ময়ী'র[১৩] সহিত প্রভাতকুমারের 'হীরালাল' গল্পটির তুলনা চলিতে পারে। উভয় গল্পেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। 'রূপসী হিরণ্ময়ী' গল্পে হিরণ্ময়ী নিজ স্বামীকে হত্যা করিয়া যে পাপ করিয়াছিল লেখক তাহার ভয়াবহ পরিণাম বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দরী হিরণ্ময়ী নারকীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘদিন পুতিগন্ধময় শরীরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে পশুর মৃত্যু বরণ করিয়াছে।[১৩(ক)] প্রভাতকুমারের নীরদাও স্বামীকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। অথচ এই ব্যভিচারিণী নৃশংস রমণীর প্রতিও লেখকের করুণার অভাব হয় নাই। তাই লেখক, পাপিষ্ঠা নীরদাকে পতিতালয়ে নির্বাসন দিলেও সেখানে যে তাহার অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইবে না তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। পাপের কোন ভয়াবহ চিত্র প্রভাতকুমার আঁকেন নাই কিন্তু পাপের পরিণাম চিত্রণে ত্রৈলোক্যনাথের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া মনে হয়। এইখানেই লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের মতই সাধারণ মানুষকে তাঁহার গল্পের উপাদান করিয়াছিলেন। "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল"...[১৪] প্রভাতকুমারের ছোটগল্প ইহাদের লইয়াই রচিত। উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গিতে অথবা দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রপ্রভাবের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট গল্প সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। তবে উপন্যাসের ন্যায় ছোটগল্পেও প্রভাতকুমার রবীন্দ্রকাব্য হইতে বহুল উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রপ্রীতির পরিচায়ক।

উপন্যাসপ্রসঙ্গে আমরা প্রভাতকুমারের উপর বঙ্কিম প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও প্রভাতকুমার প্লট পরিকল্পনায়, নামকরণে, সংলাপের অনুসরণে, সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা

প্রভাবিত। তাঁহার বঙ্কিমপ্রীতি বা বঙ্কিমী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক সময়ই গল্পের চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রভাতকুমার আধুনিক সাহিত্যকে যেখানে কটাক্ষ করিয়াছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার ভরসাস্থল হইয়াছেন। 'বিনোদিনীর আত্মকথা' গল্পে বিনোদিনীর উক্তি—

"এই সময় 'চন্দ্রশেখর' পুস্তকখানি আমার হাতে পড়িল।...বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। কপালদোষে বিবাহের পূর্বেই কোন মেয়ের যদি অন্য পুরুষের প্রতি মন গিয়া থাকে, তবে বিবাহের পর তাহার কর্তব্য কি, তাহা 'চন্দ্রশেখর' পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই পতিভক্তি বিনা সাধনায় লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার মত দুর্ভাগিনী যাহারা, তাহাদের ঐ বস্তুটি লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইতে হইবে,—হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ইহাই চন্দ্রশেখরের উপদেশ বলিয়া বুঝিলাম এবং তদনুসারেই নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিব স্থির করিলাম।"[১৫]

কিন্তু আধুনিক উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া ক্রমশ বিনোদিনীর মত পরিবর্তিত হইল—

"দেখিলাম, আজকালকার বড় বড় লেখকদের মতে, বঙ্কিমবাবু নিতান্তই সেকেলে লেখক। প্রাণ যাহাকে চায়, যাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর 'নারীত্ব' সফল হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে যত্নবতী হওয়া উচিত। নবযুগের নবীন আলোক আমদানী-কারক এই ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে কাহারও হস্তে যদি 'চন্দ্রশেখর' সংশোধনের ভার থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই গভীর জলে সন্তরণ কালে প্রতাপকে দিয়া শৈবলিনীকে ওরূপ দারুণ শপথ করাইতেন না। তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া, কোনও নিভৃত কুটীরে স্থাপন করিয়া আর্টের নগ্নচিত্র আঁকিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকবোধোদয় বিদ্যাবতী যুবতীগণকে মোহিত করিয়া দিতেন।"[১৬]

গল্প হিসাবে 'বিনোদিনীর আত্মকথা'র বিশেষ মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রভাত-মানসের অভ্রান্ত নির্দেশ বলিয়া গল্পটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'হতাশ প্রেমিক' গল্পেও লেখক এই ভাবে 'চন্দ্রশেখর' প্রসঙ্গ আনিয়া আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের প্রতি কটাক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

"প্রবোধ না জানিয়া শৈলকে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত তিরস্কার করিতেছে। শৈল কি উত্তর করিতেছে? সে কি বলিতেছে, আমরা এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটিয়াছিলাম। তুমি ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?"[১৭]

"আমি কয়েকখানি আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছি, তাহাতে লেখকগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না, পরস্পরের প্রেম থাকিলেই

তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবলমাত্র লৌকিক বিবাহের বন্ধনই যাহাদের একমাত্র বন্ধন, তাহাদের পারস্পরিক সাহচর্যকে একটা অতি কদর্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনটাই তাঁহারা যথার্থ মিলন বলিয়া মনে করেন।"[১৮]

"প্রেমহীন বিবাহে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি নারী চিত্তের একটা সেকেলে অন্ধ সংস্কার মাত্র।"[১৯]

'বিনোদিনীর আত্মকথা' প্রকাশের প্রায় তিন মাস পূর্বে (১৬ই আষাঢ় ১৩৩০) শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটির উল্লেখ করেন—

"সম্প্রতি একটা কলরব উঠিয়াছে যে আধুনিক উপন্যাস লেখকেরা বঙ্কিম সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণধারণ, চরিত্র সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়। ইহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন।......ধরা যাক—তাঁহার চন্দ্রশেখর বই। শৈবলিনীর সম্বন্ধে লেখা আছে—"এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল"। এই এমনিটা হইতেছে—নক্ষত্র দেখা, নৌকার পাল গণনা করা, মালা গাঁথিয়া গাভীর শৃঙ্গে পরাইয়া দেওয়া, আরও দুই একটা কি আছে আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্তী ঘটনা অতিশয় জটিল। গঙ্গায় ডুবিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবের নৌকায় চড়িয়া পরপুরুষ কামনা করিয়া স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি সে সমস্তই নির্ভর করিয়াছে শৈবলিনীর বাল্যকালে এমনি করিয়া যে প্রেম জন্মিয়াছিল তাহারই উপর।......কিন্তু এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায়, শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কিনা, এবং এতবড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কিনা। প্রতাপ অতবড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলা-ক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন আর সে করিয়াছে! শৈবলিনী পরস্ত্রী গুরুপত্নী—নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করেনা এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়। আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়। সংসারের উপর নিজের স্ত্রীর উপর এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না। আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা আত্মহত্যায় আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?"[২০]

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি প্রভাতকুমারের ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বুঝিতে সাহায্য করিবে।

'বিনোদিনীর আত্মকথা' এবং 'হতাশ প্রেমিক' ছাড়া অন্যত্রও প্রভাতকুমার আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। বলা যায় যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি তাহার সদ্‌ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে 'সতীর পতি', 'গহনার বাক্স' এবং 'ঔপন্যাসিকে'র নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই আক্রমণের লক্ষ্য সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী বলিয়াই মনে হয়। এই তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়ত্ব ছিল অপরিসীম। 'কালিকলমে' (ভাদ্র ১৩৩৪) মণিবজ্র ভারতী ছদ্মনামে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে আজ আমাদের অনেক জিনিস সম্ভবপর হয়েছে। নারী আজ তার সতীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। এখন আমাদের মধ্যে মনে এই কথা জাগ্রত হয়েছে যে নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে এর নির্ভীক উত্তর পেয়ে পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।"[২১] অপর পক্ষে শরৎচন্দ্র প্রভাত-কুমারের রচনা সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন তাঁহার পরিচয় এই উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যাইবে—

"কই প্রভাতবাবুর লেখা দেখলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্বিত চর্বন করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না··।"[২২]

প্রকৃত কথা এই যে নারীর সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য সম্বন্ধে প্রভাতকুমার রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁহার বিলাতী শিক্ষাদীক্ষা তাঁহার এই রক্ষণশীল মনোভাবের উপর কিছুটা আধুনিকতার প্রলেপ দিয়াছিল মাত্র। সেইজন্য দেখি তিনি বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন ('ধর্মের কল', 'পোষ্ট মাস্টার') কিন্তু কিশোরী বিধবা, যে স্বামীকে লইয়া অন্তত কিছুকাল ঘর করিয়াছে, তাহাকে দিয়া স্বামীর স্মৃতি পূজা (ফোটো পুজা) করাইয়াছেন ('বাপ কী বেটী')। এই ধরণের মনোবৃত্তি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই, চিনে নাই···কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রী নারী বলিয়া তার কোন স্বাধীন সত্তা নাই।"[২৩]

শরৎচন্দ্র হইতে এতটা উদ্ধৃতি দিবার কারণ, আমরা শরৎচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠী হইতে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটুকু স্পষ্ট বুঝিয়া লইতে চাই। আধুনিক লেখকেরা যেখানে অনড় জড়তা, সংকীর্ণ ধর্মবোধ আর শিথিল নীতিবোধের অচলায়তনকে ভাঙ্গিতে চাহিয়াছেন, প্রভাতকুমার সেখানে কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবের

পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গল্পের নায়িকারা একান্তভাবেই স্বামীভক্তিপরায়ণা। তাহারা বোধকরি শরৎচন্দ্র কথিত নিজেদেরকে স্বামীর জিনিষ বলিয়াই মনে করে। তাই দেখি পত্নীবিমুখ স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া, স্ত্রী চুপি চুপি তাহার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে চায় (বউ চুরি) কিংবা স্বামীর আর একটা স্ত্রী ছিল জানিতে পারিয়াও নায়িকার মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ অসন্তোষ বা প্রতারিতার মর্মযাতনা জাগে না। বরং সে আশ্বস্ত হয় যে তাহার স্বামী চরিত্রহীন নয়, তাহাকে বোকা বানাইয়া তাহার স্বামী প্রত্যেক রাত্রে হাওয়া খাইতেই যাইতেন বটে তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে উহা বিশুদ্ধ বায়ু, দুষিত হাওয়া নহে (নুতন বউ)। আরও একটি উদাহরণ দিতেছি—'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'। 'নুতন বউ' গল্পটির নায়কের মত এই গল্পের নায়কও এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে। এক পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য স্ত্রী গ্রহণ গল্প লেখকদের পক্ষে একটি সমস্যা। দুই পত্নী লইয়া অবলীলাক্রমে ঘর সংসার করিতেছে এমন চিত্র কেহ আঁকেন নাই বটে, তবে একটি স্ত্রীকে অপসারিত করিবার যে পথ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়িয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথ হইতেন তবে মনে করি 'বিষবৃক্ষ' 'মধ্যবর্তিনী' রূপ ধারণ করিত।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে শৈলবালার মৃত্যু হরসুন্দরী ও তাঁহার স্বামীকে পুনর্মিলিত করিল বটে, কিন্তু সত্যকার যে বাধা, সেটি অনপসারিতই থাকিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি গল্পে স্বয়ং দীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—

"অনেকদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে তাহার পরিণতি ও পরিবর্তন।"[২৫]

কিন্তু মন জিনিসটা প্রভাতকুমারের গল্পে কোন সমস্যাই নয়, তাই দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও স্বামীর পুনর্বিবাহ সরোজবাসিনী ও শ্রীবিলাসের মধ্যে কোন বড় দরের মন কষাকষি সৃষ্টি করেনাই। দ্বিতীয়ার মৃত্যুর পর 'এই দম্পতি প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মত সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন।'[২৬]

আসলে প্রভাতকুমার তাঁহার গল্পের নায়ক-নায়িকাকে শেষ পর্যন্ত অসুখী করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, বাস্তবতার খাতিরেও নহে। আর বাস্তব সম্বন্ধেও ভিন্নমতের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে স্থান পায় যা তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চার পাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।"[২৭]

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসের 'বাস্তব'ও তাহাই, সে তাহার সৃষ্টিকর্তার বাছাই করা ধন। ঘটে যা, তা সব সত্য নয়—যা ঘটা উচিত ছিল, ঘটিলে জীবনের পরিণতি সুখকর হইত প্রভাতকুমার তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। তাঁহার গল্পে মিশাইয়া আছে কিছু রূঢ় 'বাস্তব' আর কিছু সম্ভাব্য অবাস্তব। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁহার গল্পের এই অবাস্তবতা কেবলমাত্র ঘটনাগত, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় বাস্তব। কোন প্রকার ভাবালুতার ধার তাহারা ধারে না, তাহা জৈবিক প্রেম সম্পর্কীয় হউক অথবা দেশপ্রেম সম্পর্কেই হউক। জীবন, জগৎ, ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহাদের কোন সুচিন্তিত অভিমতও নাই। দোষে গুণে মিশ্রিত সাধারণ মানুষ তাহারা, তাই এক স্ত্রী মারা গেলে তাহারা সামান্য আপত্তি জানাইয়া পুনরায় 'ডাগর মেয়ে'র সন্ধান করে, দেশোদ্ধারের হুজুগে না মাতিয়া সেই আন্দোলনের ঢেউকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায়, সৎ এবং শিক্ষিত যুবক চাকুরী লাভের জন্য চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। সর্বপ্রধান কথা হইল এই যে চরিত্রগুলির এই প্রকার আচরণেও পাঠকের মনে প্রসন্নতা ছাড়া আর কোন ভাব জাগে না, কারণ লেখকেরই প্রসন্ন সহানুভূতি রহিয়াছে তাহাদের উপরে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার একটু তুলনামুলক আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণ তাহার প্রথমা স্ত্রীকে যথেষ্টই ভালবাসিত। তথাপি তাহার চিত্ত অন্য নারীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। লেখক কিন্তু ব্যাপারটির সহজ নিষ্পত্তি করেন নাই। দক্ষিণাচরণকে শেষ পর্যন্ত মনোবিকলনের কবলে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের মহেন্দ্র (যুবকের প্রেম) দক্ষিণাচরণের মত গভীর অনুভূতিসম্পন্ন নহে, সে যখন বুঝিল 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' সে ত কোন্ ছার, তখন মৃতা স্ত্রীর লিখিত চিঠির বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বিবাহ করিল। কিন্তু গভীর অনুভূতি থাকুক অথবা নাই থাকুক সংসারের পনের আনা লোকই যে, মহেন্দ্রের মতই সাধারণ সে কথা বোধহয় তর্কাতীত। রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পে দেখি ডাক্তার শম্ভুচরণ সেন বিবাহের আসর হইতে বরকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কন্যার পিতার এইরূপ অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ পাঠককে উদ্দীপ্ত করে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এইরূপ বলিষ্ঠ চিত্ত কন্যার পিতার সাক্ষাৎ পাইলে আমরা আনন্দিত হই, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তাহার বিপরীত। প্রভাতকুমারের কন্যার পিতারা কিন্তু নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

তাঁহারা "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু।" তাঁহাদের বক্তব্য "মেয়ের বাপ যখন হয়েছি, তখন শত্রু হাসলেই বা করবো কি? কবি বলে গেছেন, 'কন্যা পিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। খুব ঠিক কথাই বলে গেছেন।"[২৮] তাই তাঁহাদের আত্ম সম্মান খাটো না করিয়া উপায় নাই।

'যুবকের প্রেম', 'মুক্তি', 'লেডি ডাক্তার' এবং 'বিলাতী রোহিণী' এই গল্প কয়টির মধ্য দিয়া প্রভাতকুমারের একটি বিশিষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি এই, গৃহে যাহাদের কোন আকর্ষণ নাই সেইরূপ নায়কেরা অবিবাহিত, বিবাহিত অথবা বিপত্নীক যাহাই হউক না কেন, নিজেদের প্রলোভন এবং কুপথ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এই অক্ষমতার কথা তাহারা যখনই উপলব্ধি করে তখনই অবিবাহিত অথবা বিপত্নীক হইলে বিবাহে উদ্যোগী হয় এবং বিবাহিত হইলে স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়। 'যুবকের প্রেমে'র মহেন্দ্র এবং 'লেডি ডাক্তারে'র সত্যেন্দ্র উভয়েই বিপত্নীক ছিল তাই তাহারা যথাক্রমে এল্সি ও সুবালার ফাঁদে পা দিয়াছিল। 'বিলাতী রোহিণী' গল্পের অবিবাহিত নায়ক বিলাতে জনৈকা বিদেশিনীর কবলগ্রস্ত হইয়াছিল। লেখক নব-নিশাকরের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। 'মুক্তি' গল্পের নায়ক নরেন বিলাতে উচ্ছৃংখলতার গভীর আবর্তে যখন তলাইয়া যাইতে বসিয়াছে লেখক তাহার চরিত্র রক্ষার জন্য তখনই তাহার স্ত্রী নির্মলাকে বিলাতে লইয়া গিয়া তাহার হাতে স্বামী রত্নটিকে সমর্পণ করিয়াছেন। লেখক স্পষ্ট বুঝিয়াছেন এইবার আর নরেনের জারিজুরি খাটিবে না। এই প্রসঙ্গে 'বাল্যবন্ধু' গল্পে লেখকের নিজস্ব মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য—

"ভুল বলিতেছ নলিনী ভুল বলিতেছ। যদি অবিবাহিত থাকিতে, তবে কোনকালে তুমি রসাতলে পৌঁছাইয়া যাইতে। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সে কাহাদের মুখ চাহিয়া?"[২৯]

গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি এবং দাম্পত্য জীবনের প্রতি প্রভাতকুমারের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় উদ্ধৃতিটিতে পরিস্ফুট। এই পরিচয় তাঁহার 'নবীন সন্নাসী' উপন্যাস এবং 'ভুল ভাঙ্গা' গল্পেও লভ্য। যথাস্থানে সে আলোচনা আমরা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। ভারতীয় আদর্শ নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধকে কখনও স্বীকার করে নাই। প্রভাতকুমারও এই প্রাচীন আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইংরাজ রমণী সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

ইংরাজ রমণীর একটা প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ আছে, যাহা আমাদের রমণীর মধ্যে দেখি না। আমাদের ধর্ম, আমাদের শাস্ত্র বহু শতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও অনুশাসনের দ্বারায় হিন্দুরমণীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বটুকু লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন···কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ

করিলে নগেন্দ্রনাথ সুখী হইবেন সুতরাং সূর্যমুখী নিজেই তাহার উদ্যোগিনী হইলেন। আপনার সুখ দুঃখ গণনার মধ্যেই আনিলেন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন না, তুমি আমায় অপমান করিতেছ। যেখানে আমিই নাই, সেখানে মানই বা কি, অপমানই বা কি? আমাদের দেশে সকল স্ত্রী সূর্যমুখী তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু আদর্শ তাহাই।৩০

এই সনাতন আদর্শের প্রতিই প্রভাতকুমারের শ্রদ্ধা, অথচ তাঁহার বিলাত ফেরৎ ও ঠাকুরবাড়ী প্রভাবিত আধুনিক মনটি নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার অনেক গল্পেই একটি আপোসের (compromise) ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুটা যেন 'ইহাও থাক উহাও থাক' জাতীয় ভাব। এই জন্যই আমরা প্রভাতকুমারকে 'রক্ষণশীল আধুনিক' বলিতেছি এবং এই কারণেই তাঁহাকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই যুগন্ধর সাহিত্যিকের মধ্যকার সংযোগসেতু আখ্যা দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি (বেশ কিছুটা রবীন্দ্র প্রভাবিত) সম্মুখে প্রসারিত, যদিও সে দৃষ্টি যে সর্বত্র স্বচ্ছ তাহা বলা যায় না। পক্ষান্তরে প্রভাতকুমারের বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রভাবিত স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত হইলেও একেবারে পশ্চাৎ-বিমুখ নহে।

'কানাইয়ের কীর্তি' গল্পের মিস. বীণা, 'বিলাসিনী' গল্পের উষা, 'চিরায়ুষ্মতী' গল্পের প্রভাকে আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। 'প্রতিমা' এবং 'গরীব স্বামী' উপন্যাস দুইটিও উল্লেখযোগ্য। এই নায়িকারা পিতা বা স্বামীর একান্ত আজ্ঞাবহ নয়, তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। শেষ পর্যন্ত তাহাদের মর্যাদা এবং অভিভাবকদের মর্যাদা উভয়কেই বজায় রাখিবার জন্য লেখককে অভিনব ঘটনা সংঘটনের আয়োজন করিতে হইয়াছে—যাহাতে দুই কুলই বজায় থাকে। বীণার প্রণয়ী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বীণাকে প্রেমের দায় হইতে মুক্তি দিল, উষার ব্যবহারে স্বামী প্রথমে যতই ক্ষুণ্ণ হউন না কেন অবশেষে সুখ-সমাধান হইয়া গেল এবং প্রভা যদিও জিদ করিয়া প্রায় শ্মশানযাত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল, তথাপি তাহার সিঁদুরের জোর সেই মরণপথ-যাত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া আনিল, সর্বত্রই আপোস। এই আপোস প্রচেষ্টা যে শুধু নরনারীর প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, যেখানেই প্রাচীন ও অর্বাচীন মতাদর্শের মধ্যে সংঘাতের উপক্রম হইয়াছে সেইখানেই লেখক মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। প্রভাতকুমারের শেষ দিককার গল্পেই আবার এই প্রচেষ্টা বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এইজন্যই প্রভাতকুমারের প্রথম জীবনের গল্পগুলির মধ্যে

যে রসস্ফূর্তি দেখা যায়, শেষের রচনাগুলিতে তাহার একান্ত অভাব। 'ষোড়শী'র 'সচ্চরিত্র' এবং 'হতাশ প্রেমিকে'র 'অলকা' গল্প দুইটিকে তুলনা করিলে আমাদের মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। 'সচ্চরিত্র'র নায়ক সুরেন পতিতার কন্যাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভালবাসায় উপন্যাসসুলভ উচ্ছ্বাস যতটা ছিল আন্তরিকতা বোধকরি তাহার শতাংশও ছিল না। তাই তাহার প্রেমের মোহ ক্রমশঃ ফিকা হইয়া আসিল এবং অবশেষে যখন প্রেমিকার নিকট হইতে সত্যকার আহ্বান আসিল তখন্ সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইল। মাকে গিয়া বলিল কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম। সুরেন আদর্শ চরিত্র নয়, মহৎ প্রেমিকও নয় বরং ফাঁকা অহমিকাবোধে পূর্ণ অস্থিরমতি যুবক। কিন্তু গল্পটি সার্থক। ঘটনার বাহুল্য নাই, সামান্য ইঙ্গিতে অল্প মন্তব্যের মাধ্যমে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। অথচ প্রায় অনুরূপ প্লট লইয়া রচিত গল্প 'অলকায়' লেখক দুই কূল অর্থাৎ প্রেম ও সংস্কার বজায় রাখিতে গিয়া কত অসাধ্যসাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। হঠাৎ তক্তপোষের নিচে হইতে কুড়ি বৎসর পূর্বেকার লাহোর হইতে প্রকাশিত 'আর্য পত্রিকা' বাহির করিতে হইয়াছে। এইরূপে সমস্যার সমাধান হইয়া যাওয়াতে গল্পে সকল পাত্র-পাত্রীর মন ভাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে গল্পটিও মাঠে মারা গেল। এইভাবে জাতিকুল বাঁচাইয়া প্রেমকে রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে প্রেমের পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রভাতকুমারের নিকট বিবাহ-নিরপেক্ষ প্রেম মর্যাদা পায় নাই, কারণ তাহা হইলে হয় ব্যর্থ প্রেমকাহিনী লিখিতে হয় অথবা অবৈধ প্রেমকে রূপায়িত করিতে হয়। দুইটিতেই প্রভাতকুমারের সমান অনভিরুচি। সেইজন্য লেখক যেখানে প্রেমকে বিবাহের বন্ধনে সার্থক করিতে পারেন নাই সেখানে দেখাইয়াছেন যে সে প্রেম মোটেই প্রেম নয়, তাহা শিকারী বিড়ালের ইঁদুর ধরিবার কৌশল মাত্র। 'বিলাতী রোহিণী', 'লেডি ডাক্তার', 'কানাইয়ের কীর্তি' এবং 'ঘড়ি' এই গল্পগুলিতে এইরূপ প্রেমের পরিচয় মিলে। নিষিদ্ধ অথচ পারস্পরিক খাঁটি প্রেমের চিত্র পাই 'মাতৃহীন', 'হিমানী' এবং 'সতী' গল্পে। এই তিনটি গল্পেই প্রেম মিলনের মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারে নাই। 'হিমানী' এবং 'সতী' গল্পে মৃত্যুর দ্বারা সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। 'হিমানী' গল্পে নায়িকা হিমানীর এবং 'সতী' গল্পে নায়ক-নায়িকা দুইজনেরই আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। আকস্মিক মৃত্যু যত দুঃখজনকই হউক না কেন রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে দুইজনেরই মৃত্যু হইল সেখানে পাঠক দুঃখ করিবে কাহার জন্য? আমরা পূর্বে আপোস প্রচেষ্টার কথা বলিয়াছি সেই মনোভাবের ফলেই 'হিমানী' ও 'সতী' গল্প দুইটির এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে

বলিয়া মনে হয়। প্রেমের মর্যাদা এবং বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা উভয়কেই বজায় রাখিতে গিয়া লেখক হিমানীর অদ্ভুত মৃত্যু ঘটাইয়াছেন। 'সতী' গল্পে লেখক বার্থার চরিত্রটি যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হিন্দু সংস্কারই পরিতৃপ্ত হয়। বিদেশী ও বিধর্মী স্ত্রীকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতেছে এরূপ চিত্র সে যুগের হিন্দু সমাজে সম্ভবপর ছিল না এবং লেখকও সম্ভবতঃ সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করিতে চাহেন নাই। ফলে 'সতী' গল্পে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 'মাতৃহীন' গল্পেও লেখক হিন্দু যুবক এবং খ্রীষ্টান যুবতীর প্রেমকে সার্থক হইতে দেন নাই। কিন্তু কুমারী ক্যাম্বেলের একনিষ্ঠ প্রেম এবং আজীবন প্রেমিকের স্মৃতি পূজার মধ্যেও হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্যধর্মই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে কুমারী ক্যাম্বেলও সতী রমণী। এই তিনটি গল্পের মধ্যে 'মাতৃহীন' গল্পটির পরিণতি স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া গল্পটি সার্থক হইয়াছে।

উপন্যাসের ন্যায় ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক। যুক্তিসঙ্গত কারণেই ডঃ সুকুমার সেন তাঁহাকে 'জন্ম রোমান্টিক'৩১ বলিয়াছেন। জীবনের অন্ধকার দিকটিকে প্রভাতকুমার তাঁহার গল্পে যেন স্থান দিতে চাহেন নাই। তাঁহার গল্পের মুল রস হাস্য কৌতুক। ঈষৎ ব্যঙ্গের স্পর্শ যে তাঁহার কোন গল্পে নাই তাহা নহে, তবে তাহা কোথাও উগ্র হইয়া উঠে নাই।

ইংরাজিতে বিভিন্ন প্রকার হাস্যরস বুঝাইবার জন্য **Wit, Humour, Satire, Irony, Sarcasm** ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলাতে আমরা ব্যঙ্গ কৌতুক, বিদ্রূপ ইত্যাদি শব্দগুলির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার হাস্যরস বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এগুলির নাই। প্রভাতকুমার যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে আমরা **Humour** বলিতে পারি। ডঃ সুকুমার সেন সুন্দরভাবে হিউমারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"হিউমার এবং বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, হিউমারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আমাদের সমবেদনা আসে, কিন্তু বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গে ঠিক তার বিপরীত ভাব হয়। হিউমারে দৃষ্টি হয় ব্যাপক। এতে বিষয়ীভূত ব্যক্তিহীনতা তুচ্ছতা, দোষত্রুটি সবই যেন রঙ্গীন কাঁচের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে এমন ভাবে পড়ে যাতে করে তার দোষ ত্রুটির তীব্রতা মন্দীভূত হয়ে যায় এবং বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে সমস্ত হীনতা, তুচ্ছতা ইত্যাদির উর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তার প্রতি আমাদের সহজ সহানুভূতি আকর্ষণ অথবা অনুকম্পার উদ্রেক করে।"৩৩

সৎ অথবা অসৎ সকল প্রকার চরিত্রের প্রতিই প্রভাতকুমারের ছিল সুগভীর সহানুভূতি। সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই প্রভাতকুমারসৃষ্ট পাষণ্ড চরিত্রগুলি খুব

উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইলেও পুরাপুরি ভিলেন, (villain) হইয়া উঠিতে পারে নাই। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কারণেই প্রভাতকুমারের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"... novelist and short story writer, marked by verisimilitude and sympathetic treatment of character."[৩৪]

এই কারণেই প্রভাতকুমারসৃষ্ট হাস্যরসকে আমরা হিউমার বলিতেছি। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রভাতকুমারের হাস্যরসও এত লঘু এবং অগভীর যে তাহাকে fun বা কৌতুক আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। প্রধানত কৌতুক এবং হিউমার লইয়াই প্রভাত-কুমারের কারবার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িককালে অসাধারণ জনপ্রিয় হইলেও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার এবং শরৎচন্দ্রের তুলনা করিয়া বিদগ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন—

"শরৎসাহিত্যের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তা যে ত্রৈলোক্যনাথের বিস্মৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অথচ ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতই অসাধারণ। তবে এমন কেন হইল? শরৎসাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজ সম্বেদ, ভাষার উজ্জ্বলতা ও ঈষৎ লঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয়ের ব্যঙ্গরঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্যমূলক হাসি এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে। অশ্রুর নিকট হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই প্রকাশ।"[৩৫]

সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। আমাদের দেশে হাসি জিনিসটা কোনকালেই বিশেষ মর্যাদা পায় নাই। হাসি বালকোচিত এবং বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। হাসির সংজ্ঞা দিতে গিয়া জনৈক প্রাচীন কবি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

বালকাদিবচোবেষবৈষম্যো জনিতা হি যা।
চেতসো বিকৃতিঃ স্বল্পা স হাসঃ কথিতঃ খলু ॥[৩৬]

সাহিত্যে কোথায় কোথায় হাসির ব্যবহার সঙ্গত তাহার নির্দেশ দিতে গিয়া অন্য একজন প্রাচীন সমালোচক বলিয়াছেন যে স্ত্রী, নীচ, বা মুর্খের হাসি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ কোন চরিত্রের হাসি 'নৈব দৃশ্যতে'—

স্ত্রী নীচ বালমুর্খাদি বিষয়ো হাস্য ইষ্যতে।
প্রহাসশ্চাতিহাসশ্চ ধীরাণাং নৈব দৃশ্যতে ॥৩৭

আমাদের প্রাচীনেরা হাসি সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিদুষক চরিত্রের মাধ্যমেই কিছুটা নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে নিতান্তই dramatic relief দেওয়ার জন্য। আধুনিক কালেও আমরা হাসিকে খুব একটা উচ্চে স্থান দিই না। আনন্দের হাসি অপেক্ষা বিষাদের অশ্রুই যেন আমাদের নিকট বেশী মর্যাদা পাইয়া থাকে।

প্রভাতকুমার হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু কোথাও ভাড়ামি করেন নাই। তাঁহার হাস্যরসের সুরুচিবোধ এবং পরিচ্ছন্নতাবোধ লক্ষণীয়। তাঁহার হাসির মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আছে যাহাতে কোন আবিলতার স্পর্শ লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বঙ্কিম সর্বপ্রথম হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথমে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয়না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।"৩৮

এই মন্তব্য প্রভাতকুমারের সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের হাস্যরসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন হাস্যকর চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই অথবা স্বয়ং কোন রসিকতা বা কৌতুক করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথচ তাঁহার রচনা-কৌশলে কৌতুক রস আপনা আপনিই জমিয়া উঠিয়াছে। জনৈক সমালোচকও ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন—

"প্রভাতকুমার এমন কতকগুলি সম্ভাব্য সিচুয়েশন কল্পনা করেছিলেন, যা অত্যন্ত হাসির। এখানে লেখক শুধু বিবরণ দাতা, narrator. প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গির অনেকটাই নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত, subjective নয় objective শ্রেণীর। তিনি স্বয়ং কোন রসিকতা করেননি বা স্পষ্টতঃ কৌতুক করবার কোন প্রয়াস করেন নি। ঘটনার গতিতে প্রবল কৌতুক আপনিই জমে উঠেছে।"৩৯

'প্রণয় পরিণাম', 'প্রতিজ্ঞাপূরণ', 'রসময়ীর রসিকতা', 'মাষ্টার মহাশয়', 'বলবান জামাতা', 'পোস্টমাষ্টার', 'পত্নী হারা', 'আত্রতত্ত্ব' ইত্যাদি গল্পগুলির গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই প্রভাতকুমারের অনায়াসসৃষ্ট হাস্যরসের সার্থক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেকটি গল্পেরই প্লট পরিকল্পনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'পত্নীহারা' অথবা 'বলবান জামাতা' গল্পের পরিস্থিতি যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তির জীবনে ঘটিতে পারে। অবশ্য প্রভাত-কুমারের প্লট পরিকল্পনা প্রত্যেকটি গল্পেই নিখুঁত একথা বলা চলে না। 'বিষবৃক্ষের ফল', 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স', 'সুধার বিবাহ', 'দাম্পত্য প্রণয়', 'ঢাকার বাঙ্গাল' ইত্যাদি গল্পের পরিকল্পনা খুব স্বাভাবিক হয় নাই, তবে একেবারে অবাস্তব তাহাও বলা যায় না। এই গল্পসমুহের প্রধান চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই অভিনয়নিপুণ এবং ষড়যন্ত্র কুশলী। 'ঢাকার বাঙ্গাল' গল্পের পরেশের ইচ্ছামুর্চ্ছা, 'যোগবল না সাইকিক ফোর্সে'র নায়িকার ইচ্ছামুকত্ব, কিংবা 'বিষবৃক্ষের ফল' গল্পের যুবকত্রয়ের বৈষ্ণবীরূপধারণের ঘটনা যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুটা অতিরঞ্জিত। অবশ্য অতিরঞ্জন এবং অতিশয়োক্তি কৌতুকরসের আসরে একেবারে রবাহুত নয়।

প্রভাতকুমার তাঁহার গল্পের প্লট রচনায় আকস্মিক ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। 'কুড়ানো মেয়ে', 'বেনামী চিঠি', 'বউ চুরি', 'খোকার কাণ্ড', 'গহনার বাক্স' ইত্যাদি গল্পে সমস্যা সৃষ্টি অথবা সমস্যার সমাধান হইয়াছে আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে। 'কুড়ানো মেয়ে'তে নৌকাডুবি, 'খোকার কাণ্ডে' ট্রেনের কামরায় স্বামী-স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ অথবা 'গহনার বাক্স' গল্পে ট্রেনের কামরায় গহনার বাক্স প্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটনাগুলি কাহিনীর অনিবার্য ঘটনা নয় লেখকের রচনাকৌশলের অঙ্গমাত্র। 'বউচুরি', হিমানী', 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স', 'আমার উপন্যাস', 'ডোরা' ইত্যাদি গল্পগুলিতে আকস্মিক অসুস্থতার ফলে কাহিনীর সমস্যা সৃষ্টি অথবা সমস্যার সমাধান ঘটিয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনাও প্রভাতকুমারের গল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। নৌকাডুবি, রেলে কলিসন, মোটর এ্যাকসিডেণ্ট, সর্পাঘাত, টমটম এ্যাকসিডেণ্ট এবং হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত তাঁহার গল্পে স্থান পাইয়াছে। 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পে নৌকাডুবি, 'রেলে কলিসন' এবং 'খুড়ামহাশয়' গল্পে রেল দুর্ঘটনা 'বেকসুর খালাস' গল্পে মোটর দুর্ঘটনা 'বিষবৃক্ষের ফল' এবং 'গুরুজনের কথা' গল্পে মারামারি হাতাহাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্যু সাহিত্যিকদের বহুব্যবহৃত টেকনিক। কাহিনীতে করুণ রসসৃষ্টিতে এবং কাহিনীকে সমস্যা মুক্ত করিতে মৃত্যু গল্পকারদের প্রধান সহায়ক। প্রভাতকুমারের গল্পের অনেকগুলি গল্পের জট ছাড়াইয়াছে এই মৃত্যু। 'হিমানী' গল্পে হিমানীর মৃত্যু ছাড়া গল্পটির আর কোন সহজ সমাধান বোধকরি ছিল না। 'প্রিয়তম' গল্পে তরঙ্গিনীর মৃত্যুর দ্বারাই গল্পের বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পে অবশ্য শ্রীবিলাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু না ঘটিলেও হয়ত কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে প্রভাতকুমার দ্বিপত্নীত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। 'সতী' গল্পে নায়ক নায়িকা উভয়ের মৃত্যু কাহিনীটিকে

সব সমস্যার হাত হইতে মুক্তি দিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু নায়কের সহিত বিদেশী খ্রীষ্টান নায়িকার মিলন বোধকরি যে যুগের পাঠক প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

প্রভাতকুমারের রচনা কৌশলের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পত্রের ব্যবহার। পত্র গল্পে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে, আবার সমস্যার সমাধানও করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প 'রসময়ীর রসিকতা'। রসময়ী রচিত ভৌতিক পত্রগুলির মধ্যেই সমগ্র গল্পটির রস নিহিত। পাঠক যখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের জালে জর্জরিত তখন রসময়ীর লিখিত এক বাণ্ডিল চিঠিই পাঠককে সমস্যা হইতে মুক্তি দিয়াছে। 'সখের ডিটেকটিভ' গল্পেও কৌতুকচ্ছলে লিখিত একটি পত্র গল্পের সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে এবং সমগ্র গল্পটি সেই পত্রের ভুল ব্যাখ্যার উপরই দাঁড়াইয়া আছে। 'পোষ্ট-মাস্টার' গল্পে অপরের পত্র চুরি করিয়া পড়িয়া তদনুযায়ী প্রণয়ীর হইয়া Proxy দিতে গিয়া পোষ্ট মাস্টার প্রহৃত হইয়াছেন। 'বেনামী চিঠি' গল্পে একটি ক্ষুদ্র পত্র গল্পের নায়কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিয়াছে। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্পেও মুল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে একটি পত্রকে কেন্দ্র করিয়া। 'পরের চিঠি' গল্পে এক গুচ্ছ প্রেমপত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মানস-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে পারিত লেখক তাহা সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। অন্যত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি যে প্রভাতকুমারের দৃষ্টি ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের ফলেই কাহিনীটির সুখান্তক পরিণতি ঘটিয়াছে, নতুবা ভিন্ন পরিণতি হইতে পারিত, যেমন হইয়াছে 'বনফুল' রচিত 'স্ত্রী চরিত্র' গল্পটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'পরের চিঠি' গল্পের টেকনিকটি সম্ভবতঃ প্রভাতকুমারের নিজস্ব নয়। 'পরের চিঠি'র প্রকাশ কাল ১৩৩৫ সাল। কিন্তু ১৩০৬ সালে প্রকাশিত 'পোষ্ট মাস্টার' গল্পে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২) এই টেকনিক ব্যবহার করিয়াছেন। 'পরের চিঠি'র ন্যায় পোষ্টমাস্টার' গল্পটিও কৌতুকরসাত্মক। পোষ্টমাস্টারের স্ত্রী পোষ্টমাস্টারের দেরাজে কোন মহিলার লিখিত দুইখানি পত্রের খামের উপর তাহার স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দেখিয়া স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করিল। কিন্তু পরে জানা গেল পত্রগুলি স্বামীর ভ্রাতা অতুল চন্দ্র চক্রবর্তীর, তাহার স্বামী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তীর নহে। উভয়ের নামের ইংরাজি আদ্যক্ষর তিনটি এক হওয়ার ফলে বিপত্তির সৃষ্টি। প্রভাতকুমারের 'পরের চিঠি' গল্পেও একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। 'পরের চিঠি'র নায়িকা মণিকাও স্বামীর অনুপস্থিতিতে একটি সুটকেশের ভিতরে স্বামীর নামের আদ্যক্ষরযুক্ত প্রেমপত্র পাইয়া স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিয়াছে। কিন্তু স্বামী ফিরিয়া আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে পত্রগুলি বন্ধু শিশির দত্তকে লিখিত। মণিকার স্বামীর নাম সুরেন্দ্র দত্ত। অতএব এ ক্ষেত্রেও বন্ধুদ্বয়ের নামের ইংরাজি আদ্যক্ষর অনুরূপ হইবার ফলেই গল্পে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভ্রান্তি এবং প্রতারণা প্রভাতকুমারের গল্পের রচনা কৌশলের দুইটি প্রধান বিষয়। তাঁহার অধিকাংশ গল্পেই ভ্রান্তি অথবা প্রতারণা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গল্পের শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া আমরা ভ্রান্তি এবং প্রতারণা বিষয়ক গল্পের দুইটি শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছি। কিন্তু একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার প্রায় সকল গল্পকেই এই দুইটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ভ্রান্তি অথবা প্রতারণাই প্রভাতকুমারের প্রধান সহায়ক হইয়াছে। যেমন 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি। গল্পটি দ্বিধাবিভক্ত এবং দ্বিতীয় অংশে কন্যা বিবাহ সমস্যাই গল্পে প্রাধান্য পাইয়াছে। কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইবে, অথচ উপযুক্ত পাত্র ক্রয়ের অর্থ নাই, সুতরাং পাত্রীর পিতাকে প্রতারণার আশ্রয় লইতে হইল। গল্পটিতে কন্যা বিবাহ সমস্যাই প্রধান, প্রতারণা পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল মাত্র। এই শ্রেণীর আর একটি গল্প 'প্রতিজ্ঞাপূরণ'। নব্য হিন্দু ভবতোষের উৎকট প্রতিজ্ঞার হাস্যকরতা উদ্ঘাটনই গল্পের বিষয়। লেখক টেকনিক হিসাবে এক মধুর প্রতারণার আশ্রয় লইয়াছেন। পুলিনার মা এক কুৎসিৎ দর্শনা কন্যা দেখাইয়া বিবাহে ভবতোষের সম্মতি আদায় করিলেন, কিন্তু বিবাহের সময় নিজ সুন্দরী কন্যাটিকেই সম্প্রদান করিলেন। এইরূপ আরও অনেক গল্পে প্রভাতকুমার প্রতারণাকে টেকনিক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন—যেমন 'বিলাতী রোহিণী', 'পুলিন-বাবুর পুত্রলাভ', 'দাম্পত্য প্রণয়', 'বেকসুর খালাস', 'ডাগর মেয়ে', 'আমার উপন্যাস', 'খুড়া মহাশয়', 'নূতন বউ', 'হারাণো মেয়ে' ইত্যাদি গল্প।

'প্রিয়তম', 'বিলাত ফেরতের বিপদ', 'ভুল', 'সখের ডিটেকটিভ', 'ভূত না চোর', 'বিলাসিনী', 'ভুল শিক্ষার বিপদ' ইত্যাদি গল্পগুলির প্লটে ভ্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। 'প্রিয়তম' এবং 'ভুল শিক্ষার বিপদ' গল্প দুইটিতে ভ্রান্তির সাহায্যে লেখক বাঞ্ছিত করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার 'ভূত না চোর', 'বিলাত ফেরতের বিপদ', 'সখের ডিটেকটিভ' ইত্যাদি গল্পের কৌতুকরসস্ফূর্তির কারণ ভ্রান্তি।

প্রভাতকুমারের এমন কতকগুলি গল্প আছে যাহার টেকনিক ত বটেই গল্পের বিষয়বস্তুও প্রতারণা বা ভ্রান্তিভিত্তিক ; যেমন 'কলির মেয়ে', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'পুনর্মূষিক', 'বায়ু পরিবর্তন', 'বেনামী চিঠি', 'ঢাকার বাঙ্গাল', 'অদ্বৈতবাদ', 'বাজীকর', 'বিষবৃক্ষের ফল', 'আধুনিক সন্ন্যাসী' ইত্যাদি গল্পগুলির বিষয় প্রতারণা। 'কলির মেয়ে' গল্পের নায়ক প্রতারণা করিয়া বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু 'বিবাহের বিজ্ঞাপনে'র নায়ক প্রতারণা করিতে গিয়া নিজেই প্রতারকের পাল্লায় পড়িয়া নাকাল হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও অনুরূপ প্রতারকদের কাহিনী।

'হারাধন', 'সম্পাদকের আত্মকাহিনী', 'বলবান জামাতা', 'জ্যোতিষী মহাশয়',

'কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্তকথা' ইত্যাদি গল্পগুলি ভ্রান্তি বিষয়ক। গল্পগুলিতে কোন না কোন ভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়া পরিস্থিতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গল্পের বিষয়ও তাহাই।

প্রতারণা বিষয়ক গল্পগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। এই গল্পগুলি চরিত্র প্রধান। প্রত্যেকটি গল্পেই এক একটি প্রতারক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর গল্পের নায়কেরা স্বভাবত প্রতারক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়কেরা কার্যগতিকে প্রতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'অদ্বৈতবাদ', 'কলির মেয়ে', 'পুনর্মূষিক', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'বায়ু পরিবর্তন', 'আধুনিক সন্ন্যাসী' এবং 'সারদার কীর্তি' এই গল্পগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'ঢাকার বাঙ্গাল', 'বাজীকর', 'বেনামী চিঠি', 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স', 'ধর্মের কল' ইত্যাদি গল্পগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রভাতকুমার প্রতারক চরিত্রগুলিকেও খুব জীবন্ত এবং উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রধানত ঘটনানির্ভর কাহিনী রচনা করিলেও চরিত্র চিত্রণেও যে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল এই গল্পগুলি তাহার সার্থক নিদর্শন। জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—

"ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কাহিনীর চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে প্রভাতকুমারকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপকারের সম্মান দিতে কাহারও কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।"[৪০]

প্রভাতকুমারের গল্প বলার ভঙ্গিটি অত্যন্ত সরল। গল্প লিখিতে গিয়া তিনি দীর্ঘ ভূমিকার অবতরণ করেন নাই। সাধারণতঃ গল্পের মুল বক্তব্যটি উল্লেখ করিয়াই অতর্কিত-ভাবে গল্পের আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন—

(ক) কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা ৺রজনী কান্ত সেন মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ আজ লণ্ডনে মহাবিপন্ন।[৪১]

(খ) হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মানিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুম-লতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।[৪২]

(গ) হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া গেল।[৪৩]

এইরূপ চমক দিয়া কাহিনীর আরম্ভ অন্যান্য অনেক গল্পেই লক্ষ্য করা যায়। গল্পের অতর্কিত আরম্ভ পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মনকে গল্পের প্রতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। আরম্ভের ন্যায় সমাপ্তিতেও চমক দিয়াছেন লেখক তাহার কোন কোন গল্পে। ইংরাজিতে যাহাকে surprise ending বলে এই গল্পগুলির সমাপ্তি অনেকটা সেইরূপ। গল্পের চমকপ্রদ সমাপ্তির মধ্যেই গল্পের উৎকর্ষ নির্ধারণ করেন অনেকে যাঁহাদের মধ্যে

পো, মোপাসাঁ, ও হেনরী এবং মমের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখক হেনরী জেমস (১৮৪৩-১৯১৬) বিপরীত মত পোষণ করেন।

আমাদের মনে হয়, গল্পের সমাপ্তি যদি গল্পের অনিবার্য এবং স্বাভাবিক পরিণতি হয়, তাহা হইলে চমকপ্রদ হইল অথবা সাধারণ বিবৃতিমূলকভাবে শেষ হইল তাহাতে কিছু যায় আসে না। সমারসেট মম্ চমকপ্রদ সমাপ্তি সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

"There is nothing to be condemned in a surprise ending, if it is the natural end of a short-story, on the contrary it is an excellence".[৪৪]

আবার অন্য একজন সমালোচকের বিপরীত মতও প্রণিধানযোগ্য—

"We should remove from our minds the popular misconception that a good short-story must have a surprise ending".[৪৫]

প্রভাতকুমারের গল্পে চমকপ্রদ সমাপ্তি (surprise ending) ঘটিয়াছে 'হিমানী', 'রসময়ীর রসিকতা', 'দেবী' ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র গল্পে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত চমকপ্রদ সমাপ্তি বোধকরি একমাত্র 'দেবী' গল্পেই ঘটিয়াছে। চমকপ্রদ পরিণতির মধ্য দিয়াই গল্পটি পাঠকমনে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের সমাপ্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"[৪৬]

কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্পগুলির সমাপ্তি এইরূপ নয়। তাঁহার গল্পের শেষে অশেষের ব্যঞ্জনা নাই। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের পরিসমাপ্তিই নটে গাছটি মুড়াইয়া ছাড়িয়াছে। সাধারণ পাঠক বোধকরি চাহেনও তাহাই। স্মরণ রাখিতে হইবে প্রভাতকুমার তাঁহার যুগে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলিয়াছেন—

"তাঁহার উপন্যাসগুলি নানা দুঃখ দুর্দৈবের হাত এড়াইয়া সর্বদাই পাঠকস্পৃহিত 'আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো' মনোভাবের 'সমে' আসিয়া সমাপ্ত হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহাই একমাত্র কাম্য। সে কোনো বেদনাবোধ লইয়া, কোনো দুশ্চিন্তা লইয়া পুস্তক বন্ধ করিতে চায় না। গল্প শেষ হইয়া গেল, অথচ তাহার প্রেতাত্মা তাহার মনের মধ্যে অবশ্য বেদনা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহার নিত্যকর্মে অন্যমনস্কতা আনিয়া দিবে ইহাকে সে অবাঞ্ছিত মনে করে। বই শেষ

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের আত্মশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ হইয়া গিয়া সব বেদনার শান্তি ঘটিবে, লেখকের কাছে সাধারণ পাঠকের ইহাই দাবি।"[৪৭]

উপরোক্ত মন্তব্য প্রভাতকুমারের ছোট গল্প সম্পর্কেও অনেকখানি প্রযোজ্য।

গল্পের রচনারীতিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্প, প্রথম পুরুষে বর্ণিত গল্প এবং পরোক্ষ রীতিতে (পত্র বা ডাইরীর আকারে) বর্ণিত গল্প। প্রভাতকুমার এই তিনটি প্রণালীতেই গল্প রচনা করিয়াছেন।

উত্তমপুরুষে বর্ণিত গল্পের 'আমি' গল্পেরই একজন প্রধান অথবা গৌণ চরিত্র। লেখক এই চরিত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। এই রীতিতে উপন্যাসও রচিত হয়।[৪৮] এই প্রণালীতে রচিত উপন্যাস সম্বন্ধে জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

"By a first-person novel is meant a novel that is narrated all the way along in the first-person, by the person who appears in the novel the narrator.

The distinguishing characteristic then, of the first-person novel is that the author makes the novel narrate itself through the mouth of one of the figures taking part in it. The real author withdraws from the scene, and instead brings forward the fictitious naarator."[৪৯]

উত্তমপুরুষে বর্ণিত গল্প সম্পর্কেও এই মন্তব্য সমান সত্য বলিয়া মনে হয়। গল্পের 'আমি' লেখক স্বয়ং নহেন, বরং তাঁহার সৃষ্ট কোন কাল্পনিক চরিত্র এবং লেখক এই চরিত্রটির অন্তরালে কি পরিমাণে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন তাহার উপরই এই রীতিতে রচিত গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। প্রভাতকুমারের 'ভুলভাঙ্গা' গল্পটিকে উদাহরণ হিসাবে লইলে দেখা যাইবে যে গল্পটির নায়িকা হরিপ্রিয়া উত্তমপুরুষে নিজের কাহিনী বলিয়া যাইতেছে। হরিপ্রিয়া কাহিনীতে যে সব মন্তব্য করিয়াছে অথবা গুরুবাদ, বিশুদ্ধ ভক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে মৃদু কটাক্ষ করিয়াছে তাহার দায়িত্ব যেন লেখকের নয় এইরূপ একটি বিভ্রম (illusion) লেখক 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ফলে গল্পটি সার্থক হইয়াছে। এই রীতিতে রচিত আরও একটি গল্প 'বিনোদিনীর আত্মকথা'। এই গল্পটিতে লেখক 'বিনোদিনী'র অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন নাই। গল্পটিতে আধুনিক লেখকের প্রতি যে উগ্র কটাক্ষ তাহা গল্পের নায়িকা বিনোদিনীকৃত এইরূপ বিভ্রম লেখক সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বলিয়া

মনে হয়। এই কারণে গল্পটি 'ভুলভাঙ্গা'র ন্যায় রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে পুর্বোক্ত পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"An investigation of the first-person novel must take into consideration how far the author really hides behind his narrator, how credible he succeeds in making the illusion that the narrator is responsible for telling the story."[৫০]

প্রভাতকুমার এই রীতিতে অনেকগুলি গল্প লিখিয়াছেন। পুর্বালোচিত গল্প দুইটি ছাড়া 'সম্পাদকের আত্মকাহিনী', 'ভিখারী সাহেব', 'ভুল শিক্ষার বিপদ', 'আমার উপন্যাস', 'আধুনিক সন্ন্যাসী', 'ফুলের মুল্য', 'মাতৃহীন', 'রেলে কলিসন' ইত্যাদি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

এই রীতিতে বহু গল্প রচিত হইয়াছে। এই রীতিতে গল্পের নায়ক-নায়িকার সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করিয়া দেন লেখক। ফলে পাঠক গল্পের নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিতে উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু এই রীতির গল্পে লেখককে কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হয়। লেখক স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। গল্পের 'আমি'ও নিজের প্রত্যক্ষ ঘটনা ছাড়া অপ্রত্যক্ষ ঘটনাগুলি বর্ণনা করিতে পারে না, ফলে বাস্তবতা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়। তাছাড়া উত্তমপুরুষের বর্ণনার মধ্য দিয়া কোন চরিত্র ফুটাইয়া তোলা লেখকের পক্ষে অনেক সময়ে কষ্ট সাধ্য হয়। গল্পের আমি কখনও নিজের চরিত্রের নিরপেক্ষ বর্ণনা করিতে পারে না।

পরোক্ষ রীতিতে রচিত গল্প বলিতে আমরা পত্রাকারে অথবা ডাইরীর আকারে রচিত গল্প বুঝাইতেছি। একজনের লিখিত একটি বা একাধিক অথবা অনেকজনের লিখিত অনেকগুলি পত্রের সাহায্যে গল্প রচিত হইতে পারে। প্রভাতকুমার পত্রাকারে গল্প রচনা করেন নাই।[৫১] তবে তাঁহার 'প্রজাপতির পরিহাস' গল্পে এই রীতির আংশিক প্রয়োগ করা হইয়াছে। গল্পটির চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঁচটি পত্রের সংযোগে গঠিত। ডাইরীর আকারে প্রভাতকুমার একটি গল্প লিখিয়াছেন "হতাশ প্রেমিক"। ডাইরীর আকারে লিখিত গল্পে বর্ণিত বিষয় বা ঘটনা যেমন যেমন ভাবে অগ্রসর হয় পাঠক তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত গল্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি পরোক্ষ রীতির গল্পেও বর্তমান। প্রথম পুরুষ বর্ণিত গল্পের সংখ্যাই অধিক। লেখক এখানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি চরিত্র অথবা ঘটনা বিশ্লেষণ করিতে পারেন, তাহাদের সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, অনাগত ঘটনার আভাস পুর্বেই দিতে পারেন অথবা যে ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিবে সেই ঘটনা হইতেই গল্প আরম্ভ করিতে পারেন।

পরোক্ষ রীতিতে রচিত গল্পে এইরূপ স্বাধীনতা লেখকের থাকে না। গল্প লেখকের স্বাধীনতার প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, মাইকেল বা কিরূপে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।"[৫২]

উদ্ধৃতিটির ভাষা লঘু হইলেও বক্তব্য বিষয়টি সত্য।

॥ টীকা ॥

১। ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঘরের কথা' (১৩১৭) ভূমিকা (প্রভাতকুমার) পৃঃ ।৵০।

২। W. H. Hudson : An Introduction to the study of Literature, P. 339,

৩। পরিশিষ্ট : তিনসঙ্গী।

৪। বর্ষাযাপন : র, র, (১ম) পৃঃ ৩৬০।

৫। 'ঘরের কথা', ভূমিকা, পৃঃ ।৵০।

৬। প্রভাতকুমারকে লিখিত পত্রাংশ, সা, সা, চ (৫৪) পৃঃ ৩৬।

৭। জগদীশ ভট্টাচার্য্য 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' ভূমিকা, পৃঃ ৪।

৮। সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশ ৩১শে আষাঢ় ১৩৬২, পৃঃ ৮৭১।

৯। রবীন্দ্রনাথ : পূজা (২৪৮) র, র, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৮৩।

১০। Objective এবং Subjective এই শব্দ দুইটির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ হিসাবে বিষয়মুখ এবং আত্মমুখ শব্দ দুইটি রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১১। সুকান্ত ভট্টাচার্য্য : ছাড়পত্র।

১২। S. Maugham, Points of View. P. 175.

১৩। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' (জন্মভূমি, অগ্রহায়ণ ১৩০০) গল্পটির উপসংহার স্বরূপ ত্রৈলোক্যনাথ 'রূপসী হিরণ্ময়ী' (জন্মভূমি, মাঘ ১৩০০, পৃঃ ৬৫) গল্পটি লেখেন। গল্পের সুরুতে লেখক নিম্নরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

বাঙ্গাল নিধিরাম মরিয়া গেলেন, তাহার পর কি হইল? হিরণ্ময়ীর কি হইল, অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন কারণ, মাথার উপর ভগবান আছেন। হিরণ্ময়ীর মত কলঙ্কিনী যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে, তাহা হইলে ধর্মাধর্ম সব মিথ্যা, বিধাতার সৃষ্টি বৃথা। তবে ভাবিয়াছিলাম এই যে, সে হতভাগিনীর কথা লিখিয়া আমার লেখনী কেন আর কলঙ্কিত করি? তাই চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু সকলে বলেন যে, হিরণ্ময়ীর শেষ দশা কি

হইল তাহা না বলিলে ধর্মের অবমাননা করা হয় তাই বলিতে হইল। কিন্তু লিখিতে আমার মন হইতেছে না, কলম সরিতেছে না।

এই গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথের অদ্যাবধি প্রকাশিত কোনও গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

১৩ (ক)।..."তাহার পরদিন মুদ্দফরাস আসিয়া নাকে কাপড় জড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর মৃতদেহ পা দিয়া জলে ঠেলিয়া দিল।" (জন্মভূমি মাঘ ১৩০০, পৃঃ ৮১)।

১৪। বর্ষাযাপন : র, র, (১ম) পৃঃ ৩৬০।

১৫। বিনোদিনীর আত্মকথা : প্র, গ্র, (ব) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭।

১৬। ঐ

১৭। তুলনীয়: "এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?" 'চন্দ্রশেখর' ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৬৮।

১৮। 'হতাশ প্রেমিক' ও অন্যান্য গল্প পৃঃ ২৪-২৫।

১৯। ঐ, পৃঃ ২৬।

২০। স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৭-৯৮।

২১। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ২৫১ হইতে উদ্ধৃত।

২২। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যাকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ।

২৩। লীলারাণীকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ।

২৪। বা, সা, ই (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩১২।

২৫। দিদি, র, র, (৭ম খণ্ড) পৃঃ ২৭৬।

২৬। শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৭১।

২৭। সাহিত্যের স্বরূপ, র, র, (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ৫১১।

২৮। সম্পাদকের কন্যাদায়।

২৯। বাল্যবন্ধু, গল্পাঞ্জলি পৃ ৬০।

৩০। ইংরাজ রমণী প্র, গ্র, (ব) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪।

৩১। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৬।

৩৩। 'হাসরস ও বাংলা সাহিত্য' বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড) পৃঃ ৩০।

৩৪। **Languages & Literatures of Modern India. P. 187.**

৩৫। প্রমথনাথ বিশী : ত্রৈলোক্য রচনা সম্ভার, ভূমিকা, পৃঃ ৬/১।

৩৬। কুম্ভকর্ণ (পঞ্চদশ শতাব্দী) "সঙ্গীতরাজ"।

৩৭। জগদ্ধর (পঞ্চদশ শতাব্দী) "সঙ্গীত সর্বস্ব"।

৩৮। রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র' র, র, (১৩ শ খণ্ড) পৃঃ ৮৯৭।

৩৯। অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, পৃঃ ৩৭৯।

৪০। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বাংলা ছোটগল্প : পৃঃ ১০৭।

৪১। 'কুমুদের বন্ধু' গল্প বীথি, পৃঃ ২৫০।

৪২। 'প্রণয়পরিণাম' : প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১০২।

৪৩। ধর্মের কল : ঐ, পৃঃ ৮৯।

৪৪। S. Mangham. Creatures of circumstances-The Author excuses himself. P. 3.

৪৫। Harry shaw & Douglas Bement : Reading a short-story, (Introduction), P. 5.

৪৬। 'বর্ষাযাপন', র র (১ম খণ্ড) পৃ: ৩৬০।

৪৭। প্রমথনাথ বিশী : বাংলা সাহিত্যের নরনারী : পৃ ১৩৪।

৪৮। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এই প্রণালীতে রচিত।

৪৯। Bertil Romberg : "Studies in the Narrative Technique of the first-person Novel" P. 4.

৫০। ঐ, পৃ: ৯।

৫১। প্রভাতকুমার গল্পের টেকনিক হিসাবে পত্রের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৫২। স্বর্ণলতা : পৃ: ৪।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

বঙ্কিম প্রভাব

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রযুগের লেখক। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সন্দেহ নাই যে প্রভাতকুমার রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত সম্যক্ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনারীতির বিচারে দেখি যে প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রকে নানাভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রভাতকুমারও দৃষ্টিভঙ্গিতে রোমান্টিক। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রোমান্সের উপকরণ খুঁজিয়াছেন ইতিহাসের মধ্যে। তাঁহার যে কয়েকটি উপন্যাস সামাজিক বলিয়া পরিচিত সেগুলিতেও সাধারণ বাঙ্গালী জীবন চিত্রিত হয় নাই। তাঁহার 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' এবং 'রজনী' উপন্যাস-গুলিতে যে জমিদার অথবা জমিদারকল্প উচ্চ মধ্যবিত্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহারা কেহই সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থজীবনের অধিবাসী নহে, বরং তাহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সুউচ্চ রোমান্টিক কল্পনাজগতের অধিবাসী। প্রভাতকুমারও প্রধানত রোমান্স লেখক। যদিও বঙ্কিমের মত রোমান্সের উপকরণ তিনি ইতিহাসের মধ্যে খোঁজেন নাই। প্রভাত-কুমারের উপন্যাসে জমিদার অথবা উচ্চবিত্ত চরিত্রের আধিক্য থাকিলেও তাহারা যে পরিবেশ রচনা করিয়াছে তাহা একান্তভাবে বাঙ্গালীসুলভ। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে বাস্তব এবং রোমান্স হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কেহ কাহারও সহিত বিরোধ বাধায় নাই। বাহ্যত প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে সেগুলি রোমান্স ছাড়া আর কিছুই নহে। বীরবলী ভাষায় বলিতে গেলে কাহিনী **Romantic,** কিন্তু তাহার বর্ণনা বিষম **Realistic**।

Romantic ও **Realstic** উপন্যাসের ভিতরকার পার্থক্য তাহাদের ভিতরকার পরিমাণটুকুর উপর নির্ভরশীল। **Realistic** উপন্যাস জীবনের অবিমিশ্র বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের সর্বপ্রকার অসাধারণত্বকে বর্জন করিয়া তাহার অনাবৃত রূপটিকে প্রকাশ করাই **Realistic** বা বস্তুবাদী ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। জীবন সম্বন্ধে নিছক বস্তুময় একটি চিত্র বস্তুবাদী লেখক পাঠকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন। কিন্তু রোমান্টিক লেখকের উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ। রোমান্টিক লেখকের মন শুধু সাধারণকে চিত্রিত করিয়াই

তৃপ্ত হয় না, তাঁহার দৃষ্টি খুঁজিয়া বেড়ায় অসাধারণের প্রকাশকে। জীবনের যে নগ্নতা, কুশ্রীতা, জীর্ণতা, প্রতিদিন জীবনকে পিষ্ট করিতেছে রোমান্টিক লেখকের নিকট তাহাই জীবনের একমাত্র সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টনকে বাছাই করে নেয়নি। সে তার পড়ে পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন, সে এতে খুশী হয় না। সে চায় মনের মতোকে।......মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে।"[১]

প্রভাতকুমার বাঙ্গালী গৃহস্থজীবন হইতে যে চিত্র ও চরিত্র তাঁহার উপন্যাসে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার রোমান্টিক দৃষ্টির দ্বারা অনুরঞ্জিত। পূর্বেই বলিয়াছি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার বঙ্কিমানুসারী। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্সরস আসিয়াছে সাংকেতিকতা, অলৌকিকতা, নিয়তি নির্দেশ এবং পরিবেশ রচনার মধ্য দিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার আদর্শ পাইয়াছিলেন ইংরাজী সাহিত্য হইতে। সে যুগের ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্স ছিল প্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ইত্যাদির মিশ্ররূপ এবং রোমান্সে অস্ত্র ঝঙ্কারের দ্বারা পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় ঘোষিত হইত।[২] জনৈক বিদেশী সমালোচক লিখিয়াছেন—

"Romance will generally deal out death to certain of subsidiary characters, the wicked will be slaughtered, and some even of the good may safely be sacrificed so long as the hero returns to peace and prosperity after the tumultuous vacation."[৩]

কিন্তু প্রভাতকুমারের রোমান্সে অসির ঝন্ ঝনানি নাই, ইহা মহতের আত্মত্যাগে, পাপের ধ্বংসে অথবা কোন বীরচরিত্রের মৃত্যুতে মহিমমণ্ডিত নহে। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে রোমান্সের রঙ লাগিয়াছে আকস্মিক ঘটনা সংঘটনে, কৌতুককর পরিস্থিতি রচনায় এবং অবশ্যম্ভাবী রমণীয় পরিণতির মাধ্যমে। পূর্বোক্ত সমালোচকের মতে—

"........ the romance, the novel of action as it makes the reader suffer occasionally, and as its chief object is to please, must end happily."[৪]

এই অর্থে প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি খাঁটি রোমান্স। এই রোমান্সরসের জন্যই প্রভাতকুমারকে আমরা বঙ্কিমানুসারী বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিগত এই আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য ছাড়া কিছু বাহ্য অর্থাৎ উপন্যাসের গঠন রীতির দিক দিয়াও সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রভাতকুমার উভয়ের উপন্যাসকেই ঘটনা প্রধান বলা চলে। যে উপন্যাসে কতকগুলি ঘটনা পর পর ঘটিয়া কাহিনীকে পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেয় এবং ঘটনা পরম্পরার দ্বারাই উপন্যাসের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে বাস্তব অথবা কাল্পনিক ঘটনাবলী কখনও কার্যকারণসহ অথবা কার্যকারণ ব্যতীতই একাদিক্রমে আসিয়া একটি সুগঠিত কাহিনী সৃষ্টি করে এবং তাহার মধ্য দিয়াই কেন্দ্রগত চরিত্রটি ফুটিয়া উঠে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বাহিরের ঘটনা সংঘাতই এখানে চরিত্র ও কাহিনীকে পরিচালিত করে। বাহ্য ঘটনা বলিতে আমরা বুঝি এমন কোন ঘটনা যাহার সংঘটনে কেন্দ্রীয় চরিত্রের কোন হাত থাকে না, অথচ তাহা ঘটিবার ফলেই চরিত্রটির জীবনে সমস্যার সূত্রপাত হয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রারম্ভেই নায়ক নগেন্দ্র নৌকাযোগে জমিদারী পরিদর্শনে বাহির হইয়া দুর্যোগবশতঃ মধ্য পথে যাত্রা বিরতি করিয়া একটি ভগ্নপ্রায় গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন এবং সেই সময় গৃহকর্তার মৃত্যু হইলে তাঁহার সহায় সম্বলহীনা কন্যা কুন্দনন্দিনীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। নগেন্দ্রনাথের সহিত কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ একটি কার্যকারণহীন আকস্মিক ঘটনা মাত্র, কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটি এই ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও অনুরূপ ঘটনা-নির্ভরতা লক্ষ্য করা যাইবে।

মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বিশ্লেষণ এবং কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণ যাহা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার প্রথম সার্থক রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে বিষয়ে সচেতন। তিনি লিখিয়াছেন—

"তাই গল্পের আব্দার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।"[৫]

"সাহিত্যে নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে আধুনিকতার এই বৈশিষ্ট্যের সার্থক পরিচয় পাওয়া গেল। 'চোখের বালি' সমসাময়িক লেখক গোষ্ঠীকে কতখানি চমৎকৃত করিয়াছিল, তাহার পরিচয় শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি হইতে অনুমান করা যায়।

"ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।···কোন কিছু

যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।"[৭]

এখানে একথা উল্লেখ করা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে প্রধানত ঘটনা নির্ভর ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস রচনা করিলেও, বাঙ্গলা উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্ব ও মানব মনের ঘাত-প্রতিঘাতকে ঘটনা সংঘাতের উপর স্থান দিবার সর্বপ্রথম কৃতিত্বও বঙ্কিমচন্দ্রের। ১২৮১-৮২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'রজনী' ইহার উদাহরণ। বাঙ্গলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠিত সূত্রটিই পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতের পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সমসাময়িক বাঙ্গলা উপন্যাসে 'চোখের বালি'র ব্যাপক প্রত্যাশিত প্রভাব সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের রচনায় তাহার ছায়াপাত ঘটে নাই। প্রভাতকুমার 'চোখের বালি'র এই যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। বরং 'চোখের বালি'র ঘটনা-বিন্যাসগত তথাকথিত অবাস্তবতার ও অসঙ্গতির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। 'চোখের বালি' পড়িয়া প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

"......বিনোদিনীর বয়স একটু বাড়ান আবশ্যক বটে। বিনোদিনী মহেন্দ্রর সঙ্গে যেরূপভাবে মেলামেশা করিতেছে, তাহা হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কচি বউদিদিরা বয়েস বেশী বড় দেবরের সঙ্গে যদিও কথাবার্তা কয় তাহা একান্ত সংকুচিতভাবে। বিবাহের পূর্ব হইতেই মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর আলাপ ছিল করিলে কেমন হয়? তাহা হইলে বিনোদিনীর 'বিনোদত্ব'ও বজায় থাকে।..

আর একটা কথা। কাশীতে আশাকে বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য মহিম যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার মাসিমা সে পত্র দেখিলেন কেমন করিয়া। আশা লজ্জায় জড়সড়, মাসীমাকে গিয়া থোড়াই সে চিঠিখানা দেখাইয়াছে।.........

নাইট ডিউটির খাতিরে বাক্স পেঁড়া বিছানাপত্র লইয়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রের হাসপাতালে গিয়া বাসা বাঁধা সম্ভব কিনা একবার সম্বাদ লইলে ভাল হয়। কোনও ছাত্র যে হাসপাতালে ডেরাডাণ্ডা করে এরূপ শুনি নাই। সেরকম কোনও বন্দোবস্ত আছে কিনা সন্দেহ।......[৮]।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের জন্যই সমসাময়িক বাঙ্গলা উপন্যাসে 'চোখের বালি'র ব্যাপক ও প্রত্যাশিত প্রভাব সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের উপন্যাসে তাহার ছায়াপাত ঘটে নাই। 'আঁতের কথা' বাহির করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া তিনি সহজ সরলভাবে ঘটনা বিন্যাসের সাহায্যে গল্প বলিয়া গিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন শরৎচন্দ্রকে বাঙ্গলা সাহিত্যের

'তুলিতালা'[৯] বলিয়াছেন। এই বিশেষণ প্রভাতকুমার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। রোমান্সধর্মী ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে ঘটনার পারম্পর্য থাকিলেও অকাট্য যুক্তির ধারাবাহিকতার প্রয়োজন হয় না। লেখক ঘটনা বৈচিত্র্য স্থষ্টির উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক বা নিবার্য ঘটনারও আশ্রয় লইতে পারেন।

"বিস্তীর্ণা পৃথিবী জনোহপি বিবিধ :
কিং কিং ন সম্ভাব্যতে।'

সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রে এবং বঙ্কিমানুসারী প্রভাতকুমারে অস্বাভাবিক এবং আকস্মিক ঘটনার প্রাচুর্য দেখা যায়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা প্রভাতকুমার একটু বেশী স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এমন অনেক ঘটনা আছে যাহাকে আমরা বাস্তব জগতের শেষতম সীমান্তে স্থান দিতে পারি না। কুন্দনন্দিনী (বিষবৃক্ষ), এবং শচীন্দ্রের (রজনী) অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন, অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ, এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার নিদর্শন। কিন্তু প্রভাতকুমার অলৌকিক ঘটনার ধারে পাশেও যান নাই। তাঁহার ঘটনাগুলি অস্বাভাবিক হইলেও আমাদের মনে সেগুলি 'হইলেও হইতে পারে' জাতীয় মনোভাবের স্থষ্টি করে। কৈলাস ভট্টাচার্যের দৈবধন প্রাপ্তি (নবদুর্গা), প্রতিমার পিতা মাতার একই দিনে আকস্মিক মৃত্যু (প্রতিমা), রাখালের সহিত ভবেন্দ্রর চেহারার বিস্ময়কর সাদৃশ্য (রত্নদীপ) প্রভার পিতা, স্বামী, মাতা ও ভ্রাতার পর পর আকস্মিক মৃত্যু (জীবনের মূল্য) ইত্যাদিতে আকস্মিকতা আছে কিন্তু তাহাদের অসম্ভব না অলৌকিক বলা চলে না।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে দুঃখদৈন্যের চিত্র থাকিলেও তাহার সামগ্রিক আবেদন রমণীয়তা। শ্রদ্ধেয় সমালোচক লিখিয়াছেন—

"প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাস ভাবাইবার জন্য লেখা নয়, ভুলাইবার জন্য লেখা।"[১০]

প্রভাতকুমার দুঃখ জ্বালা জর্জরিত জীবনে শান্তির এবং তৃপ্তির ওয়েসিস স্থষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। ইহাকে আধুনিক বাস্তববাদী সমালোচক হয়ত পলায়নী মনোবৃত্তি আখ্যা দিবেন—

"It is indispensable, that there should be an escape from life in the novel of action."[১১]

কিন্তু একথা সত্যি যে জীবনের ক্ষয়ক্ষতি পরাজয় ও অপমানের গ্লানিকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন আশায় বুক বাঁধিতে সাহায্য করে রোমান্টিক কল্পনা।

প্রভাতকুমার নিজে একবার নিজের রচনার সঙ্গে ডিকেনসের রচনার সহধর্মিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"প্রবাসী 'নবীন সন্ন্যাসী'র বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন—এক সময়ে কোনও বিলাতী

সমালোচক Dickens-এর বিরুদ্ধে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন, প্লট ঘোরালো নহে—Unity of action নাই, তাই বলিয়া মনে করিবেন না Dickensএর সহিত আমি নিজেকে তুলনা করিতেছি। এক জাতীয়ত্ব দাবী করিতেছি মাত্র—যেমন সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে আর আমাদের ঐ রসুয়ে বামুন আর কি।"[১২]

জনৈক বিদেশী সমালোচক ডিকেনসের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"They are fairy stories for grown up children."[১৩]

প্রভাতকুমারের ছোট গল্প প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তিরই বাংলা করিয়া লিখিয়াছেন—

"তিনি তাঁহার ছোট গল্পের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন তাহাকে বয়স্কদের রূপ কথার রাজ্য বলা যাইতে পারে।"[১৪]

সমালোচকদ্বয়ের মন্তব্য যথার্থ তবে প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিছক রূপকথায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহার সুগভীর সৌন্দর্যপিপাসা, আদর্শবোধ, কল্পনার আতিশয্যমণ্ডিত ও রাক্ষসখোক্কসে পরিবেষ্টিত হইয়া শিশুমনোরঞ্জক উপাদানে পরিণত হয়। আমরা সেই সব কাহিনী শুনিয়া আনন্দ পাই বটে কিন্তু বিশ্বাস করি না। কিন্তু উপন্যাসে আমরা অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাকেও বিশ্বাস করি, কারণ এই বিশ্বাস করিতে পারার মধ্যেই উপন্যাস পাঠের আনন্দ নিহিত। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি স্মরণীয়—

"রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নাটক নভেলের অসম্ভবকে সম্ভব বলেই মানি।"[১৫]

প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি অন্তরশায়ী বিশ্বাস প্রবণতা রহিয়াছে। বিশ্বাস করিতে না পারিলে আমরা বাঁচি না। কারণ তাহা হইলে নিজেদের সফলতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়। এখানেই রোমান্টিক উপন্যাসের সার্থকতা। এই জন্যই প্রভাতকুমারের উপন্যাসে 'সমস্যা' তাহা সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক যাহাই হউক না কেন, ভ্রূকুটিকুটিল রূপ লইয়া উপস্থিত হয় নাই। তিনি জীবনকে চিত্রিত করিয়াছেন বটে কিন্তু চিত্রিত করিতে গিয়া তাহাকে অতি বাস্তবতার দ্বারা শুষ্ক, কঠোর এবং নীরস করিয়া তোলেন নাই।

প্রভাতকুমারের প্রায় সব উপন্যাসই কোন না কোনভাবে বঙ্কিম প্রভাবিত। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রভাতকুমার যেন ইচ্ছাকৃতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। তাই প্রভাতকুমারের সাহিত্যে বঙ্কিমের প্রভাব এবং অনুসরণ দুই আছে।

'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষের' প্রসঙ্গ বার বার আসিয়াছে। নায়িকা বকুরানীর

চরিত্রটিও গড়িয়া উঠিয়াছে সূর্যমুখীর ছায়াতে। 'সিন্দুর কৌটায়' বিজয় সুশীকে ভাল-বাসিয়াছে বুঝিয়া বকুরানীর মনঃকষ্ট, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া সূর্যমুখীর অভিমানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু সূর্যমুখীর অভিমানে গৃহত্যাগ সম্ভবত প্রভাতকুমারের নিকট অভারতীয় বলিয়া মনে হইয়াছে, সূর্যমুখী চরিত্রের সেই ত্রুটিটুকু বকুরানী সারিয়া লইয়াছে। ফলে উভয় উপন্যাসের ভিন্ন পরিণতি ঘটিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের পাশে সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথের পুনর্মিলন হইয়াছে, কিন্তু 'সিন্দুর কৌটায়' বকুরানী হাসিমুখে সতানসহ স্বামীকে গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'মনের মানুষে' কুঞ্জলাল যেখানে ইন্দুবালা ও কিরণের কথাবার্তা অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছে সেখানে তাহার চিন্তাধারা 'কপাল কুণ্ডলা'র মতিবিবির সংলাপের ধারানুসারী—

"ভগিনী, তুমি আমায় জীবন দান কর। যাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে আমি স্বামী জ্ঞান করিয়া আসিতেছি, যিনি এতদিন আমার কুমারী হৃদয়ের ধ্যান, নিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছেন, তাঁহাকে তুমি বিবাহ করিয়া আমার সর্বনাশ করিও না। তোমার বিবাহের ভাবনা কি ?"[১৬]

'সতীর পতি' উপন্যাসের প্লটে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রভাব আছে। 'সতীর পতি'র নায়ক হীরালাল স্বপ্নে তাহার স্ত্রী সুরবালার যে মৃত্যুশয্যা দেখিয়াছে তাহা ভ্রমরের মৃত্যু-শয্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে এখানেও সেই ত্রুটি সারিয়া লইবার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অতি অভিমান ভারতীয় নারী চরিত্রে খাপ খায় না, কিংবা ভারতীয় নারী চরিত্রে অভিমানের আধিক্য থাকা উচিত নয় এ সম্পর্কে প্রভাতকুমারের মনে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। নারীর অভিমানও এক প্রকারের অন্যায় যাহা সংসারের ফাটলটিকে বিস্তৃততর করিয়া মিলনের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেয়।

ভারতীয় হিন্দুনারীর সহনশীলতার প্রতি প্রভাতকুমারের আকাশস্পর্শী শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি তাহার সৃষ্ট নারী চরিত্রে অতি অভিমানকে স্থান দেন নাই। স্বামীর কৃতকর্মের প্রতি তাঁহার উপন্যাসের স্ত্রীরা সর্বদাই উদার এবং ক্ষমাশীলা। 'নবীন সন্ন্যাসী'র গোপীবাবুর স্ত্রী, 'রত্নদীপ'-এ রাখালের স্ত্রী, 'সিন্দুর কৌটা'য় বকুরানী হইতে আরম্ভ করিয়া 'সতীর পতি'র সুরবালা সকলের পক্ষেই এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। অথচ অভিমান করিবার ন্যায়-সঙ্গত কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল। এমন কি অভিমানের ফলে যদি সংসারে বজ্রাগ্নিও জ্বলিয়া উঠিত তবু একালের পাঠক সেইজন্য স্ত্রীকে দায়ী করিত না বরং বলিত 'ইহাই বাস্তব, সংসার এই প্রকারই বটে'। এই কারণেই সূর্যমুখী অপেক্ষা দৃঢ়াভিমানী ভ্রমর পাঠকচিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

· "সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মস্পর্শী। সূর্যমুখীর একান্ত ক্ষমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ অভিমান ও অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী।"[১৭ক] কিন্তু প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভ্রমর চরিত্রের এই অতি অভিমান ভারতীয় নারীর আদর্শের পরিপন্থী, তাই সুরবালা চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি ভ্রমর চরিত্রের ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। 'সতীর পতি' উপন্যাসের নায়িকা রেবতীর নামকরণেও প্রভাতকুমার সজ্ঞানে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রতি নায়িকা রোহিণীর নামটি বঙ্কিমচন্দ্র নক্ষত্র জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে জমিদার কৃষ্ণকান্ত নাতিনী সম্পর্কীয়া রোহিণীকে পরিহাস করিয়া বলিতেছেন—"কেও অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী……"[১৭] রোহিণী নক্ষত্রের টানে গোবিন্দলাল স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, ছাড়িয়াছিলেন। আবার 'সতীর পতি' উপন্যাসের 'নুতন চুক্তি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিপিনবাবু হীরালালকে বলিতেছেন 'আকাশে নক্ষত্র কি রেবতীই শুধু একটি হে ? অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী আরও কত সব আছেন ত।' রেবতী স্বয়ং তাহার উত্তরে বলিয়াছে, "সে ত নিশ্চয়ই। কে কখন কোন্ নক্ষত্রের পাল্লায় পড়ে যায় তা বলা যায় কি ?"

'সতীর পতি' উপন্যাসেও একজন নিশাকর আছেন, তিনি বিপিনবাবু। লেখক 'নবনিশাকর' পরিচ্ছেদে তাঁহাকে নিশাকরের ভূমিকা দিয়াছেন।[১৮]

'গরীব স্বামী' উপন্যাসের প্লটে প্রভাতকুমার দেবী চৌধুরাণীর আংশিক অনুসরণ করিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠক দরিদ্র-কন্যা প্রফুল্লকে সাংখ্যবেদান্ত ন্যায় ইত্যাদি শিক্ষা দিয়াছিল এবং নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। 'গরীব স্বামী'তে দেবেন্দ্র একটি অল্প বয়স্কা মেয়ের সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কারণ—

"যাকে আমি বিবাহ করবো, যে আমার সারাজীবনের সঙ্গিনী, সুখদুঃখের ভাগিনী হবে, তাকে আমি নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে চাই।"[১৯] দেবেন্দ্রর শিক্ষাদান পদ্ধতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে ভবানী পাঠকের পাঠশালার আদর্শে। উভয়েরই কালসীমা পাঁচবৎসর।

"কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে রাখবো। লেখাপড়া শেখাবার জন্যে জনকয়েক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে দেব। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর শিক্ষাদান যে রকম বন্দোবস্ত হয়েছিল, কতকটা সেই রকম আর কি।"[২০]

প্রফুল্লকে শুধু সংস্কৃত শেখান হইয়াছিল। দেবেন্দ্র কিন্তু তাহার মনোনীতাকে যুগোপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে চায়।

'প্রফুল্লকে শুধু সংস্কৃত শেখানো হয়েছিল আমি বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ও ফরাসী ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে চাই। তা ছাড়া শরীর চর্চা সম্বন্ধেও ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করব না, বঙ্কিমবাবুর পর থেকে ও বিষয়ে বিজ্ঞান অনেকদুর অগ্রসর হয়েছে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে।'[২১]

উষাকে লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রের মনে ভবানী পাঠকের কথা স্মরণ হয়—'ইস্পাৎ ভালই পেয়েছি, এখন গড়ে নিতে পারলেই হয়।'[২২]

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রভাতকুমারের উপন্যাসের চরিত্রগুলি বঙ্কিমী চিন্তায় চিন্তা করে, কথায় কথায় বঙ্কিম কোট করে। 'সতীর পতি'তে বিপিনবাবু হীরালালকে জগৎ সিংহের সহিত তুলনা করে। রেবতী 'মৃণালিনী'র প্রসঙ্গ তুলিয়া হীরালালের সহিত কৌতুক করে, আবার বঙ্কিম কোট করিয়া বলে 'অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।'[২৩]

প্রথম দর্শনজাত প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সন্দেহ ছিল। সম্ভবত সেইজন্য কেবলমাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাধারাণী' ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি প্রথম-দর্শনজাত গভীর প্রেম বর্ণনা করেন নাই। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"প্রেম কি আমি তাহা জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না।······ভালবাসা বা স্নেহ যাহা সংসারে এত আদরের তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংস্পর্শে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে সুদিনে দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখদুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর কাছে।······ নূতনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া বোধহয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়।[২৪]

'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে প্রথম দর্শনজাত প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন প্রভাতকুমার—

"যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নূতন তাহার আকর্ষণ অল্প বয়সের মনে অত্যন্ত প্রবল। নবগোপালের মন এখন এই আকর্ষণের বশীভূত। প্রেমে প্রথম দর্শনবাদ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রথম দর্শনের একটা আকর্ষণকে প্রেম বলিয়া ভুল করেন। হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেমের বিকাশ। প্রথম দর্শনে হৃদয়ের পরিচয় হয় না। প্রথম দর্শন প্রেম জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে—কিন্তু একটা আকর্ষণ জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট

বটে। কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। তাহার অপেক্ষা আর একটা প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নূতন পথে ছুটিবে। আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়া যখন স্থায়িত্বলাভ করে, তখনই তাহা প্রেম, পূর্বে নহে।"[২৫]

'নবীন সন্ন্যাসী'তে অবশ্য প্রভাতকুমারের চিন্তাধারা রবীন্দ্র প্রভাবিত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমী চিন্তাধারার অনুসরণ দেখা যায়। 'বিষবৃক্ষে' এক স্থানে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে বলিতেছেন—

'তুমি স্বর্গ মান না আমি মানি।' শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পুর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না। বুঝিলেন এখন মানেন। বুঝিলেন যে এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। 'সূর্যমুখী কোথাও নাই' একথা সহ্য হয় না—'সূর্যমুখী স্বর্গে আছেন' এ চিন্তায় অনেক সুখ।'[২৬]

'নবীন সন্ন্যাসী'তে শুনি ইহারই প্রতিধ্বনি—

'আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, আমার মনে হতে লাগল মরে গেলেই মানুষের সব শেষ হয় এ হতেই পারে না। তা হলে ত আর আমাদের দেখা হবে না—কস্মিনকালেও নয়। এ একেবারেই অসম্ভব। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। তখন বিশ্বাস করতে লাগলাম নিশ্চয় আমার স্ত্রী আত্মারূপিনী হয়ে কোথাও আছেন। আমার আত্মা এই দেহ যখন পরিত্যাগ করিবে, তখন আবার আমাদের মিলন হবে। পরলোকে বিশ্বাস ফিরে এল, সংশয়বাদ ঘুচে গেল।'[২৭]

অবশ্য ঈশ্বর, পরলোক এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস যে প্রভাতকুমারের সৃষ্ট চরিত্রটিই করিয়াছে তাহা নয় স্বয়ং প্রভাতকুমারের এই বিশ্বাস ছিল, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে তিনি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। পত্রটি প্রভাতকুমারের স্ত্রীর মৃত্যুর পর লিখিত। আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি জড়বাদী নহি। অপিচ ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমি নিশ্চিন্ত আছি—এবং নিশ্চিন্ত আছি যে এ বিরহ চিরবিরহ নহে। আমি ধৈর্য বাঁধিয়া সেই শুভমিলনের দিন প্রতীক্ষা করিতেছি। যদি কখনও ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস হারাই, তবেই এই পুনর্মিলনের আশা ভাঙ্গিবে।"[২৮]

নারী চরিত্র

প্রভাতকুমারের নারী চরিত্রগুলির অগাধ পাতিব্রত্য বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী চরিত্রগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যকে শিল্পমণ্ডিত রূপে প্রকাশ শুধু বঙ্কিমচন্দ্র অথবা প্রভাতকুমারের বিশেষত্ব তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া ইহার জের এখনও চলিতেছে। বিবাহের সংস্কার আমাদের জাতীয় চরিত্রে

অত্যন্ত দৃঢ়মূল। শরৎচন্দ্রের মত প্রগতিবাদী লেখকও এই সংস্কারকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্নদা, শুভদা, মৃণাল, সতী ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে তাহার প্রমাণ আছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে শুধু পাতিব্রত্যধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামিনী বলিয়াই প্রভাতকুমারের স্ত্রী চরিত্রগুলিকে বঙ্কিমী বলা চলে না। আসল কথা প্রভাতকুমারের স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে যে সেবিকাভাব আছে সেইখানেই তাহারা বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী চরিত্রগুলির মত তাহারা নিজেদের স্বামীর দাসী বলিয়া পরিচয় না দিলেও তাহাদের কার্যকলাপ এবং চিন্তাভঙ্গির মধ্যে এই দাসীভঙ্গিটি পরিস্ফুট।[২৯] কিন্তু এহ বাহ্য। প্রভাতকুমারের নারী চরিত্রগুলি স্বামীর ভালবাসায় নিজেদের দাবী বা অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। নিতান্তই যেন অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতায় স্বামী দেবতাটির স্নেহ তাহারা পাইয়াছেন, না পাইলেও একমাত্র অদৃষ্টের দোষ দিয়া ঈশ্বরের নিকট কান্নাকাটি করা ছাড়া তাহাদের আর করিবার কিছুই থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর পতিভক্তি দেখাইয়াছেন কিন্তু সেই পতিভক্তিকে কখনই প্রতিদানাকাঙ্ক্ষাহীন দেবভক্তির পর্যায়ে তুলিয়া দেন নাই। তাঁহার সূর্যমুখী, ভ্রমর, ইন্দিরা, শ্রী[২৯(ক)] স্বামীর ভালবাসাকে দয়ার দান বলিয়া মনে করে নাই। বরং তাহারা ভালবাসার অধিকারে স্বামীর উপর অভিভাবকগিরি করিতেও ছাড়ে নাই। 'ইন্দিরা'র প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি আহ্লাদিত হইয়াছি কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দাও করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে, তিনি আমার স্বামী এইজন্য আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার বিবেচনায় কোন দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র।.........অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী আমি স্ত্রী, তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না। মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।"

সুভাষিনী বলিল, "আমরা দাসী না ত কি?" আমি বলিলাম, "যখন তাঁর ভালবাসা জন্মিবে, তখন দাসীপনা চলিবে। তখন পাখা করিব, পা টিপিব, পান সাজিয়া দিব, তামাকু ধরাইয়া দিব। এখনকার ওসব নয়।"[৩০]

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে দেখি ইন্দিরার স্বামীভক্তি ইন্দিরাকে স্বামীর চরিত্র সংশোধনের ক্ষমতা দিয়াছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে নিশ্ছিদ্র ভক্তি ও অকুণ্ঠিত সেবা

তখনই সম্ভব হয় যখন স্ত্রী নিজেকে স্বামী-প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী বলিয়া মনে করে। এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইবার ফলেই ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলিয়াছে—

"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।"[৩১]

এই জন্যই ভ্রমর পত্রে নিজেকে স্বামীর সেবিকা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে তাঁহার স্ত্রী চরিত্রগুলি ভারতীয় হিন্দু স্ত্রী চরিত্রের আদর্শের ধারা বহন করিয়াও অনেকাংশে পাশ্চাত্য নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত।[৩২]

রক্ষণশীল সমালোচকেরা সেই জন্যই ভ্রমরকে আদর্শ হিন্দু রমণী বলিতে পারেন নাই।

"সূর্যমুখী ও ভ্রমরের চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমবাবু······পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন স্ত্রী পুরুষের প্রণয়সাম্যে কি অনিষ্ট ও······স্ত্রীর দাসীভাবে কি উপকার······। ভ্রমরের মাতৃভাব বা দাসীভাব কিছুমাত্র ছিল না, কেবল ছিল সখীভাব।"[৩৩]

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের বিবাহিতা নারী চরিত্রগুলির মধ্যে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ বা আত্মমর্যাদাবোধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং কুমারী চরিত্রগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী নির্বাচনে উষার স্বাধীন-মতামত (গরীব স্বামী) কিংবা ভৈরববাবুর অনুরোধ, আদেশ, ও ভয়প্রদর্শন সত্ত্বেও খগেন্দ্রকে বিবাহে প্রতিমার দৃঢ় অসম্মতি (প্রতিমা) আমাদের এই মন্তব্যের পরিপোষক। কিন্তু বিবাহিতা হইলেই তাহারা স্বামীর সংসারে এক একটি অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী হইয়া পড়ে। সেই অবগুণ্ঠনের আড়ালে তাহাদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাটি হারাইয়া যায়। এই জন্যই বালিকা রমাসুন্দরীর চপলতা, দুর্দমনীয়তা বা স্বাধীন মতামত কোন কিছুই আর বিবাহিতা রমা সুন্দরীর মধ্যে পাই না। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের আক্ষেপ এক্ষেত্রে যথার্থ বলিয়া মনে হয়—

"অমন অনন্যসাধারণ একটি বালিকা চরিত্রকে মিলনান্ত সংসার সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া তিনি কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন······"[৩৪]

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে আমরা এমন চারিটি স্ত্রী চরিত্র পাই যাহাদের স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত হইয়াছিল। তাহারা 'নবীন সন্ন্যাসী'র সুলোচনা, 'সিন্দুর কৌটা'র বকুরানী, 'সতীর পতি'র সুরবালা এবং 'আরতি' উপন্যাসের আরতি। ইহাদের মধ্যে গোপীবাবুর স্ত্রী সুলোচনা এবং হীরালালের স্ত্রী সুরবালা এতই অস্ফুট চরিত্র যে তাহাদের নিজস্ব কোন চিন্তা ভাবনা আছে বলিয়াই মনে হয় না। হীরালাল যখন রেবতীসহ দার্জিলিঙ্গে বিহার করিতেছিল তখন সুরবালার শুধু কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে ফেরানোর কথা মনে পড়িল। গোপীবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের অধিকাংশই তাঁহার স্ত্রীর অগোচরে ছিল। সেই অগোচর

দিকটির নোংরামি যখন মোহিতের ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল তখন সুলোচনাও একমাত্র কান্না ও ঈশ্বরের নিকট স্বামীর সুমতি প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে নাই। উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রীর প্রেম বা ভক্তি এত কুন্ঠিত যে তাহা স্বামীর উপর কোন অধিকারই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এই পাতিব্রত্যের বা স্বামী-সেবার মধ্যে প্রেমের গৌরব নাই, আছে নিরুপায়ের বশ্যতা স্বীকার। ইহাদের মধ্যে আরতির চরিত্রে কিছুটা বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সুরবালা অথবা সুলোচনার ন্যায় ক্রন্দনশীলা নয়। স্বামীর আশ্রয় না পাইয়া সে স্বনির্ভর হইয়াছে—কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীর প্রেম বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করে নাই। অবশ্য স্বামী মদ্যপ এবং গণিকাসক্ত হইলেও স্বামীভক্তি তাহার কাহারও অপেক্ষা কম নয়। আদর্শ হিন্দু রমণীর ন্যায় আরতি তাহার স্বামীকে সেবাযত্নে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ বিমলাকে বৃহৎ পৃথিবীর চোখের সম্মুখ হইতে জয় করিতে চাহিয়াছিল, সমাজ প্রদত্ত দান হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ছোট গল্পেও আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে গোঁজামিল আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"পুরোহিতের হাত হইতে পাওয়াটাই সব নয়, বিধাতার নিকট হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়।"[৩৫]

"দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে থাকে কথাটা।"[৩৬]

"যোগাযোগ" উপন্যাসে কুমুদিনীর সমস্যাও ছিল তাই। মধুসূদনের চরিত্রের স্থূলতা প্রতিনিয়ত কুমুদিনীকে বিদ্ধ করিয়াছে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমস্যা সাধারণতঃ দাম্পত্য প্রেমের সমস্যা নয়। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহারও কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"......নারীর স্বামী পরম পুজনীয় ব্যক্তি, সকলের চেয়ে বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।"[৩৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের অরণ্যকন্যা কপালকুণ্ডলাও বলিয়াছে—"যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"[৩৮]

বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ বাংলার এই তিনজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের রচনাভঙ্গি, চিন্তাভাবনা ইত্যাদিতে যতই প্যার্থক্য থাকুক না কেন, নারীর স্বামী ভক্তি যে শুধু আদর্শকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না, এ সম্পর্কে তাঁহারা সকলেই একমত। এই সত্য

প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহারা প্রেমকে অন্য সর্বপ্রকার জীবন সমস্যা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের নায়িকাদের অন্ন বস্ত্রের অথবা অন্য কোন কিছুর সমস্যা নাই, তাই অখণ্ড অবসরে তাহারা মান অভিমানের মালা গাঁথিয়াছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে বিশেষ করিয়া নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংসারে স্ত্রীদের এমন নিরবচ্ছিন্ন প্রেম চর্চার অবসর বড় মেলে না। সেখানে তাই অনাসক্ত স্বামীকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধে না, যদি স্বামীটি স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বটুকু না বিসর্জন দেয়। এইজন্যই 'সতীর পতি' উপন্যাসে হীরালাল ও রেবতীর পলায়ন সংবাদে হীরালালের চাকুরী থাকিবে কিনা সেই আশঙ্কাই হীরালালের পরিবারকে অধিকতর পীড়িত করে।

"সংসারের খরচপত্র যথাসাধ্য কমাইয়া দেওয়া হইল। খুকীর জন্য পূর্বে একপোয়া করিয়া দুধ লওয়া হইত তার পিতার চাকরী হওয়ার পর হইতে আধসের লওয়া হইতেছিল, আবার উহা একপোয়ে নামিল।"[৩৯]

এই জীবনযাত্রায় জর্জরিত বাঙ্গালীর সংসারে ভ্রমরের মান অভিমান, সূর্যমুখীর মনঃকষ্ট আশা করা যায় না। বরং সকলেই ত কিছু আর শুকদেব গোঁসাই নয়—কত পুরুষ মানুষের ত ওরকম দোষ থাকে তাই বলে কি তারা স্ত্রী সন্তানকে ভাসিয়ে দেয়?[৪০] এই মনোভঙ্গিই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

উপন্যাসের প্রধান উপকরণ প্রেম। প্রেমকে বাদ দিয়া সার্থক অসার্থক কোন উপন্যাসই বোধ করি সৃষ্ট হয় নাই। প্রভাতকুমারের উপন্যাসেও বিচিত্র প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসের ন্যায় তাঁহার প্রেমও সর্বপ্রকার বিশ্লেষণ বর্জিত। প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রভাতকুমারের উপন্যাসে নাই। তাঁহার 'রমাসুন্দরী' এবং 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাস দুইটির নায়কদ্বয় প্রেমে পড়িয়াছে, কিন্তু প্রেমের পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের কোন পরিচয় উপন্যাস দুইটিতে পাওয়া যায় না। উভয় উপন্যাসেই প্রেমের উপলব্ধি ঘটিয়াছে নায়কদের মনে এবং উভয়ক্ষেত্রেই নায়কদের প্রেমানুভূতি অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ ও প্রেমাভিব্যক্তি লঘুস্তরের।

পরবর্তী উপন্যাস 'রত্নদীপে'র বিষয়বস্তু কিছু গুরুতর। এই উপন্যাসে জাল ভবেন্দ্র ও বৌরাণীর পারস্পরিক আকর্ষণ বা অনুরাগ বর্ণনা করিবার সুযোগ লেখক পাইয়াছেন কিন্তু লেখক নিজে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বর্ণনা করিবার বরাত দিয়াছেন উপন্যাসের অন্য চরিত্রের উপর। কনকের মুখে শুনি, 'দু তিনদিন থেকে দেখছি, বিকেল থেকে সন্ধ্যের পর পর্যন্ত, অন্দরের বাগানে চাঁদের আলোয় দু'জনে পায়চারি করে বেড়ান।' দেওয়ানজিকে বলিতে শুনি, "যেরকম শুনছি, দুটিতে জোটের পায়রার মত অষ্টপ্রহর এক সঙ্গে আছে।......স্ত্রীকে ছুঁতে বারণ কিন্তু এ যে ছোঁওয়ার বাবা।" নায়ক

নায়িকার প্রেমানুভূতির এইরূপ পরোক্ষ বর্ণনার ফলে উপন্যাসটিতে প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত অথবা অন্তর্দ্বন্দ্ব যথাযথ রূপ পায় নাই। অবশ্য উপন্যাসের নায়িকার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে নূতন করিয়া প্রেম জন্মিবার অবকাশ সেখানে ছিল না। বৌরাণীর অন্তর স্বামী ভক্তিতে পরিপূর্ণ এবং রাখালকে সে স্বামী বলিয়াই জানিয়াছে। অতএব এই উপন্যাসে প্রেমানুভূতি ঘটিয়াছে নায়কের মনে। কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিক মুল্যবোধ সম্পর্কে প্রভাতকুমার এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম সচেতন হইয়াছেন। রাখাল নিজ স্ত্রীর ভালবাসা পায় নাই—বৌরাণীর একনিষ্ঠ পতিভক্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই মুগ্ধ হৃদয়ে জন্ম লইয়াছে প্রকৃত প্রেম। তাই একটি অতি সাধারণ মানুষ রাখাল অনুভব করে, "আমার পুজার প্রতিমাখানিকে আমি অপবিত্র করিলাম না, এই আমার সান্ত্বনা। ঐটুকুই আমার অবশিষ্ট জীবনের চির অন্ধকারের মধ্যে আলোক রেখা। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহার গলায় যে আমি ছুরি দিলাম না, যাহাকে পুজা করিবার জন্য বুকে সিংহাসন পাতিয়াছিলাম তাহাকে কলঙ্কিত করিলাম না, ইহাই আমার ভাবী জীবন আলোকিত করিয়া রত্নদীপের মত জ্বলিবে।"[৪১]

এইরূপ প্রেম সম্পর্কেই শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দুরেও ঠেলিয়া ফেলে।"[৪২] অনুরূপ উপলব্ধি ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনীর। তাই সে বিহারীকে বলিতে পারিয়াছে—"ভুল করিও না, আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দুরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি।"[৪৩]

বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দাম্পত্য-প্রেমের কবি। দাম্পত্য জীবন তাঁহার নিকট মনুষ্যত্ব চর্চার সাধনক্ষেত্র।

"ইন্দ্রিয় পরিপসমাপ্তি বা পুত্রবধু নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ বন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত করিতে পারে। বরং মনুষ্য জাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।"[৪৪]

দাম্পত্য জীবন, পারস্পরিক প্রীতি, আনুগত্য ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহই এই পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আঘাত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল এবং শৈবলিনীর জীবন তাহার উদাহরণ। জ্ঞানতপস্বী চন্দ্রশেখরের জ্ঞানচর্চা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন চর্চার বাধা স্বরূপ হইয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহাকে ইহার জন্য কঠিন আঘাত পাইতে হইয়াছে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগই সেই আঘাত। ইহারই ফলে চন্দ্রশেখরের চক্ষু ফুটিয়াছে তিনি যে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই তাহা বুঝিয়াছেন এবং নিজেকে সংশোধন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' গল্পটি স্মরণযোগ্য। সেখানেও জ্ঞানচর্চা দাম্পত্যজীবনকে ব্যাহত করিয়াছে এবং স্ত্রীর গৃহত্যাগ স্বামীর ভুল ধরাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানেই দাম্পত্যজীবন আঁকিয়াছেন সেখানেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের চিত্র দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিষবৃক্ষের শ্রীশ ও কমল, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী, কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের কথা স্মরণ করিতে পারি। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল যথাক্রমে কুন্দ এবং রোহিণীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা তাহাদের কমে নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্য-প্রেম দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র পারস্পরিক সেবাযত্নের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করেন নাই বরং নগেন্দ্রনাথের যত্নের বাড়াবাড়িই নগেন্দ্রনাথের ভালবাসার অভাব সূর্যমুখীর নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সেবাযত্ন যে করে সে না করিয়া পারে না বলিয়াই করে অথবা অনেক সময় নিজ গুণ সর্ব সমক্ষে প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষায় করে। তাহার সহিত ভালবাসা অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রেমে'র কোন নিগূঢ় সম্পর্ক নাই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় হইল প্রেমের বিচিত্র রহস্যোদ্ঘাটন। তিনি জানাইলেন—

"সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মত ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে।"[৪৫]

এই জন্যই আশা ও মহেন্দ্রর প্রেমে অভিশাপ লাগিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যাহাকে ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না।"[৪৬] রবীন্দ্রনাথ বলিলেন— "নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হইয়া যায়, এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই।"[৪৭] প্রকৃত প্রেমোপলব্ধিতে চিত্ত উদ্বোধিত হয়। সেখানে যোগ্য নারী পুরুষই প্রধান কথা। তাহারা স্বামী-স্ত্রী হইল কিনা তাহা বাহ্য ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাসে ('চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'বাঁশরী' ইত্যাদি) দেখি চিত্তের উদ্বোধন যাহার স্পর্শে হইল বিবাহ তাহার সহিত হইল না। প্রকৃত প্রেম বিশেষকে আশ্রয় করিয়া যাত্রা শুরু করিলেও পরিণামে তাহা নির্বিশেষ উপলব্ধিতে পরিণত হয়। প্রেম সেখানে বন্ধন নয়। সে মুক্তি স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এই প্রেমোপলব্ধিতে মুখর। 'চোখের বালি'র অন্নপূর্ণা আশাকে যে প্রেম সাধনার কথা

বলিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্তিও গৌণ হইয়া যায়। 'নৌকাডুবি'র কমলারও ঐ একই উপলব্ধি।

"ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন, এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ নাই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"[৪৮]

সমসাময়িক লেখক গোষ্ঠীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব পড়িয়াছিল। জ্ঞাতে, বা অজ্ঞাতে তাঁহারা রবীন্দ্রভাবনায় ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখনও 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রভাব লেখকদের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাহার উপর দেখা দিল 'চোখের বালি'। ইহারই ফলে সমসাময়িক খ্যাতনামা লেখকদের রচনাতে ও তাঁহাদের নিজস্বতার ফাঁকে ফাঁকে কখনও বঙ্কিমচন্দ্র কখনও রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়াছেন।[৪৯] প্রভাতকুমারের 'সিন্দুর কৌটা' এবং 'সতীর পতি' উপন্যাসে বঙ্কিম রবীন্দ্রের যুগ্ম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে পত্নীব্রত যুবক বিজনকুমার স্ত্রী বকুরাণীর অগাধ ভালবাসা পাইয়াও সুশীর প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং বকুরাণী নিজেই উদ্যোগী হইয়া সুশীর সহিত স্বামীর বিবাহ দিল। এই মূল কাহিনী 'বিষবৃক্ষের' অনুরূপ। কিন্তু বকুরাণীর চরিত্রে 'চোখের বালি'র আশার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহেন্দ্র বিনোদিনীর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল। আশার মনে স্বামীর প্রতি যত অভিমানই থাক, 'রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রর হাতে দিলেন তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রর নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল।'[৫০] বিনোদিনীকেও আশা ক্ষমা করিল কারণ, 'মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিরূপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে।'[৫১] 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে বকুরাণীর একান্ত ক্ষমা আশাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার আশার মতই সে নিজের ভালোবাসার আলোকে অন্যের ভালোবাসাকে উপলব্ধি করিয়াছে। 'নৌকাডুবি'র কমলাও হেমনলিনীকে বলিয়াছে 'তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।'[৫২] বকুরাণীও সুশীকে বলিয়াছে 'আমি কিন্তু স্বামীকে সেবা করবার, যত্ন করবার, সুখী করবার সামগ্রী বলিয়াই মনে করি।······তোমারও ত দেখছি তাই উদ্দেশ্য, সেই একই ব্যক্তিকে সুখী করা, যত্ন করা, সেবা করা। তোমার আমার উদ্দেশ্য যখন এক তখন তোমায় আমায় বিরোধ কেন হবে।'[৫৩] 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসের সূচনায় উদ্ধৃত Lord Lytton (১৮০৩-৭৩) এর পংক্তিদ্বয়ে[৫৪] প্রেমের আত্মবিলোপকারী যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে, উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য তাহাই। 'সতীর পতি'তে

রেবতীর প্রেমের মধ্যেও দেখি এই আত্ম উদ্বোধন। থিয়েটারের নটী, বহুবল্লভা রেবতী হীরালালের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইল। তখন সে অনায়াসে প্রেমের বন্ধন হইতে নিজ দয়িতকে মুক্তি দিয়া নিজেকে দূরে সরাইয়া দিল। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রেম সাধনাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন প্রভাতকুমার তাহা করেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট প্রেমিক প্রেমিকা চরিত্রগুলি খুব উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রেমের অতলান্ত গভীরতা, প্রেমের দুর্বিসহ যাতনা, প্রেমের প্রগাঢ় প্রশান্তি কোনটাই প্রভাতকুমারের লঘু ভাষাভঙ্গি সার্থক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। তাই বকুরাণী অথবা রেবতীর মহৎ ত্যাগ অথবা সুশীর সুগভীর প্রেমাসক্তি পাঠকচিত্তে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে না।

প্রভাতকুমার প্রায় সর্বপ্রকার প্রেমচিত্রই আঁকিয়াছেন। কুমারীর প্রেম, দাম্পত্য প্রেম, বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বৃদ্ধের প্রেম, গ্রাম্য বালিকার প্রেম, আলট্রা মডার্ণ বালিকার প্রেম এবং বারাঙ্গনার প্রেম তাহার উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে যতপ্রকার প্রেমের সম্ভাবনা ছিল তাহার সবগুলিকেই প্রভাতকুমার তাঁহার কোন না কোন উপন্যাসে স্থান দিয়াছেন। কুমারীর প্রেমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সমর্থন ছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিম যুগে হিন্দু পরিবারে বাল্যবিবাহ বহু প্রচলিত ছিল। ফলে তৎকালীন সমাজে কুমারীর প্রেম সঞ্চার-সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু প্রভাতকুমারের যুগে মেয়েদের বয়স্কা করিয়া শিক্ষা দিয়া বিবাহ দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। 'প্রতিমা' উপন্যাসে প্রতিমার প্রেম, 'মনের মানুষে'র ইন্দুবালার প্রেম এবং 'গরীব স্বামী'র উষার প্রেম এই প্রকার শিক্ষিতা তরুণীর প্রেম। এই শিক্ষিতা তরুণীদের বিশেষত্ব তাহাদের স্বাধীন স্বামী নির্বাচন এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। তাহারা অভিভাবকদের হাতের পুতুল নয়। উষার বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া চারুর সহিত মিলিত হওয়া (গরীব স্বামী) অথবা প্রতিমার আশ্রয়-চ্যুতির ভয় থাকা সত্ত্বেও খগেন্দ্রকে বিবাহে ঘোরতর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন তাহাদের স্বাধীন-চিত্ততা এবং শিক্ষিত মানসিকতার পরিচায়ক।

আধুনিক সাহিত্যিক আক্ষেপ করেন যে 'আমরা সাবিত্রীকে পতি মনোনয়ন করিতে না দিয়াই সতী হইবার উপদেশ দিই।'[৫৫] পুত্র কন্যার বিবাহের সময়ে আমরা পারিবারিক সম্ভ্রম এবং পরিবারের সুখশান্তির কথাই চিন্তা করি। পরিবারের প্রয়োজন ব্যতীত প্রেম যে সমাজে অস্বীকৃত সেই সমাজের মেয়ে যখন ঘোষণা করে "আমি এই চার পাঁচ মাস আপনার ছোটছেলেকেই আমার স্বামীজ্ঞানে মনের মধ্যে নিত্যপূজা করে এসেছি। তিনি ছাড়া অন্য কাহাকেও স্বামী বলে গ্রহণ করলে আমি কি ধর্মে পতিত হব না মা? আমার সতীধর্ম তাহলে কোথায় থাকবে?"

অথবা "আমি যাহাকে অন্তরের মধ্যে আমার পতিদেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে আমি অক্ষম। সে পাপে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও আমার পক্ষে সহস্রগুণে স্পৃহনীয়।"[৫৭]

আমাদের প্রথাবদ্ধ সমাজে এইরূপ ঘোষণা অভিনব বলিয়া মনে হয়। চিরকাল আমরা সেই শ্রেণীর মেয়েদের জয়গান করিয়া আসিয়াছি, যাহাদের 'বুক ফাটেত মুখ ফোটে না'। প্রভাতকুমারের অনূঢ়া নায়িকাদের এই অপবাদ দেওয়া চলে না। নায়িকাদের এই স্বাধীন-চিত্ততার মুলে লেখক ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব দেখাইয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষা মনের অনেক কুসংস্কার দুর করিতে সাহায্য করে, নারীকে আধুনিক যুগের পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী করিয়া তোলে। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের বধু অশেষ গুণশালিনী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কার-বদ্ধতার জন্য স্বামীর যোগ্য সহচরী হইতে পারে না, সেই ছিদ্র পথে পত্নীব্রত স্বামীর মনটিও পলাইয়া যায়। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে আমরা প্রেমের এই চিত্রই দেখিয়াছি।

পুরুষ চরিত্র

যে চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের ঘটনাধারা আবর্তিত, সে চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের সহানুভূতিধন্য এবং পাঠকের মনে যে চরিত্রের প্রভাব সর্বাধিক সেই চরিত্রকেই নায়ক বলা হইয়া থাকে। উপন্যাসে যদি একটি মাত্র চরিত্র প্রাধান্য পায় তাহা হইলে সেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে নায়ক বলিয়া চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কখনও কখনও দুইটি বা ততোধিক চরিত্র লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে প্রধান হইয়া উঠে। তখন নায়ক নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ এবং চন্দ্রশেখর, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ এবং সন্দীপ এবং শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম এবং সুরেশ এইরূপ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি ঘটনা-প্রধান। সেজন্য নায়কবিচারে বিশেষ সমস্যা সেখানে দেখা দেয় না। অধিকাংশ উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র একটিই। 'প্রতিমা' এবং 'গরীব স্বামী' উপন্যাস দুটিতে কোন পুরুষ চরিত্রই কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দুতে স্থান পায় নাই। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে খল চরিত্র গদাই পাল অযথা প্রাধান্য পাইয়াছে, কিন্তু সেখানেও নায়ক নির্ণয়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই। মোহিতই এই উপন্যাসের নায়ক। 'সুখের মিলন' উপন্যাসে দুটি সমান্তরাল কাহিনীর মধ্যে একটির নায়ক হ্যারি বনার্জি, অপরটির নায়ক শান্তি। এই উপন্যাসের নামকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে শান্তি ঊষার কাহিনীটিই মুল কাহিনী এবং শান্তিই সেখানে নায়ক। কিন্তু মুল কাহিনী অপেক্ষা উপকাহিনীটি প্রাধান্য পাইয়াছে, ফলে মুল কাহিনীটি বিবর্ণ হইয়াছে এবং নায়ক শান্তিও

নিজ প্রাপ্য মর্যাদা পায় নাই। অবশ্য প্রভাতকুমারের অধিকাংশ নায়ক চরিত্রই অপরিস্ফুট এবং তাহাদের প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ। চারিত্রিক বলিষ্ঠতা তাহাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে সাধারণ মানুষের জীবনে কোন গভীর স্তর থাকে না। তাহাদের দুঃখ-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, আশা-নিরাশা জীবনের সচেতন অংশে ক্ষণিক বুদ্বুদের সৃষ্টি করিয়াই বিনষ্ট হয়। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে পাঠক সংকল্পের দৃঢ়তা, ঘটনানিয়ন্ত্রণের শক্তি এবং চারিত্রগৌরব প্রত্যাশা করে। প্রভাতকুমার পাঠকের সেই প্রত্যাশা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। মনে হয় চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা ঘটনাপ্রধান আখ্যানভাগকে অধিক মর্যাদা দেওয়ার ফলেই নায়কচরিত্রগুলি ভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের চরিত্রচিত্রণের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সমগ্র রচনায় কোন মহাপুরুষ অথবা চরিত্র মহিমায় ভাস্বর কোন অসাধারণ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাঁহার সৃষ্ট সাধুসন্ন্যাসী চরিত্রগুলি ত সকলেই অসাধু। তিনি যাহাদের কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই দোষেগুণে মিশ্রিত অতি সাধারণ সাংসারিক মানুষ। প্রকৃত পক্ষে প্রভাতকুমার সাধারণ বাঙ্গালী জীবনেরই চরিতকার—কোন মহিমান্বিত মহাপুরুষ চরিত্র সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই হয়ত তাঁহার ছিল না। তাই বাঙ্গালী জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কোন চরিত্রই সর্বজনীনত্ব লাভ করিতে পারে নাই। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

প্রভাতকুমারের তেরটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের মধ্যে 'রমাসুন্দরী'র নবগোপাল, 'নবীন সন্ন্যাসী'র মোহিত, 'রত্নদীপে'র রাখাল, 'সিন্দুর কৌটা'র বিজয়, 'সতীর পতি'র হীরালালকে মোটামুটিভাবে নায়ক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অন্য উপন্যাসগুলিতে একটি করিয়া মুখ্য পুরুষ চরিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহারা এতই অস্ফুট এবং অপরিণত যে তাহাদেরকে নায়ক বলা যায় না। নায়কদের মধ্যে 'রমাসুন্দরী'র নবগোপালকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তাহার চরিত্রের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা এবং পৌরুষের দীপ্তি পরিস্ফুট। অবশ্য লেখক সমগ্র কাহিনীতে চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। কাহিনীর প্রথমাংশে নিজ মনোনীতার প্রতি আকর্ষণ ও কর্তব্যজ্ঞানের সঙ্গে পিতার প্রতি আনুগত্য এবং মাতার প্রতি ভালবাসার যে সংঘর্ষময় চিত্র লেখক উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকমনে একটি প্রত্যাশা জাগে। কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে কাহিনীটি তাহার প্রত্যাশিত গতিবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে নায়ক নবগোপালের চরিত্রটিও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ পায় নাই।

বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘর্ষেই মানবহৃদয় বিকশিত হইয়া উঠে। ঔপন্যাসিক সেই সংঘর্ষময়

মানবহৃদয়কে বাহিরের পরিবেশে প্রতিফলিত করেন। প্রভাতকুমার তাঁহার উপন্যাসে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষময় মানবহৃদয়কে রূপায়িত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার নায়ক চরিত্রগুলি যখন যে প্রবৃত্তির সম্মুখীন হয় তখন তাহাই তাহাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। ইহারই ফলে নায়কচরিত্রগুলিতে আসিয়াছে অপরিবর্তনীয়তা (unchange-' blity) স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার নায়কেরা 'ফ্ল্যাট' এবং দুর্বৃত্ত চরিত্রগুলি 'টাইপধর্মী' হইয়া পড়িয়াছে। ঘটনা-প্রধান উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্র সাধারণত 'ফ্ল্যাট' হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। আমরা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়া সাধারণত বলিয়া থাকি অমুক এই চরিত্রের লোক। এইভাবে বলিতে গিয়া আমরা এই ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট অংশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকি। কেহ হয়ত কঠোর কর্তব্য পরায়ণ, কেহ বা দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত আবার কেহ বা স্বার্থপরতার জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু সেই পরিচয়ই তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। উপন্যাসেও যদি চরিত্রগুলি এইরূপ একরঙ্গা ভঙ্গিতে দেখা দেয় তাহা হইলে তাহাদেরই আমরা সমালোচনার ভাষায় 'ফ্ল্যাট' আখ্যা দিয়া থাকি। হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একরঙ্গা চরিত্রের সৃষ্টি বিশেষ বিরক্তির কারণ হয় না। কিন্তু চরিত্রটি যেখানে 'সিরিয়াস' সেখানে তাহা ফ্ল্যাট হইয়া পড়িলে পাঠকের প্রত্যাশা ক্ষুন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়—

"..... flat people..... are best when they are comic. A serious or tragic flat character is apt to be a bore."[৫৮]

প্রভাতকুমারের 'সিরিয়াস' চরিত্রগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ফ্ল্যাট' হইয়া পড়িয়াছে। একরঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও কৌতুকচরিত্রগুলি অথবা যে সব অসাধু চরিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় হইয়াছে। নায়কদের মধ্যেও যেখানে লেখক তাহাদের চারিত্রিক অসঙ্গতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন সেখানে একরঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উপভোগ্য হইয়াছে যেমন 'মনেরমানুষ' উপন্যাসে কুঞ্জলালের চরিত্র। কিন্তু 'সিন্দুর কৌটা'র বিজয় এবং 'সতীর পতি'র হীরালাল বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রভাতকুমারের নায়কদের বয়স কুড়ি হইতে ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে। তাহারা প্রায় সকলেই রূপবান এবং শিক্ষিত (অন্ততঃ ম্যাট্রিক ফেল)। তাহারা প্রত্যেকেই স্ত্রী শিক্ষার অনুরাগী। বাঙ্গালী মেয়ের মুখে ভাল ইংরাজি শুনিয়া তাহারা আকৃষ্ট হয়। বার্ণসের কবিতা পড়িতে এবং পিয়ানোর 'সোনাটা' শুনিতে তাহারা ভালবাসে। অল্পবিস্তর মদ্যপানের অভ্যাস তাহাদের অনেকেরই আছে।

প্রভাতকুমারের নায়কচরিত্রগুলির মধ্যে গভীরতা নাই সত্য, কিন্তু তাহারা একটি বিশেষ যুগের সমাজ মানসিকতাকে প্রতিফলিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া

সে যুগের শিক্ষিত যুব সমাজ যে ইংরাজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাইবে।

খল চরিত্র

স্বভাবত প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রতিপক্ষের সর্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প নিষ্ঠুর অথচ বলিষ্ঠ চরিত্রকেই খল (ভিলেন) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহারা উদ্দেশবিহীনভাবে নিষ্ঠুর (**Motivelessly malignant**) হইয়া থাকে এবং অপরের দুঃখকষ্টে অকারণ পুলক (**Disintrested delight**) অনুভব করে। যাহা কিছু সৎ তাহা বর্জন করিয়া ইহারা অসতের উপাসনা করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এইরূপ 'খল' চরিত্রের অভাব নাই। সেকসপীয়রের 'ইয়াগো' এবং ডিকেনসের 'ইউরিয়াহিপ্' এই শ্রেণীর চরিত্র। বাঙ্গলা সাহিত্যে এইরূপ খাঁটি ভিলেন চরিত্র দুর্লভ। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের ভাঁড়ুদত্তের নাম মনে পড়িয়া যায়। অবশ্য খাঁটি খল চরিত্র না থাকিলেও দুর্বৃত্ত বা অসাধু চরিত্রের অভাব বাঙ্গলা সাহিত্যেও নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গঙ্গারাম (সীতারাম) ও হীরা (বিষবৃক্ষ), রমেশচন্দ্রের শকুনি (বঙ্গবিজেতা), তারকনাথের শশাঙ্ক (স্বর্ণলতা), রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলা (বৌঠাকুরানীর হাট) এবং শরৎচন্দ্রের রাসবিহারীর (দত্তা) নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমারের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে এক বা একাধিক দুর্বৃত্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাদেরকে ঠিক খল চরিত্র বলা যায় না। ইহারা ইংরাজীতে যাহাকে **Villain** বলে সেই জাতীয় চরিত্র নয়। ইহারা কাহিনীর মধ্যে ষড়যন্ত্র বিস্তার করিয়াছে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, কিন্তু কেহই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। ইহাদের কার্যকলাপ নায়ক নায়িকার জীবনে কোন গভীর মনস্তাপের সৃষ্টি করিতে পারে নাই অথবা তাহাদের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে নাই, সাময়িকভাবে তাহাদেরকে বিব্রত করিয়াছে মাত্র।

প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'র সীতানাথ চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রথম একটি খাঁটি স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী পথভ্রষ্ট হইবার ফলে এই চরিত্রটি নিজ কার্যকলাপ প্রদর্শনের সবিশেষ সুযোগ পায় নাই। প্রথম উপন্যাসের এই ত্রুটি লেখক সুদে আসলে পরিশোধ করিয়াছেন পরবর্তী উপন্যাস 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল চরিত্রে মাধ্যমে। ধুর্ত গদাই পালের সমকক্ষতা করিতে পারে বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন চরিত্র খুব সুলভ নহে। এই জীবন্ত চরিত্রটি সমসাময়িক লেখক লেখিকাদের এমন ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল কেহ কেহ তাঁহাদের রচনায় এই চরিত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চরিত্রটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটিও উদ্ধারযোগ্য—"উপন্যাস হিসাবে

নবীন সন্ন্যাসী খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তাহার গদাই পাল আবহমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পাষণ্ডদের পংক্তিতে ভাঁড়ু দত্তের এবং ঠক চাচার পরের আসনেই অধিষ্ঠিত।" পরবর্তী উপন্যাস 'রত্নদীপে'র খগেন্দ্র চরিত্রটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহার ষড়যন্ত্রও অবশেষে ব্যর্থ হইয়াছে। 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'জীবনের মুল্য', 'প্রতিমা', 'নবদুর্গা', 'আরতি' ইত্যাদি উপন্যাসে যে সকল দুর্বৃত্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহারা উপন্যাসের মুল কাহিনীর সহিত জড়িত। কিন্তু যে সমস্ত উপন্যাসে দুর্বৃত্ত চরিত্রের কোন ভূমিকা নাই সেখানেও লেখক ভণ্ড সন্ন্যাসী অথবা ভণ্ড জ্যোতিষীর আমদানী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'জীবনের মূল্য' এবং 'মনের মানুষে'র নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমারের দুর্বৃত্ত চরিত্রগুলি যে পরিপুর্ণ ভিলেন হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহার কারণ ইহাদের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি। দুর্লভ চরিত্রগুলির বজ্জাতির মধ্যে যে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা লেখকের মধ্যে ক্ষমার্হ। লেখকের রচনাগুণে পাঠকও তাহাদের ক্ষমা করে। কারণ ভাঙ্গিবার জন্য কেহ যদি মাথা পাতিয়া দেয় তাহা হইলে দোষটা তাহারই। জনৈক আধুনিক সাহিত্যিক লিখিয়াছেন—

"আমরা চোরকেও ঘৃণা করি, বাটপাড়কেও ঘৃণা করি, কিন্তু বাটপাড় যদি আপনার বিদ্যেটা ফলিয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করে তো সেটা হয় পরম উপভোগ্য। তাকে শুধু ক্ষমাই করি না, তার বেঁচে থাকা পরম অবাঞ্ছনীয় জেনেও তাকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করি 'জীতা রও বেটা'।"৫৯

প্রভাতকুমারের সহানুভূতি পাত্রাপাত্র বিচার করে নাই। জাল জুয়াচুরিতে সিদ্ধহস্ত গদাই পালই হউক কিংবা তহবিল তছরূপকারী অধর মুখুজ্যে হউক অথবা পরস্বাপহরণকারী পঞ্চাননই হউক লেখকের প্রসন্ন আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে সকলেই। গদাই পাল অসদুপায়ে অর্জিত টাকাকড়ি গুছাইয়া লইয়া চম্পট দিয়াছে। পুলিশ তাহার কোন সন্ধান পায় নাই, অধর তহবিল তছরূপের কোন শাস্তি ত পায় নাই বরং নবদুর্গার ন্যায় স্ত্রী লাভ করিয়াছে, পঞ্চানন নিজ কৃতকর্মের জন্য ভিখারী হইয়াছিল, কিন্তু লেখক তাহার বিষয় সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। একমাত্র 'নবদুর্গা' উপন্যাসের মোহান্ত মহারাজ ছাড়া আর কোন দুর্বৃত্তই দৈহিক শাস্তিলাভ করে নাই। আসলে মোহান্ত যে অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা ক্ষমা করা সহৃদয় লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। উপরোক্ত চরিত্রগুলিকে আমরা 'ভিলেন' আখ্যা দিতে চাই না। ইহারা প্রায় সকলেই সাধারণ গৃহস্থ, হৃদয়ের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। গদাই পাল প্রধানত অর্থের লালসায় এবং রমণ ঘোষের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজের কুটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছে।

'রত্নদীপে'র খগেন্দ্রেরও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অর্থপ্রাপ্তির। রাখালের প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ ছিল না। 'জীবনের মুল্যে'র দরিদ্র স্কুল শিক্ষক সতীশও অর্থের জন্যই গিরিশের চাটুকারিতা করিতে গিয়া ঝুরি ঝুরি মিথ্যা কথা বলিয়াছে। অন্যান্য দুর্বৃত্ত চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে মানবিক লোভ, লালসা, বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই তাহারা অসৎপথ অবলম্বন করিয়াছে। নিঃস্বার্থভাবে অপরের অনিষ্ট করিবার জন্যই তাহারা তৎপর হয় নাই। তথাপি গদাই নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দুই ভ্রাতার সম্পর্ক যেভাবে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, শান্তির সংসারে যেভাবে চরম অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে তাহাতে সে প্রায় ভিলেনধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। 'আরতি'র পঞ্চাননও অবশ্য কম যায় না। সদ্য মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের সে যেভাবে সর্বস্বান্ত করিয়াছে তাহাতে তাহাকে পাষণ্ড বা ভিলেন বলিতে কুণ্ঠা হয় না।

অপ্রধান চরিত্র

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি খুব উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত না হইলেও অপ্রধান চরিত্রগুলি প্রায় সর্বত্রই অল্প পরিসরে অল্প কয়েকটি রেখার মাধ্যমে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে সীতানাথের মায়ের চরিত্রটি বেশ উজ্জ্বল। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে চরিত্রের সংখ্যা সর্বাধিক, ছোট ছোট চরিত্রও অনেকগুলি, তাহাদের মধ্যে দারোগা শেফায়েৎ হোসেন, কেনারাম, হরিদাসী, কাশিয়াদহের সন্ন্যাসী, বাগানের মালী এবং তস্যপুত্র রামদাসোয়া লেখকের চরিত্র চিত্রণক্ষমতার সার্থক নিদর্শন। 'জীবনের মুল্যে'র সতীশচন্দ্র ও মাধব চক্রবর্তী, 'মনের মানুষে'র রমেশ ও হরিমতী, 'নবদুর্গা'র প্রভা এই চরিত্রগুলিও নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির এইরূপ সার্থকতার মুলে প্রভাতকুমারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) সহিত প্রভাতকুমারের তুলনা চলিতে পারে। দীনবন্ধুর রচনাতে ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি যে প্রাণবন্ত হইয়াছে তাহারও কারণ দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

উপন্যাসের গঠনরীতি ও টেকনিক

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি খুব সুগঠিত বলা চলে না। "তাঁহার রচনা যতই দীর্ঘ হইয়াছে তাহাতে গাঁথুনির ফাঁক ততই স্পষ্ট হইয়াছে।"৬০ সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার আসিয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে অবশ্য এক বা একাধিক উপকাহিনী থাকিতে পারে যদি তাহা মুল কাহিনীর পক্ষে

অপরিহার্য হয় অথবা মুল কাহিনীর বিকাশে সহায়ক হয়। প্রভাতকুমার কিন্তু যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন ছোট ছোট কাহিনী তাহার উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যাহার প্রয়োজন ছিল না। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের কাশ্মীর বর্ণনা প্রত্যক্ষবৎ এবং সুন্দর।[৬১] কিন্তু তিনটি পরিচ্ছেদ ধরিয়া এই বর্ণনা পাঠককে ভুলাইয়া দেয় যে সে একটি• উপন্যাস পড়িতেছিল। প্রকৃতপক্ষে 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধ এই কাশ্মীর বর্ণনার ফলেই শিথিল এবং শ্লথ গতি হইয়া পড়িয়াছে। 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভাতকুমারের সুদীর্ঘ উপন্যাস। ইহাতে চিত্র ও চরিত্রের সংখ্যাও অধিক। এই উপন্যাসে লেখক একটি 'ভৌতিক কাণ্ড' শীর্ষক যে পরিচ্ছেদটি সংযুক্ত করিয়াছেন মুল কাহিনীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। এই উপন্যাসে 'আফিমচীর' গল্পটিও অবান্তর। এইরূপ অবান্তর কাহিনী প্রভাতকুমারের প্রায় সব উপন্যাসেই আছে. 'সত্যবালা'য় হাজার খুনের স্থানের গল্প. 'জীবনের মুল্যে' মাইকেলের গল্প ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস ঘটনা প্রধান। ঘটনা প্রধান উপন্যাসে ঘটনার সহিত চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখাইতে হয়। তাহা না হইলে ঘটনা অর্থহীন হইয়া পড়ে। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন।—

"The amount and intensity of the description of anything should be proportionate to the importance of that thing in revealing character but should not be determinded by the authors personal interest in the thing described."[৬১]

প্রভাতকুমার কিন্তু বলিবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়েন নাই। তাছাড়া প্রভাত-কুমার এমন অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহাদের সম্পর্কে পাঠকের কোনই কৌতুহল থাকে না। যেমন লেখক 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে মোহিতের গৃহ প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিতেছেন—

"পরদিন প্রভাতে সেই ডিসপেন্সারিতে বসিয়াই অকস্মাৎ একজন সতীর্থের সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট টাকা ধার করিয়া গৃহস্থোপযোগী পরিচ্ছদে পুনর্বার সজ্জিত হইয়া বৈকালের গাড়ীতে মোহিত কমলপুরে যাত্রা করিল।"[৬২]

এইরূপ বর্ণনা যেন শিশুর কৌতুহল নিবৃত্তির চেষ্টা। মোহিত সন্ন্যাস জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া সংসারে প্রত্যাবর্তন করিল পাঠকের নিকট এই সংবাদটুকুই যথেষ্ট। সে বন্ধুর নিকট টাকা পাইল অথবা অন্য কাহারও নিকট পাইল, বৈকালের গাড়ীতে ফিরিল অথবা সকালের গাড়ীতে গেল সে বিষয়ে পাঠকের কোন কৌতুহল থাকিবার কথা নয়। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের সমাপ্তি পাঠকের সম্ভাব্য সকল প্রকার কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়া তবে ক্ষান্ত

হইয়াছে। উপন্যাস সমাপ্তির পর পাঠকের আর ভাবিবার কিছুই থাকে না। 'রমাসুন্দরী'র সমাপ্তিতে লেখক লিখিলেন—

"এক সপ্তাহ পরে নবগোপাল শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ হইল।...শ্রাবণ মাসে একদিন যখন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল তখন রমার একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মিল। খোকা এক মাসের হইল, দুই মাসের হইল...শেষে খোকা যখন তিন মাসের হইল তখন......পুজার পূর্বে পঞ্চমী তিথির দিন সকলে মিলিয়া দেশ যাত্রা করিলেন।"[৬৪]

প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেও দেখা যাইবে যে লেখক সর্বত্রই গল্পকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সাহিত্যিক-সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য।

প্রভাতকুমার তাঁহার উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিকে নামাঙ্কিত করিয়াছেন। সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র কেহই পরিচ্ছেদের নামকরণ করেন নাই। এই বিষয়েও প্রভাতকুমার বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে যেখানে ঘটনা সংঘাতই প্রধান, উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যেখানে বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে এইরূপ নামকরণ সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রত্যেকটি শিরোনামা ঐ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাটির ইঙ্গিত দেয়। এই নামাঙ্কনের ফলে উপন্যাস কিছুটা নাটক ধর্মী হইয়া পড়ে, পরিচ্ছেদগুলি যেন নাটকের এক একটি দৃশ্য। প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাট্য লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের উপন্যাসও নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। ডঃ সুকুমার সেনও যুক্তিসঙ্গত কারণেই মন্তব্য করিয়াছেন—"......প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কাব্যধর্মের অপেক্ষা নাটক ধর্মের লক্ষণ সমধিক।"[৬৫]

নাটকে ঘটনার প্রাধান্য থাকে এবং সেখানে চরিত্র বিশ্লেষণের কোন উপায় নাই, ঘটনা এবং চরিত্র উভয়ই বিশ্লেষিত হয় একমাত্র সংলাপের মাধ্যমে।[৬৫ক] ঘটনা প্রধান উপন্যাসেও থাকে সংলাপের প্রাধান্য। প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিতেও বর্ণনা অপেক্ষা সংলাপের অংশ বেশী। উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর আত্মগত চিন্তার ভিতর দিয়া পাঠক তাহাদের চিত্তবিক্ষোভ বা তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারে। কিন্তু নাটকে সংলাপের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। আবার যে উপন্যাসে লেখক পাত্রপাত্রীর মানস বিশ্লেষণ না করিয়া ঘটনাকেই পাঠকের সম্মুখে আনিয়া দেন সেখানে উপন্যাসে নাটক ধর্ম আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ লেখক সেখানে কেমন করিয়া হইল তাহা না বলিয়া কি হইল তাহাই পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন। 'সতীর পতি' উপন্যাসে প্রভাতকুমারের কৈফিয়ৎটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"রেবতী উঠিয়াছে, কিন্তু হীরালালের পতন ঘটিয়াছে। এই এক সপ্তাহে হীরালাল

আর সে হীরালাল নাই।......কি করিয়া দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ইহা ঘটিল, আধুনিক আর্টমুলক সে বর্ণনা করা এ বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সাধ্য নহে।"[৬৬] নাটকে আমরা যে রসটি পাই তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত এবং তাৎক্ষণিক। প্রভাতকুমারের উপন্যাস পাঠেও নাট্যদর্শনসুলভ তাৎক্ষণিক আনন্দ লাভ করা যায়। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংলাপের বিশিষ্ট ভঙ্গি এবং ভাষা আমাদের মনে যে প্রত্যক্ষানুভূতির সঞ্চার করে তাহা নাট্যদর্শনসুলভ। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

"উপবেশনান্তর গদাধর চশমাটি বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলেন। পরে তাহা চক্ষে সংলগ্ন করিয়া পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠাটি বাহির করিলেন। অনুচ্চ স্বরে এইরূপ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"বিবাহ···বিবাহ···আষাঢ়···অনেকগুলো দিন আছে দেখছি ৪।৫।১১।১৪।২৬।২৭।৩১ —আজ হল গিয়ে তোমার কঁয়ুই? ১৮ই জ্যৈষ্ঠ। এ মাসের বাকি থাকে বার দিন ওমাসের চার দিন, তাহলে হল ষোলদিন, ঠিকই হবে।"—বলিয়া তিনি শুভদিনের নির্ঘণ্ট ছাড়িয়া তাহার পর পঞ্জিকার অভ্যন্তরভাগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাস্থানে আসিয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"৪ঠা আষাঢ় ইংরাজি ১৮ই জুন মুং যাক্। বুধবার ত্রয়োদশী বিশাখা নক্ষত্র কৌলবকরণ সিদ্ধিযোগ এতগতে নক্ষত্রামৃত যোগ, জন্মে তুলা রাশি যাক, ইংরাজি ঘণ্টা ১০।২৩।৯ সেঃ মধ্যে ধনু মকর লগ্নে সুতহিবুক যোগে বিবাহ। দক্ষিণে যোগিনী —চুলোয় যাক্। বার্তাকুভক্ষণ নিষেধ। যাক্ তাহলে ৪ঠা ত দিন বেশ ভালই দেখছি।"[৬৭]

উদ্ধৃতিতে "অনুচ্চস্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন" ইহা যেন নাট্যকারের নির্দেশ এবং বাকী অংশ যেন অভিনয়-যোগ্য সংলাপ। নাটকে নাট্যকার থাকেন অলক্ষ্যে, পাত্র পাত্রীরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলে। কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁহার রচিত কাহিনীর মধ্যে নিজস্ব মন্তব্যের সাহায্যে অথবা বিষয় বিশ্লেষণের দ্বারা চরিত্র অথবা ঘটনার চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। সেখানে পাঠক অনেক সময় লেখকের ভাললাগা বা মন্দ লাগার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। কারণ—

"His own personality ought to be dissolved in to the images or characters of his book. The writer is offering us not reality but his reaction to whatever reality he has experienced."[৬৮]

প্রভাতকুমার তাঁহার উপন্যাসে বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। চরিত্র অথবা ঘটনা সম্পর্কে সাধারণভাবে তিনি কোন মন্তব্যও প্রকাশ করেন নাই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি নাটকোচিত স্বাধীনতা

পাইয়াছে। কাহারও সাহায্যে কাহাকেও চিনিতে হয় না। লেখকও ঘটনার সূত্রগুলি শুধু ধরাইয়া দিয়াছেন, কোথাও আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তবে ঘটনা বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে কাহিনীতে রহস্যের আমেজ আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে গোপীবাবুর বাগানবাড়ী সংক্রান্ত কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে হরিদাসীর মুখে, 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসে প্রভাবতীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী পাঠক জানিতে পারে একটি চিঠির মাধ্যমে, 'সুখের মিলন' উপন্যাসের রহস্যটিও উন্মোচিত হইয়াছে দুইটি পত্রের সাহায্যে। 'রত্নদীপ' উপন্যাসে সুরবালার কাহিনী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পরোক্ষ বর্ণনার দ্বারাই পাঠক জানিতে পারে ফলে সুরবালা সম্পর্কে একটি ভুল ধারণাই পাঠকের মনে সৃষ্টি হয়। কিন্তু কাহিনীর সমাপ্তিতে প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হইলে সুরবালা সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান হয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একটি চরিত্রকে আমরা অন্য চরিত্রের সাহায্যে বুঝি না বরং যেটুকু বুঝি ভুল বুঝি।

প্রভাতকুমার তাঁহার গল্প উপন্যাসে পত্র এবং স্বপ্ন এই দুইটিকে টেকনিক হিসাবে বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসে আরও অনেকের রচনাতেই এই দুইটির প্রয়োগ লক্ষিত হয় যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের এই তিনজন দিকপালই এই দুইটির ব্যবহার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের কাহিনীর অনেকখানি অংশ পত্রের মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলার পত্র, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ও গোবিন্দলালের পরস্পরকে লিখিত পত্রগুলি কাহিনীরই অংশ বিশেষ। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর পত্রের মাধ্যমে নগেন্দ্রনাথের চরিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়াছে। হরদেব ঘোষালকে লিখিত নগেন্দ্রনাথের পত্র দুইটিও নগেন্দ্রচরিত্রটি বুঝিতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' এবং 'শেষের কবিতা'য় পত্রের ব্যবহার করিয়াছেন। 'নৌকাডুবি'তে হেমনলিনীকে লিখিত রমেশের পত্রটি পড়িয়াই কমলা নিজ জীবনের সমস্যাটি উপলব্ধি করিয়াছে এবং রমেশের গৃহপ্রত্যাগমনের সংবাদ পত্র মারফৎ জানিতে পারিয়াই সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। 'চোখের বালি'তেও আশা পত্রের মাধ্যমেই মহেন্দ্র বিনোদিনীর সম্পর্ক বুঝিতে পারিয়া নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বিহারীকে লিখিত বিনোদিনীর পত্রটিরও কাহিনীতে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পেও পত্রকে কাজে লাগাইয়াছেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি ত পত্রাকারে রচিত।[৬৯] রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পত্রগুলি সর্বত্র কাহিনীর অগ্রগতিতে এবং চরিত্র পরিস্ফুটনে সহায়তা করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শ্রীকান্ত', 'চন্দ্রনাথ', 'দত্তা' ইত্যাদি উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার করিয়াছেন। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের কাহিনীতে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে পত্রদ্বারা এবং 'দত্তা'তে কাহিনীর জটিলতার অবসান ঘটিয়াছে পত্রের সাহায্যে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই লেখক পত্রের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পত্রগুলিকে উপন্যাসে উপস্থিত করেন নাই। 'শ্রীকান্ত' এবং 'বড়দিদি'তে অবশ্য সম্পূর্ণ পত্র ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু কাহিনীর অগ্রগতিতে এই পত্রগুলির বিশেষ কোন দান নাই। চরিত্রবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে এই পত্রগুলি কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছে মাত্র।

প্রভাতকুমার কি গল্পে কি উপন্যাসে প্রায় সর্বত্রই সম্পূর্ণাঙ্গ পত্রকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পত্রের শীর্ষদেশে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' অথবা 'ওঁ নমঃ শিবায়' অথবা 'সত্যমেব জয়তে' হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় খুঁটিনাটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ সম্পূর্ণাঙ্গ পত্র বাস্তবতার আমেজ আনে কিন্তু কাহিনীর পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 'সিন্দুর কৌটা' এবং 'রত্নদীপে'র পত্রগুলিতে ইষ্টদেবতার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কাহিনীর কোন ক্ষতি হয় নাই।

প্রভাতকুমারের প্রতিটি উপন্যাসেই পত্র আছে এবং তাহাদের সংখ্যাও অধিক। 'রমাসুন্দরী'তে পত্রের সংখ্যা চার, 'নবীন সন্ন্যাসী'তে পাঁচ, 'সিন্দুর কৌটা'য় আট এবং 'রত্নদীপে' বারো (চতুর্থ খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদটি সাতটি পত্রের সংযোগে গঠিত)।[৭০] অন্যান্য উপন্যাসে এবং ছোট গল্পেও একাধিক পত্র আছে।

প্রভাতকুমার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পত্রের ব্যবহার করিয়াছেন। কোথাও ইহা শুধু কুশল আদান-প্রদানের কাজে লাগিয়াছে। 'রমাসুন্দরী'তে নবগোপালের মাতার পত্র এবং 'সিন্দুর কৌটায়' সুশীকে লিখিত বিজয়ের বস্তুতান্ত্রিক প্রণয়লিপি এই শ্রেণীর পত্র। 'রমাসুন্দরী'তে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি দীর্ঘপত্র আছে কাহিনীর পক্ষে যাহা অপরিহার্য নয়। 'রমাসুন্দরী'র নবগোপালের পত্রটির সহিত 'গরীব স্বামী'র উষার পত্রের পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই স্বীয় মনোনীত অথবা মনোনীতাকে বিবাহে ইচ্ছুক নায়ক নায়িকা সেই সংবাদ তাহাদের অভিভাবককে পত্রদ্বারা জানাইয়াছে। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে তিনটি পত্রে গদাই গোপীবাবুকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু সেই পত্রগুলি পড়িয়াই যতীন্দ্রনাথ ছদ্মনামধারী গোপীবাবুর আসল পরিচয় এবং গদাইয়ের সমস্ত চক্রান্তের কথা জানিতে পারেন। অতএব কাহিনীতে এই চিঠিগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। একটি চিঠিকে কেন্দ্র করিয়া 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কাহিনীর জটিলতার মুক্তিও হইয়াছে পত্রের সাহায্যে, আবার কাহিনীর উপসংহারও

হইয়াছে একটি পত্রের দ্বারা। কিন্তু 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে পত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দুইটি সমান্তরাল কাহিনীর সংযোগ সাধন। মোহিতের নামাঙ্কিত একটি পোষ্টকার্ড মোহিতকে গদাই-গঙ্গামণি-গোপীকান্ত সংক্রান্ত বৃত্তান্তের সহিত জড়াইয়াছে। যদিও এই যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য তাহাও নহে, কিন্তু এই যোগসূত্রটিও যদি না থাকিত তাহা হইলে উপন্যাসটি এক মলাটের অন্তর্ভুক্ত দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হইত।

'প্রতিমা' উপন্যাসের সুখকর পরিণতির মূলে আছে একটি চিঠি। অন্যের নিকট লিখিত স্বামীর পত্র পড়িয়া স্বামীর পদস্খলনের বিবরণ জানিতে পারিয়াছে 'সতীর পতি'তে সুরবালা এবং ঐ উপন্যাসেই রেবতী সম্বন্ধে সকল মিথ্যা সন্দেহের অবসান ঘটাইয়াছে রেবতীর লিখিত পত্রটি। 'সিন্দুর কৌটা'য় বিজয় কুমারের চিঠিগুলি পড়িয়াই বকুরাণী বুঝিতে পারিয়াছে যে বিজয় ও সুশী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইতেছে। চিঠিগুলির মধ্য দিয়া সুশীর সহিত বিজয়ের পরিচয়, তাহার প্রতি সহানুভূতি, আকর্ষণ, অনুরাগের ক্রমিক পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতকুমার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন নাই—চিঠির ভাষা হইতেই বিজয়ের মনকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানেই চিঠিগুলির সার্থকতা।

'সুখের মিলন' উপন্যাসে হ্যারি বনার্জির লিখিত দুইটি পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে হ্যারি দুইটি পত্র লিখিয়া যান। একটি তাঁহার পূর্বপত্নী বেলা ও তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী খোস্‌লার নামে এবং অপরটি তাঁহার ভাগিনেয় শান্তিপ্রসাদের নামে। প্রতারিত হ্যারি নিজ অন্তরের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বেলা ও খোস্‌লার জন্য যে ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদ পাতিয়াছিলেন প্রথম পত্রটি তাহা সার্থক করিয়া তোলে। দ্বিতীয় পত্রটিতে সেই নির্মম পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং 'সুখের মিলন' উপন্যাসের সমস্ত জটিলতা ও রহস্যের অবসান ঘটে। নায়কের মৃত্যুর পর তাহার লিখিত পত্রের সাহায্যে কাহিনীর জটিলতাজালের উন্মোচন অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে।

পত্রের ন্যায় স্বপ্নও প্রভাতকুমারের উপন্যাসে বহু ব্যবহৃত। এই বিষয়ে প্রভাতকুমার বঙ্কিমানুসারী বটে কিন্তু পার্থক্যও প্রচুর। উপন্যাসে স্বপ্নের অবতারণা সম্পর্কে খ্যাতনামা সমালোচক বলেন—

"উপন্যাসে বা অন্য শ্রেণীর সাহিত্যকে যাঁরা দৈনন্দিন জমাখরচের খাতায় পর্যবসিত করতে চান তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, দিনের মধ্যে অন্তত আট ঘণ্টা অর্থাৎ জীবনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ যখন নিদ্রায় কাটে (অনেকের আরও বেশি) তখন সে অভিজ্ঞতা সাহিত্যের সামগ্রী হবে না কেন?"[৭১]

বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন বা মানসিক বিকারের ভিতর দিয়া কাহিনীতে অলৌকিকতার সঞ্চার

করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন, 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্ন বা 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর "বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের উপর নরকের বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া" ইহার উদাহরণ।

ফ্রয়েডের মতে অবদমিত যৌনতাই স্বপ্নে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।[৭২]

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসের গিরিশের স্বপ্নটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রভাবতীকে দেখিয়া গিরিশ মনের মধ্যে কামনা অনুভব করিয়াছিলেন, অথচ মনের মধ্যে ঔচিত্যবোধ জাগ্রত ছিল, উভয়ে মিলিয়া তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার প্রথমা পত্নীই যেন প্রভাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে দুই ভ্রাতাই স্বপ্ন দেখিয়াছে। পুলিশের ভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে পুলিশের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক, কারণ স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে জাগ্রত অবস্থায় আমরা যাহা চিন্তা করি অথবা যাহা চিন্তা করিতে চাই না তাহা স্বপ্নে দেখা যায়। স্বপ্ন দেখিয়া গোপীকান্ত বোধোদয়ের মন্তব্য স্মরণ করিয়াছে "স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র, আমরা জাগ্রতাবস্থায় যে সকল বিষয় চিন্তা করি রাত্রে তাহাই স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।" গোপীকান্তর এই চিন্তা তাহার যুক্তি বোধ দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু অনেক সময়ই মানুষ বিশ্বাসকে যুক্তির উপরে স্থান দেয়, অন্ধ বিশ্বাস অনেক সময়ই মনে যেরূপ শান্তি বা তৃপ্তি আনিয়া দেয় যুক্তির দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা হয় না। তাই গোপীকান্তর চিন্তা ও বোধোদয়ের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিল না।

'বোধোদয়ের কথা বাস্তবিকই কি ঠিক? স্বপ্নে দেবতারা আমায় সাবধান করিয়া দিতেছেন ইহাও তো হইতে পারে।' গোপীকান্তর চিন্তা বোধকরি কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া। এই স্বপ্নে কুন্দর মাতা কুন্দকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল এবং পরবর্তী ঘটনার দ্বারা কুন্দর স্বপ্নের যথার্থতা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু গোপীকান্ত স্বপ্নের ফেরে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইলেন। অর্থাৎ প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন নাই। তাই স্বপ্নকে অনাগত ঘটনার নির্দেশকারী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রভাতকুমারের নায়ক-নায়িকাগণের জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে। 'রত্নদীপে'র বউরাণী যদি নিজ স্বপ্নের যথার্থতায় বিশ্বাস না করিতেন অথবা তাঁহার শাশুড়ী যদি স্বপ্নের মধ্যে সত্যের ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন তাহা হইলে রাখালের ছদ্মবেশ আরও আগেই খসিয়া পড়িত বলিয়া মনে হয়। অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষাই বউরাণীর ঐরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ হইতে পারে। কনকের নিকট বিধবা বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সচেতন মনে তাঁহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—সেইদিন রাত্রে তাহার ফলে তিনি নিজেকে নববধুর মুর্তিতে দেখিয়াছেন। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে মোহিত দুইবার স্বপ্নে চিনিকে দেখিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই লেখক স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বপ্ন দুইটি মোহিতের দিবসচিন্তার ফল মাত্র।

প্রথমবার সারাদিন ধরিয়া চিনির লীলাচাপল্য দর্শনে মুগ্ধ মোহিত নিদ্রার আবেশে মনে মনে বলিল "মেয়েটি বেশ মিষ্টি। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সে সুখী হবে।" সেই রাত্রিতে মোহিত স্বপ্নে নিজেকে ও চিনিকে বর ও বধুর বেশে দেখিল। দ্বিতীয় স্বপ্নটি মোহিত দেখিয়াছে তাহার আশ্রয়দাতা বিপত্নীকের জীবন কাহিনী শুনিবার পর। নাস্তিক স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে শুনিয়া মোহিত নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিল। সেই রাত্রেই সে স্বপ্ন দেখিল যে চিনি তাহাকে 'এস' বলিয়া ডাকিতেছে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ স্বপ্ন 'মনের মানুষে'। দ্বাবিংশ. হইতে অষ্টাবিংশ এই সাতটি পরিচ্ছেদ জুড়িয়া একটি স্বপ্ন বিকার বর্ণিত হইয়াছে। কুঞ্জ সন্ন্যাসী প্রদত্ত মোদক খাইবার ফলেই জ্বরবিকারে আক্রান্ত হয় এবং অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। প্রভাতকুমারের ব্যবহৃত অন্যান্য স্বপ্নগুলির ন্যায় কুঞ্জের স্বপ্নটি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়।৭৩ কিন্তু এই দীর্ঘ স্বপ্ন বৃত্তান্তটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। লেখক স্বপ্নের সুযোগ লইয়া অবাস্তব ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। অবাস্তব অবশ্য কুঞ্জের অদৃশ্যরূপে সর্বত্র পরিভ্রমণ, অন্যথায় ঘটনাচিত্রগুলি সর্বত্র যথাযথ এবং বাস্তবানুগ। যেমন যোগেন্দ্র ও ইন্দু বালার বিবাহ বর্ণনার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের চিত্র, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার চিত্র এবং পতিতালয়ের বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব এবং স্বাভাবিক। অবশ্য যোগেন্দ্র ইন্দুর বিবাহ স্বপ্নে দেখা কুঞ্জর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ যোগেন্দ্র ইন্দুর প্রণয় ব্যাপারটি কুঞ্জের পরোক্ষে ঘটিয়াছিল। তাছাড়া স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভিনয় সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ তাহাই ঘটিয়াছে। কুঞ্জ তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত যোগেন্দ্রর সহিত ইন্দুর বিবাহ স্বপ্নে দেখিয়াছে এবং পরে বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষের' প্রথম স্বপ্নটির উল্লেখ করিতে পারা যায়। কুন্দ স্বপ্নে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন দুইজনকে দেখিয়াছিল পরে যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার জীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত স্থান পাইয়াছে। প্রভাতকুমারের মানসিকতা ভিন্নধর্মী। তাঁহার গল্প উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত অথবা অলৌকিকতা কোথাও স্থান পায় নাই। প্রভাতকুমারের সহাস্য কৌতুক পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করিয়া অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাস প্রবণতার মুলকে শিথিল করিয়া দেয়। ফলে প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে এইরূপ কিছু ঘটিলে তাহার অসঙ্গতিটুকু পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি—

"স্বপ্নে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর।" ৭৪
আমাদের মনে হয় দীর্ঘ স্বপ্নের এই অংশটি লেখকের অনবধানতা প্রসূত।

স্বপ্নের এই টেকনিকটি প্রভাতকুমার তাঁহার অগ্রজ লেখক ত্রৈলোক্যনাথের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'কঙ্কাবতী' এবং 'মুক্তামালায়' ত্রৈলোক্যনাথ এইরূপ

দীর্ঘ স্বপ্ন রচনার সাহায্যে অদ্ভুত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই স্বপ্নদ্রষ্টাদ্বয় জ্বরবিকারে স্বপ্ন দেখিয়াছে। 'মুক্তামালায়' এই জ্বরবিকার ঘটিয়াছে বিষাক্ত ঔষধ গ্রহণের ফলে। কুঞ্জও জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়াছে সন্ন্যাসী প্রদত্ত বিষাক্ত মোদক গ্রহণের ফলে।

উপন্যাসে ত্রুটি :—

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে নানাত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। প্রভাতকুমার মুখ্যত ছোট গল্পকার। উপন্যাস রচনায় তিনি অত্যন্ত পরিমিত আখ্যানভাগকে অকারণে অবান্তর ঘটনার সাহায্যে সুদীর্ঘ উপন্যাসের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে এমন অনেক অবাস্তব ঘটনা এবং অকারণ দীর্ঘ বর্ণনা আছে যাহা সকলেরই চোখে পড়ে। ট্রেনের সহিত মোটরকারের রেস প্রভৃতি ঘটনাবৈচিত্র্য রোমান্স হিসাবে আমাদের যতখানি না মুগ্ধ করে ততোধিক পীড়াদায়ক হয় লেখকের গল্পকে দীর্ঘায়িত করিবার কৃত্রিম প্রচেষ্টায়। এই প্রসঙ্গে 'মনের-মানুষ' উপন্যাসটিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানেও সুদীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখক কাহিনীর আকারকে যতখানি বাড়াইতে পারিয়াছেন, গল্পের মহিমা ততখানি বাড়াইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এমনও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে উপন্যাসের সহজ স্রোতটিকে লেখক ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিয়া এই ধরণের অবাস্তব লঘু চিত্রাঙ্কণের দ্বারা কাহিনীর আকার অনাবশ্যকভাবে বর্ধিত করিয়াছেন। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসেও একজন বুদ্ধিমান জমিদারের পক্ষে নবনিযুক্ত মুর্খ কর্মচারীর পরামর্শে ত্রস্তচিত্তে পলায়ন অস্বাভাবিক এবং লেখক সেই সুযোগে উপন্যাসের আয়তন কিছুটা বাড়াইয়া লইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি ক্ষুদ্র কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করিয়া কিভাবে উপন্যাসের আকার দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসখানি সম্পর্কে কিছু কিছু কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাসের ('রত্নদীপ', 'জীবনের মুল্য', 'আধুনিক রোমিও', 'খোকার কাণ্ড') পাণ্ডুলিপির একটি বাঁধান খাতা কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসের খস্ড়া ব্যতীত ইহার প্লটটিও লেখক খাতাটির এক জায়গায় অতি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

"বৃদ্ধ অথবা প্রৌঢ়। ২য় স্ত্রীর মৃত্যুর পর, আবার বিবাহের জন্য ক্ষেপিল। বলিল,

'অমুকের মেয়ে আমার ১ম পক্ষের গিন্নী মরেই জন্মেছেন। আমি স্বপ্ন পেয়েছি। সে মেয়ের বাপ গরীব—টাকার লোভে সম্মত হইল। একজন ফন্দীবাজ 'মেয়েটি আপনার জন্য পাগল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে', এই সব অলীক উপন্যাস বলিয়া, বৃদ্ধের কাছে টাকা-কড়িও আদায় করিতে লাগিল। বৃদ্ধকে একজন বলিল ওরূপ স্বপ্ন দেখলে রাজা হয় 'দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি' (শব্দ কল্পদ্রুম্ 'স্বপ্ন' দেখ)। এদিকে মেয়ে বাঁকিয়া বসিল। মেয়ের ভাই তাঁহার পক্ষ লইল। একজন গরীব সহপাঠীকে আনিয়া বিবাহ দিতেছিল এমন সময় বৃদ্ধ আসিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিল, বৎসর মধ্যে মেয়ে বিধবা হইবে।'

উদ্ধৃত অংশের নিচে লেখক কাহিনীর সমাপ্তিসূচক দুইটি মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ—

(১) বিধবা হইল। অনেক কষ্টে পড়িল। বৃদ্ধ অর্থ সাহায্য করিতে গেল। সে প্রত্যাখ্যান করিল।

অথবা

(২) মেয়ে বিধবা হইল না। শাস্ত্র (স্বপ্নতত্ত্ব ও ব্রহ্মশাপ) মিথ্যা হইল দেখিয়া বৃদ্ধ চটিয়া টিকি কাটিয়া ফেলিয়া পাঁউরুটি কিনিয়া খাইল।

দেখা যাইতেছে, 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসটিকে বিয়োগান্তক অথবা মিলনান্তক করিবেন কিনা সে বিষয়ে কাহিনী পরিকল্পনাকালে লেখকের মনে সংশয় ছিল। পরিশেষে তিনি অবশ্য দুঃখকর পরিণতিই রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের কেমন যেন সন্দেহ হয় যে উপন্যাসের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্যই হয়ত বা লেখক উপন্যাসটির বিয়োগান্তক পরিণতি করিয়াছেন। কারণ সুখান্তক পরিণতি করিলে এতগুলি মৃত্যুচিত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইত না এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরেই কাহিনী সমাপ্ত হইতে পারিত। কাহিনী কিভাবে দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে তাহার পরিচয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'জীবনের মূল্যে'র খস্ড়া পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিটির সহিত মুদ্রিত উপন্যাসের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। খস্ড়াটিতে ন্যূনাধিক ১২৫০টি শব্দ এবং উপন্যাসে প্রায় ৪৫০০০টি শব্দ আছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি ত্রুটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার একাধিক উপন্যাসে উপকাহিনী মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে অথবা তাহার প্রাধান্যকে খর্ব করিয়াছে। 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সত্যবালা', 'আরতি', 'সুখের মিলন' প্রভৃতি উপন্যাস হইতে এইরূপই প্রতীয়মান হয়।

জনপ্রিয়তার কারণ ঃ—

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রযুগের লেখক হইলেও চিন্তাধারার দিক দিয়া ছিলেন কতকটা বঙ্কিম

যুগের। তিনি ছিলেন মানসী গোষ্ঠীর লেখক। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন 'মানসী'র গোষ্ঠীপতি। 'মানসী গোষ্ঠী' সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—

'মানসী গোষ্ঠী রবীন্দ্রানুরাগী ছিল। কিন্তু তাহাদের চিন্তাধারা পুরাতন মন্তেরই অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নুতনতর সাহিত্য সৃষ্টিতে মানসী গোষ্ঠী সর্বদা খুব উৎসাহ বোধ করে নাই।'৭৬

প্রভাতকুমারের রচনাকে অবশ্য একেবারে প্রাচীনপন্থী বলা চলে না। বরং প্রাচীন এবং নবীন আদর্শের একটি সমন্বয় চেষ্টা তাঁহার উপন্যাসে লক্ষিত হয়। এই কারণেই তাঁহাকে আমরা বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রের মধ্যস্থলে স্থান দিতে চাই। তিনি যেন এই দুই মহারথীর মধ্যে সংযোগসেতু রূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রভাতকুমারের সমসাময়িককালে বঙ্কিমপ্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই আবার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সাহিত্যক্ষেত্রে নুতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছে। এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে প্রভাতকুমার উপন্যাস লিখিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন এই কথা স্মরণ রাখিয়াই তাঁহার জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর লেখকদের সমালোচনা করিয়া রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"আমরা এখনও ইউরোপীয়নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানাকারনিনার (Anna Karenina) মোহে চোখের বালিতে দেশের মনের সম্পূর্ণ বিরোধী নায়ক নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃংখলতার চিত্র আঁকিয়াছি, স্ত্রীর পত্রে ও নারীর মুল্যে 'ইবসেন' (Ibsen) এর মত প্রচার করিতেছি। আলফানসো ডডে (Alphanso Dandet) ও গিডেমোঁপাসা (Guy De Manpassant) বর্তমান নব্য সাহিত্যিক দলের গুরু হইয়াছেন।"৭৭ এই সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কাহাকেও রেহাই দেন নাই। কিন্তু প্রভাতকুমারের রচনা এই সমস্ত দলাদলির মধ্যে পড়ে না। তাঁহার উপন্যাস আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের প্রতিপক্ষ হয় নাই বলিয়া অনায়াসসাধ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। প্রভাতকুমার সম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকাটিও কালের গতির সমতালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হয় নাই অথবা উগ্র আধুনিকতার সমর্থন করে নাই। এই পত্রিকায় যেভাবে গ্রন্থ সমালোচনা করা হইত তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি—

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিনী, 'বিষবৃক্ষে'র হীরা এই সব আঁকিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু ঘোমটার পিছনে খেমটা নাচান নাই। প্রভাতবাবু কখনও ধরি মাছ না ছুই পানি গোছের সতী আঁকিয়া পাঠক পাঠিকাকে হতভম্ব করেন নাই।

স্বামীর আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে কি প্রকারে পরিপাটিরূপে আত্ম বঞ্চনা করিতে হয়, সেই বিদ্যায় ম্যাট্রিকিউলেট রবীন্দ্রবাবুর 'নষ্টনীড়ে'র চারুলতা, গ্রাজুয়েট শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র অচলা, এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে'র বিমলা। শেষোক্ত এই অপূর্ব উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা ভাষার ঝংকারে অলঙ্কারের প্রাচুর্যে মনকে অভিভূত করে। কিন্তু বরাবর একটা অশুচিভাব থাকিয়া যায়।

কয়েক ধাপ নামিয়া 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎবাবু গণিকার সাবিত্রীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র 'শাস্তি' উপন্যাসে সবাইকে টেক্কা দিয়া শাস্তি দিবার মানসে কুলবধু গোপা ও তাহার প্রণয়ী কমলাকে এক হোটেলে এক ঘরে ছয় মাস পুরিয়া বালিশ আড়াল দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন।[৭৮]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রভাতকুমারের লেখা নয়, কিন্তু সম্পাদক হিসাবে প্রভাতকুমার এইরূপ সমালোচনার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। মোটকথা 'মানসী গোষ্ঠী' আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন এবং এই গোষ্ঠীর পশ্চাতে যে এক বৃহৎ পাঠক সম্প্রদায় ছিল তাহাও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি।

শরৎচন্দ্র একবার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন—

"যে সব কবিতায় বা ছোটগল্পে অনেক fact আছে, ঘটনা আছে ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে। তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না, বোঝা সহজ।"[৭৯]

প্রভাতকুমারের উপন্যাসও সর্বপ্রকার জটিলতা বিবর্জিত এবং সহজবোধ্য। জনপ্রিয়তার কারণ অনেকাংশে এই সহজবোধ্যতা। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মনোহারী আধুনিক তরুণ-তরুণীর চিত্র আঁকিয়া একদিকে তিনি ফ্যাসানবুভুক্ষু উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, অপরদিকে তাঁহার উপন্যাসে এমন অনেক উক্তি আছে যাহাতে রক্ষণশীলদের খুশী হইবার কথা। যেমন—

"কোন চিন্তা নাই······তোমার বৌ হিঁদুর মেয়ে আর ইবসেনও পড়েনি। সময়ে এ ভাঙ্গা বেমালুম জোড়া লেগে যাবে দেখো।"[৮০]

"হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুশাস্ত্র তাদের যা শিক্ষা দিয়ে এসেছে, তা কি দুখানা আধুনিক নভেল আর মাসিক পত্রে ইবসেনের দুটো বদ তর্জমা পড়েই বদলে যাবে?"[৮১]

ইবসেনানুরাগীদের প্রতি এই কটাক্ষ যে কোন প্রাচীনমতাবলম্বী লুফিয়া লইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুঘরের বিধবা রোহিণীকে ব্যভিচারিণী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বিধবা বা কুলত্যাগিণীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা'র (১৯২২) লেখক যতীন্দ্র মোহন সিংহ উক্ত গ্রন্থে সমসাময়িক শক্তিশালী লেখকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেও রেহাই দেন নাই। কিন্তু প্রভাতকুমারের রচনায় তিনি বিরুদ্ধতা করিবার মত কিছু পান নাই। প্রভাতকুমার কোন হিন্দুনারীকে দ্বিচারিণী করিয়া দেখান নাই। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে বিবাহিতা সুশী বিজয়কে ভালবাসিয়াছে কিন্তু সে খ্রীষ্টান। 'মনের মানুষে'র ইন্দুবালা বালিকা বয়সে একজনকে ভালবাসিয়া যৌবনে অন্যজনকে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু ইন্দুবালাও খাঁটি হিন্দু পরিবারের মেয়ে নয় এবং তাহার বিবাহও হইয়াছে ব্রাহ্ম যুবকের সহিত। 'সতীর পতি'র রেবতীও থিয়েটারের নটী। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া লেখক প্রেমশীলা স্ত্রীর ছবিই যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই চরিত্রটির উপর প্রভাতকুমারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব থাকিলেও থাকিতে পারে। 'সুখের মিলন' উপন্যাসে বেলা জেমস্‌কে ভালবাসিয়াছে এবং হ্যারি বনার্জির সহিত ভালবাসার অভিনয় এবং পরে বিবাহ করিয়াছে। এই বেলাও খ্রীষ্টান রমণী, তাছাড়া বেলা ও জেমস্ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত করুণ মৃত্যু বরণ করিয়াছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে একটা দিক স্পষ্ট যে প্রভাতকুমারের রচনায় এমন কিছু ছিল না যে হিন্দু সমাজপতি শ্রেণীর সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। বরং তাহার উপন্যাসে সতীত্ব, পাতিব্রত্য ইত্যাদির সুর এমন উচ্চসুরে বাঁধা যে রক্ষণশীল সমালোচকদের উল্লসিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে আমরা 'মাসিক বসুমতী'র মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রভাতকুমারের রচনা জাহ্নবীধারার ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্র। সামান্য অশ্লীলতার ইঙ্গিতও তাঁহার বিপুল সাহিত্য সম্পদের মধ্যে নাই। দেবী ভারতীর পূজা প্রাঙ্গণে অমেধ্য ও অস্পৃশ্য বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই, ইহা প্রভাতকুমার জানিতেন, বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন। তিনি দেবীর চরণে শুধু চন্দন সিক্ত সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বপত্রই নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।"৮২ .....

প্রভাতকুমার তাঁহার উপন্যাসে দুইজন খ্রীষ্টান রমণীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন একজন 'সিন্দুর কৌটা'র সুশী, অপরজন 'গরীব স্বামী' উপন্যাসের দেবেন্দ্রর আমেরিকান স্ত্রী। অপরদিকে প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ তাহাদের পিয়ানো পার্টি, বিটোফেন, সোনাটা ইত্যাদি লইয়া এমন এক নয়নাভিরাম ভঙ্গিতে উপস্থিত হইয়াছে যে ইংরাজি শিক্ষিত আধুনিক সমাজও তাঁহাকে সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে নূতন মূল্যবোধ সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে

যে পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল তাহার মৃত্যু প্রকাশ আমরা প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পাই। 'সিন্দুর কৌটা'য় বিজনকুমারীর উক্তি—

"মন কারু অমনি শুধু শুধুই মজে না লো! একটা না একটা কারণ থাকে। ঐ যে ইংরেজি কয়, পিয়ানো বাজিয়ে গান গায়, সঙ্গে বসে টেবিলে খানা খায়, ঐতেই আজকালকার সাহেবী মেজাজের পুরুষেরা ঘাড় মুচড়ে পড়েছেন।"[৮৩]

ইংরেজি বলিতে পারা জুতা মোজা পরা বাঙ্গালী মেয়ে তখন সমাজের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী যুবকদের মনোহরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপন্যাসেও তাহাদের উপস্থিতি শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে তৃপ্তিকর হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের বিশেষ করিয়া 'গরীব স্বামী' এবং 'প্রতিমা' উপন্যাসে এইরূপ ইংরাজি শিক্ষিতা আধুনিকা নায়িকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নায়িকা দুইজনও সমস্ত প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু দ্বিচারিণী তাহারা কিছুতেই হইবে না। প্রভাত-কুমার চিরাচরিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করিয়া আধুনিকতার সহিত তাহার সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের সাধারণ পাঠকবাঞ্ছিত রমণীর পরিণতিও জনপ্রিয়তার একটি কারণ। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসের সুশী বলিয়াছে, "বিয়োগান্ত উপন্যাস আমার দুচক্ষের বিষ! ইচ্ছে করে বইখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিই।"[৮৪] বাস্তবপক্ষে পাঠক-পাঠিকাদের অধিকাংশের মনোভাবও সুশীর মতই। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের উক্তি স্মরণ করি—"গল্প পারৎপক্ষে ট্রাজেডি করিতে নাই।…গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ" তবে আর গল্প কি?"[৮৫] প্রকৃতপক্ষে গল্প উপন্যাস পাঠের প্রধান উদ্দেশ্যই আনন্দ পাওয়া। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন—

"Primarily we read novels for the same reason as we go to the pictures or watch a play, to be entertained."[৮৬]

এই entertain করিবার শক্তি প্রভাতকুমারের উপন্যাসের আছে। প্রভাতকুমার অকাতরে আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া কোন কিছু প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। কোন বিশিষ্ট সাহিত্য চিন্তার গুরু বা কোন নুতন ধারার প্রবর্তক হইবার সাধও বোধ করি তাঁহার ছিল না। আপনার সাধ্যমত তিনি তাঁহার সাহিত্যে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ছিলেন পাঠক সমাজের 'অতিপ্রিয় কথাশিল্পী'।[৮৭]

॥ টীকা ॥

১। সত্য ও বাস্তব : সাহিত্যের স্বরূপ, র, র, ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৫৩৮।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' (১৮৬৫) এই আদর্শে রচিত।

৩। Edwin Muir : The Structure of the Novel, p.23

৪। ঐ, পৃঃ ১৯।

৫। 'চোখের বালি' (১৩০৯) সূচনা, র, র, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২১২।

৬। ঐ

৭। গোপালচন্দ্র রায় (সঙ্কলিত) : শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র পৃঃ ২৯।

৮। 'প্রভাত রবি', দেশ সা, স, ১৩৭৫ পৃঃ ১৬৬-৬৭।

৯। 'তুসিতালা' শব্দটির অর্থ Websters New International Dictionary, (2nd.Ed) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Tusitala (Samaon)—Teller of tales, an epithet applied by his Samaon friends to Robert Louis Stevenson.

১০। ডঃ সুকুমার সেন : বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৩।

১১। Edwin Muir : The Structure of the Novel, P 22.

১২। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত : 'মনীষা মন্দিরে', সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃঃ ৪৮০।

১৩। Beach : The 20th Century Novel, P.126.

১৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", পৃঃ ২১৭।

১৫। প্রমথ চৌধুরী : নীল লোহিত, পৃঃ ৭৩।

১৬। মনের মানুষ।

১৭ক। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : পৃঃ ১২৭।

১৭। "কৃষ্ণকান্তের উইল" : ব, র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪।

১৮। 'বিলাতী রোহিণী' গল্পেও একজন নিশাকরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

১৯। গরীব স্বামী : পৃঃ ৩৫।

২০। ঐ।

২১। ঐ, পৃঃ ৩৬।

২২। ঐ, পৃঃ ৬৫।

২৩। কৃষ্ণকান্তের উইল, ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৭৫।

২৪। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৮৮৯।

২৫। রমাসুন্দরী : প্র, গ্র, (১ম) পৃঃ ৩২১।

২৬। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩২৪।

২৭। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৮২।

২৮। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ১৬৪।

২৯। "শুধু গৃহিণী, সচিব, সখী ও প্রিয় শিষ্যা নয় সেবিকাও অন্তত বাঙ্গালীর ঘরে", "সতীর পতি" —পৃঃ ৩৪৬।

২৯ (ক) "আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্বস্বের অধিকারিণী, আমি শুধু তোমার দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়।" "সীতারাম" ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৮৮৩।

৩০। ইন্দিরা ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩৬৯।

৩১। কৃষ্ণকান্তের উইল : ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫৭২।

৩২। "বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসতী নারী চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য দেখাইতে চাহিয়াছেন।" "কাব্যসুন্দরী পূর্ণচন্দ্র বসু। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র রচিত "বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ", গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬০।

৩৩। বীরেশ্বর পাঁড়ে, "বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ" সমালোচনা সাহিত্য, পৃঃ ২৭১।

৩৪। প্রমথনাথ বিশী : বাংলা সাহিত্যের নরনারী, পৃঃ, ১৩৫।

৩৫। "পয়লা নম্বর" : র, র,।

৩৬। "চোরাই ধন" : র, র,।

৩৭। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ৭০। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'দর্পচূর্ণ' গল্পে স্ত্রী চরিত্রে যুগপৎ দাসীভাব এবং স্বামীর উপর প্রভুত্ব দেখাইয়াছেন।

৩৮। কপালকুণ্ডলা : ব, র, (১ম খণ্ড)।

৩৯। সতীর পতি।

৪০। ঐ।

৪১। রত্নদীপ : প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৪৬৭।

৪২। 'শ্রীকান্ত' : ১ম পর্ব, শ, সা, স, (১ম) পৃঃ ১২৭।

৪৩। 'চোখের বালি' : র, র, (৮ম খণ্ড) পৃঃ ৩৭৩।

৪৪। কমলাকান্তের দপ্তর, ব, র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৬২।

৪৫। চোখের বালি : র, র, (অষ্টম খণ্ড) পৃঃ ২৩২।

৪৬। কৃষ্ণকান্তের উইল : ব, র (১ম খণ্ড)।

৪৭। 'চোখের বালি' : র, র, (অষ্টম খণ্ড) পৃঃ ২৩৯।

৪৮। 'নৌকাডুবি' : র, র, (অষ্টম খণ্ড) পৃঃ ৬৮৩।

৪৯। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের যুগ্মপ্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

৫০। 'চোখের বালি' : র, র, (৮ম খণ্ড) পৃঃ ৩৭৮।

৫১। ঐ, পৃঃ ৩৮৩।

৫২। নৌকাডুবি : ঐ পৃঃ ৬৮৩।

৫৩। সিন্দুর কৌটা : পৃঃ ৪১১।

৫৪। Love has no thought of self,
Love sacrifices all things to bless the thing it loves.

৫৫। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবন্ধ : পৃঃ ৩৮।

৫৬। প্রতিমা : পৃঃ ৯৯।

৫৭। গরীব স্বামী : পৃঃ ২৮০।

৫৮। E. M. FORSTER, Aspects of the Novel, p. 100.

৫৯। বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় "সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার" পৃঃ ৭০।

৬০। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৬০।

৬১। Novelist as a medler : American Review, January 1965.

৬২। নবীন সন্ন্যাসী : প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৯৮।

৬৩। রমাসুন্দরী প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩৮৪।

৬৪। বর্তমান গ্রন্থের ১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬৫। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৯।

৬৫ (ক) "It is impossible for the play to explain the circumstances which have given rise to the present action except as this may be accomplished in the dialogue". "The 20th Century Novel" P. 146

৬৬। সতীর পতি : পৃঃ ২৩৪।
৬৭। নবীন সন্ন্যাসী : প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৩৩৭।
৬৮। Paul Eugle : "Salt Crystals, Spider Webs and Words", American Review, Oct' 64, P. 63
৬৯। প্রভাতকুমারও তাঁহার ছোট গল্পে টেকনিক হিসাবে পত্রের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। ছোট গল্পের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৭০। আধুনিক লেখকগণও তাঁহাদের গল্প উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গত 'বনফুল' রচিত 'কষ্টাস্থ' উপন্যাসটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাত্র ১২৩ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিতে লেখক ন্যূনাধিক ত্রিশটি পত্র ব্যবহার করিয়াছেন।
৭১। প্রমথনাথ বিশী : 'বঙ্কিম সরণী,' ১১২।
৭২। "Freud regarded a dream or a neurosis as motivated by repressed sex desires".
R.S. Wordsworth : "Contemporary Schools of Psychology". P. 184
৭৩। প্রভাতকুমার স্বপ্নের মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন তাহা নহে। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে কৌমার্যব্রতধারী মোহিত স্বপ্নে চিনির সহিত নিজ বিবাহের দৃশ্য দেখিয়া জাগ্রত অবস্থায় চিন্তা করিতেছেন "………এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! এই আমার পরিণাম নাকি? বিবাহ করিয়া, সংসার জালে জড়ীভুত হইয়া, বাসনাতৃপ্তি ও অর্থোপার্জনই জীবনের সারভূত করিব নাকি? স্বপ্নের কথা মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া নিজের প্রতি একটু রাগও হইল। স্বপ্ন দেখা বা না দেখা অবশ্য কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু স্বপ্নে তাহার মন কেন আনন্দ লাভ করিল? আনন্দের ত কথা নহে, বিরক্ত হইবার ঘৃণাবোধ করিবার কথা। মনশক্তি নিদ্রিত ছিল, প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য হৃদয়, সংযম হারাইয়া নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করিয়াছে। এমন ভৃত্য ত ভাল নয়। যতক্ষণ প্রভুর চক্ষের সমুখে রহিল ততক্ষণই সুবোধ শিষ্ট আজ্ঞাবহ। চোখের আড়াল হইলেই যথেচ্ছাচারণ?………"প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৪৮ উদ্ধৃতিটিতে স্বপ্নের মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে।
৭৪। কঙ্কাবতী : 'বিজন বিহারী ভট্টাচার্য' সম্পাদিত পৃঃ ৭৮।
৭৫। কুঞ্জর অদৃশ্য হইয়া সর্বত্র বিচরণের ঘটনাটির সহিত H.G. Wells এর 'Invisible Man'এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।
৭৬। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পঃ ১৬৯।
৭৭। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ২৩৬ হইতে উদ্ধৃত।
৭৮। গৌরহরি সেন, গ্রন্থ সমালোচনা : 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ভাদ্র ১৩৩০।
৭৯। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ খণ্ড) পৃঃ ৪১২।
৮০। সতীর পতি।
৮১। সিন্দূর কৌটা : পৃঃ ২৯০।
৮২। 'মাসিক বসুমতী' : চৈত্র ১৩৩৮, পৃঃ ১০৪৭-৪৮।
৮৩। সিন্দূর কৌটা : পৃঃ ৩৫৯।
৮৪। ঐ, পৃঃ ৩১৫।
৮৫। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ৪২-৪৩।
৮৬। Walter Allen : Reading a Novel, P. 12.
৮৭। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৯।

উপন্যাসের কালক্রমিক আলোচনা

রমাসুন্দরী ঃ—

পিতার অমতে নিজ মনোনীতাকে বিবাহ, ফলে পিতাপুত্রে সাময়িক বিচ্ছেদ পরিশেষে মিলন এই প্লটের উপর ভিত্তি করিয়া 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের কাহিনী গঠিত হইয়াছে।

প্রভাতকুমারের রচনার প্রধান গুণ সুখ-পাঠ্যতা। রচনার সেই গুণ প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'তেও বর্তমান। রমাসুন্দরীর চরিত্রের অনন্যসাধারণতা, নবগোপালের স্বাধীনচিন্ততা, কমলাদেবীর মধুর বাৎসল্য, গদাধরের কূটবুদ্ধি, সীতানাথ ও তস্যমাতার ষড়যন্ত্র, সীতানাথের অন্তঃপুরের উজ্জ্বল ও নিখুঁত চিত্র, কাশ্মীরের বাস্তবোচিত বর্ণনা ইত্যাদি বহু চিত্র ও চরিত্র সমাবেশের ফলে উপন্যাসটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

প্রভাতকুমার নিজের উপন্যাসকে ডিকেনসের (১৮১২-৭০) উপন্যাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১]

ডিকেনসের উপন্যাস চিত্রধর্মী প্রভাতকুমারেরও তাই। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় 'রমাসুন্দরী'তেও চিত্রের অভাব নাই। 'যাত্রার আয়োজন' শীর্ষক অষ্টম পরিচ্ছেদ এবং 'সিদ্ধিদাতা গণেশ', শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একান্নবর্তী বাঙ্গালী পরিবারের সংসার যাত্রার নিখুঁত এবং প্রাণবন্ত বর্ণনা এই দুইটি পরিচ্ছেদে উপলব্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও আমরা দৈনন্দিন সংসারযাত্রার চিত্র পাই, কিন্তু সেখানে সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছবি ফুটিয়া উঠে নাই। বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল রোমান্স রঙ্গীন, সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের তুচ্ছ গৃহস্থালীর প্রতি সেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিও রোমান্টিক কিন্তু তাঁহার রোমান্স বাস্তবতার আমেজসমৃদ্ধ, যাহাকে তৎকালীন আদর্শে Neorealism বলিলে অন্যায় হইবে না।[১ক] 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় কাশ্মীর বর্ণনা। বাঙ্গলা উপন্যাসের নায়ককে কাশ্মীর লইয়া গিয়া প্রভাতকুমার বাঙ্গলা উপন্যাসের পটভূমিকার দিগন্তসীমা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' (১২৮৪) উপন্যাসে অমরনাথ কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু কাশ্মীরের বর্ণনা সেখানে অনুপস্থিত। প্রভাতকুমার স্বয়ং কাশ্মীর যান নাই, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া পুস্তকের সাহায্যে তিনি এই বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।[২]

সাধারণভাবে বলিতে গেলে প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি ঘটনাপ্রধান। কিন্তু 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে লেখক চরিত্রচিত্রণেও যথেষ্ট কুশলতা দেখাইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য চরিত্র রমাসুন্দরীর। লেখক যে স্বয়ং এই চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশেও বাঙ্গালীর সমাজজীবনে এবং সাহিত্যে বাঙ্গালী মেয়েকে কুসুমকোমলা এবং অপরিচিত অথবা অনাত্মীয় পুরুষ সান্নিধ্যে ভীত চকিতা রূপে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে এক একটি এমন মেয়ে দেখা দেয় যাহারা আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নয়। তাহাদের লইয়া পরিবার পরিজনেরা বিব্রত হন, কিন্তু সাহিত্যে এইরূপ অনন্যসাধারণ চরিত্র পাঠককে ব্যতিক্রমের আস্বাদে তৃপ্ত করে সন্দেহ নাই। সমাজ জীবনে এরূপ নারী দুর্লভ বলিয়াই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রকে কাপালিক পালিত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। প্রভাতকুমারের রমাও এই জাতীয় চরিত্র। প্রাক্-বিবাহ জীবনে তাহার প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য, অসামাজিক ও অভব্য, আচরণ এবং বালসুলভ চপলতা তাহার চরিত্রটিকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। আবার বিবাহোত্তর জীবনে এই দুরন্ত বালিকাটিই নিরীহ বাঙ্গালী বধুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। রমাসুন্দরীর চরিত্রের এই দুইটি অংশের মধ্যে সঙ্গতি নাই একথা বলা যায় না। আমরা বাস্তবজীবনেও কুমারী বালিকার বিবাহিতা রমণীতে রূপান্তরের মধ্যে তাঁহাদের চারিত্রিক রূপান্তরও অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি। অবশ্য রমার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের অনন্যসাধারণ চিত্রটিই পাঠকমনকে অধিকতর আকৃষ্ট করে সন্দেহ নাই। এই কারণেই বাঙ্গলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক প্রমথনাথ বিশী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"অরণ্যচারিণী রমার চিত্রাঙ্কনে লেখক যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, গৃহিণী রমার চরিত্রে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই।"[৩]

সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। কিন্তু রমা চরিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে রূপান্তরের বীজ যেন চরিত্রটির মধ্যেই নিহিত ছিল। লেখক রমার জীবনের রূপান্তরটি স্তর পরম্পরায় দেখান নাই বলিয়া তাহার চরিত্রের পরিবর্তনটি আমাদের নিকট আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত বলিয়া বোধ হয়। রমার চরিত্রে কিছু পুরুষালীভাব ছিল এবং নারীসুলভ লজ্জা সঙ্কোচের অভাবও ছিল, কিন্তু নারীসুলভ কোমলতার অভাব ছিল না। দুই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা আমাদের মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

"একদিন একটি পাখী মারিল। পাখী যখন কাতর কুজন করিয়া, ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বিলুণ্ঠিত হইল, তখন রমা তীর ধনুক ফেলিয়া আসিয়া আহত পাখীকে কোলে তুলিয়া তাহার গায়ে জল সিঞ্চন করিয়া নিজে অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পাখী বাঁচিল না। সেই পর্যন্ত তীর ধনুক উঠাইয়া রাখিয়াছে, আর স্পর্শ করে না।'

হৃদয়ের এই কোমলতা নিঃসন্দেহে নারীসুলভ। উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে খরগোস শিকার প্রসঙ্গে রমা নবকুমারকে বলিয়াছে, "যে সময় ওরা খায়, সেই সময় তুমি মার ? তুমি ভারি নিষ্ঠুর ত।"[৫] রমার এই উক্তির পর লেখক নবকুমার সম্পর্কে বলিয়াছেন—"স্ত্রী জাতি সুলভ কোমল মন্তব্য তাহার শিকার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।"[৬] অতএব রমার চরিত্রের মধ্যে স্নেহশীলা প্রেমময়ী নারীর যে বীজ ছিল বিবাহের পরে তাহাই বিকশিত হইয়াছে মাত্র। ইহাকে আমরা আকস্মিক রূপান্তর অথবা নবজন্ম বলিতে পারি না। অবশ্য একথা সত্য যে লেখক রমার বধূরূপটি খুব উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত করিতে পারেন নাই।

রমার অরণ্যস্বভাব চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আরণ্যক কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত বিবাহের পর জনপদে আসিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। ফলে লেখক তাহাকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া কাহিনীর ট্রাজিক উপসংহার করিয়াছেন। রমাসুন্দরী নবগোপালের সহিত মানাইয়া লইতে পারিয়াছে, ফলে কাহিনীটির সুখান্তক পরিণতি হইয়াছে। কোন্ পরিণতি অধিকতর স্বাভাবিক সে বিচারে না গিয়া আমরা এইটুকুই বলিতে পারি যে উভয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই কাহিনীর পরিণতিকে ভিন্নতর করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' (১৩০০) গল্পের মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ে। রমাসুন্দরীর চরিত্র পরিকল্পনায় মৃন্ময়ী চরিত্রটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। মৃন্ময়ীও বন্যস্বভাবের বালিকা ছিল। এই 'অস্থিদাহকারী মেয়ে দস্যুকে' পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে অপূর্বর মাতার ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র পুত্রের জিদের কাছে পরাজিত হইয়া তিনি বিবাহে মত দিতে বাধ্য হন। বন্য মৃগের মত মেয়েকে ধরিয়া বাঁধিয়া বিবাহ দেওয়া হইল বটে কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার বন্যস্বভাব ঘুচিল না। তাহার দেহমন বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া রহিল। কিন্তু রমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া বিবাহ দিতে হয় নাই। প্রথম সাক্ষাতেই 'বন্দুকবান পুরুষ' নবগোপালের প্রতি রমার ভারী ভক্তি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাঙ্গলা উপন্যাসে বোধকরি রমাই প্রথম নারী যে বন্দুক হাতে লইয়াছে। নবগোপালের সহিত বিবাহে রমা খুশীই হইয়াছে। বিবাহের পর রমা প্রেমময়ী পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন লেখক স্তর পরম্পরায় দেখান নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতে অনুমান করিয়া লইতে বাধা নাই যে স্বামীর ভালবাসাই রমাকে রূপান্তরিত করিয়াছে। প্রেমের স্পর্শে বালক স্বভাব বালিকার নারীত্বে উত্তরণ ঘটিয়াছে।

কাহিনীর নায়ক নবগোপাল বিংশতি বর্ষীয় যুবক। সে কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিয়াছে। "সে ইংরেজি কয় একেবারে ইংরেজের মত।" সংস্কৃতেও তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। শিকারে গিয়া সে অনায়াসে বন্য বরাহ শিকার করে।

এইরূপ বিভিন্ন গুণে ভূষিত করিয়া লেখক নবগোপালকে সার্থক নায়করূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার চরিত্রগুলির প্রাণস্পন্দন নিতান্ত ক্ষীণ। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রগৌরব, বাহ্যঘটনা নিয়ন্ত্রণের শক্তি, তাহাদের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাহারা প্রায়ই ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনুকূল দৈববলেই সৌভাগ্যের তীরে ভিড়িয়া থাকে।"[৭]

সমালোচকের এই মন্তব্য প্রভাতকুমারের সকল চরিত্র সম্পর্কে খাটে না—অন্তত নবগোপাল সম্পর্কে এই মন্তব্য একেবারেই প্রযোজ্য নয়। নবগোপালের মধ্যে আমরা এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠচিত্র নির্ভীক মানুষের সাক্ষাৎ পাই। নবগোপাল ঘটনাপ্রবাহে গা ভাসায় নাই, বরং চরিত্রবলে স্বয়ং ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আলোচনার দ্বারা আমরা আমাদের মতটিকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কমলাদেবী একমাত্র পুত্র নবগোপালের আবদার বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। অত্যধিক আদর এবং প্রশ্রয় পাইয়া সে একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিপথগামী হয় নাই। পিতার সহিত নবগোপালের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। নবগোপাল স্বেচ্ছাবিহারী, তাহার আসা যাওয়ার খবর শুধু মায়ের কাছে, যত পরামর্শ সব মায়ের সঙ্গে। একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব অপর ব্যক্তিত্বকে সহ্য করিতে পারে না, পিতার সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিবার ইহাই কারণ। কান্তিচন্দ্রের জিদ তাহার পুত্রেও বর্তাইয়াছিল। "কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কিম্বা অন্তত লজ্জা বা অনুতাপের ভাব প্রকাশ করাও নবগোপালের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।"[৮]

রমাসুন্দরীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন দুই পরে নবগোপাল পুনরায় মহেশপুরে গিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রমাকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে শিকার করিতে গেলে তাহার এই অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের জন্য রমার পিতা তাহাকে ভৎ´সনা করেন। নবগোপাল কাহারও ভৎ´সনা শুনিতে অভ্যস্ত নয়। তাই গদাধরের কণ্ঠে অভিযোগের সুর শুনিয়া সেও উদ্ধত-ভাব ধারণ করিল। কিন্তু নবগোপাল একেবারে অবিবেচক নয়। গদাধর যতক্ষণ গরম হইয়া কথা কহিয়াছিলেন নবগোপালও ততক্ষণ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিল; গদাধর সুর নরম করিলে নবগোপালও তৎক্ষণাৎ ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া রমাকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। নবযুবক নবগোপাল স্বয়ং নিজ বিবাহের প্রস্তাব করিতে কিছু মাত্র আড়ষ্ট হয় নাই বা সংকোচ বোধ করে নাই। ইহা তাহার চরিত্রের নিঃসংকোচ ঋজুতার পরিচায়ক। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আরও একটি ঘটনায় পরিস্ফুটিত হইয়াছে। নবগোপালের পিতা কান্তিচন্দ্র, নবগোপাল রমাকে মনোনীত করিয়াছে শুনিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে

বলিলেন, 'একজন গোমস্তার মেয়েকে এ বাড়ীতে বড় জোর আমি পাচিকা স্বরূপে প্রবেশ করিতে দিতে পারি, বধূ বলে গ্রহণ করতে পারি, এ আশা তুমি কর ?'

নবগোপাল বলিল, 'না, করি না।'

'তবে কি আমার বিনা অনুমতিতে তুমি বিবাহ করতে প্রস্তুত ?'

নবগোপাল গর্বিত ভাবে উত্তর করিল, 'আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।'

নবগোপাল সত্যই বলিয়াছিল, 'ভয় আমি কোন জিনিষকে করিনে, এমন কি পিতার ক্রোধকেও না।'[৯]

রাশভারী জমিদার পিতার মুখের উপর স্পষ্ট ভাষণ নিঃসন্দেহে নবগোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পরিচায়ক।

নবগোপালের চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত সত্যপ্রিয়তার মিলন ঘটাইয়া লেখক চরিত্রটিকে আরও বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। পিতার আপত্তি সত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু পিতার অজ্ঞাতে গোপনে বিবাহ করিতে সে প্রস্তুত নয়। গদাধর বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এ সংবাদ গোপন রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু নবগোপাল তাহাতে সম্মত হয় নাই।

নবগোপালের চরিত্রটি বিবাহের পুর্ব পর্যন্ত বেশ সক্রিয়, কিন্তু পরে নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সমগ্র উপন্যাসটিই নবগোপালের বিবাহের পর গতিবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস খুব সুগঠিত নয়। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসেও মূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কবিহীন কতকগুলি ঘটনা রহিয়াছে। 'ষড়যন্ত্র' শীর্ষক সপ্তম পরিচ্ছেদ এবং 'লাঠৌষধি' শীর্ষক দশম পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের মুল কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। সপ্তম পরিচ্ছেদে সীতানাথ জননী তাঁহার নাতিনীর সহিত নবগোপালের বিবাহ ঘটাইবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, মুল কাহিনীর সহিত তাহার যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ এবং এই অংশটি অনাবশ্যকভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই ষড়যন্ত্র নবগোপাল ও রমার মিলনের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, এমন কি কান্তিচন্দ্রের মনেও এই ষড়যন্ত্র কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই ষড়যন্ত্রটি সঠিক ভাবে পরিচালিত হইলে উপন্যাসে যে প্রত্যাশিত জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারিত লেখক তাহার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। সীতানাথ এবং তাঁহার মাতা তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাস হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন। কিন্তু এই চরিত্র দুইটি যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের আরও কার্যকলাপ দেখিবার জন্য পাঠক যথেষ্ট উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু চরিত্রদ্বয় পাঠককে কিঞ্চিৎ হাসি উপহার দিয়া বিদায় লইয়াছে।

'লাঠৌষধি' পরিচ্ছেদটিতে লেখকের স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করি—

"লাঠৌষধি নামক দশম পরিচ্ছেদে পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বাঙ্গালী এখন লাঠৌষধির মহিমা বুঝিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।"[১০]

এই পরিচ্ছেদটিতে লেখকের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনীর পক্ষে এই পরিচ্ছেদটি অবান্তর বলিয়াই মনে হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র উপন্যাসের নায়িকা রমাসুন্দরী। প্রভাতকুমারের পূর্বে নায়িকার নামে উপন্যাসের নামকরণ অনেকেই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এইরূপ নামকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। প্রভাতকুমার এই বিষয়ে বঙ্কিমকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চতুর্দশটি উপন্যাসের মধ্যে নায়িকার নামে পাঁচটি উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছেন, প্রভাতকুমারও তাহাই করিয়াছেন।[১১]

'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের নামকরণ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

॥ টীকা ॥

১। দ্রঃ 'মনীষা মন্দিরে'—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—সঙ্কল্প অগ্রহায়ণ ১৩২১।

১ক। তবে যে অর্থে আধুনিক উপন্যাসের তথাকথিত বাস্তবতাকে Neo-realism বলা হয় সে যুগের Neo-realism তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

২। ......গাড়ী আসিতে তখন অর্দ্ধঘণ্টা বাকী, প্রভাতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'এলাহাবাদে আপনি কতদিন থাকিবেন?'

রবিবাবু বলিলেন—'চারি পাঁচদিন থাকিব। তাহার পর কাশ্মীর গিয়া মাসখানেক থাকিবার ইচ্ছা আছে।'

প্রভাতবাবু বলিলেন—'কাশ্মীর যাইবেন? তাহা পূর্বে আমায় বলেন নাই। যদি যান, তবে একখানা house boat লইবেন। বাস ও ভ্রমণ দুই তাহাতে হইতে পারিবে।'

রবিবাবু বলিলেন—'কাশ্মীরের দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি শুনি। তুমি ত গিয়াছিলে।'

প্রভাতবাবু বলিলেন—'না; আমি কখনও যাই নাই।'

একথা শুনিয়া রবিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'যাও নাই! তবে রমাসুন্দরীতে ও সব বর্ণনা লিখিলে কেমন করিয়া?'

প্রভাতবাবু হাসিয়া বলিলেন—'ও সমস্ত বিবরণ ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া আমি লিখিয়াছিলাম।'

(সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 'রবীন্দ্র সঙ্গমে': মানসী মাঘ ১৩২১)

৩। 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', পৃঃ ১৩৫।

৪। 'রমাসুন্দরী, প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৫৪।

৫। ঐ, পৃঃ, ২৯৭।

৬। ঐ।

৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ২১৩।

৮। 'রমাসুন্দরী', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩১২।

৯। ঐ, পৃঃ ৩১৪।

১০। দ্রঃ ভূমিকা—'রমাসুন্দরী' (১ম সং)।

১১। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'রাধারাণী' (১৮৯৩) এবং 'রজনী' (১৮৭৭)। প্রভাতকুমারের 'রমাসুন্দরী', 'আরতি', 'সত্যবালা', 'প্রতিমা' এবং 'নবদুর্গা'।

নবীন সন্ন্যাসী ঃ—

ধর্মানুরাগী, আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত একজন নবযুবকের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার অসারতা এবং ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করিয়া 'নবীন সন্ন্যাসী'র মূল কাহিনীটি গঠিত। কুচক্রী গদাই পালের উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর সহিত জড়িত রহিয়াছে।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্প উপন্যাসের ন্যায় এই উপন্যাসটিতেও গৃহাশ্রম এবং দাম্পত্য জীবনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বোধের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক মোহিতলালের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাঙ্গলাদেশের যুব মানসে যে কালাপাহাড়ী মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আসিয়া তাহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্রতন্ত্র, জপতপ ইত্যাদি তথাকথিত কুসংস্কারকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিবার অপর পিঠে তখন আসিয়াছিল হিন্দু সমাজের সমস্ত কিছুকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া সমর্থন করিবার পালা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষিত যুবক সাধারণের মধ্যে সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু মনে প্রাণে এই আদর্শ অনুসরণের একাগ্রতা তাহাদের অনেকের মধ্যেই ছিল না। রামকৃষ্ণ শিষ্যদের সংসারত্যাগ ও সাধন ভজন করাটাই শুধু তাহাদের নজরে পড়িয়াছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের কর্মযোগের আদর্শটি তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে মোহিত ও তাহার বন্ধু প্রমথর কথাবার্তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"তুমি যে বল্লে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসার বন্ধনে থেকে হবার যো নেই সন্ন্যাসী হতে হবে সেটা কিন্তু তোমার মহাভুল। মানুষ এই গৃহাশ্রমে থেকেই ধর্ম চর্চা করতে পারে, ভজন সাধন করতে পারে নিজের মুক্তির উপায় করে নিতে পারে। তার জন্যে মানুষের বনে যাবার আবশ্যক হয় না। কি বলেন পণ্ডিতজী? পণ্ডিতজী বলিলেন, 'ঠিক বাত বাবুজী। খুব ঠিক। দেখিয়ে জনকজী কেত্তা ভারি মাহাৎমা থেঁ রাজর্ষি থেঁ গৃহী ভি থেঁ।' মোহিত বলিলেন, 'গৃহে থেকেও ধর্মাচরণ করা যায় তা মেনে নিলাম। কিন্তু ধার্মিক গৃহী ব্যক্তি যে গতিলাভ করে, সংসারত্যাগী

তপস্বী কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গতিলাভ করে না ? শাস্ত্রে দেখা যায়, তপস্যাপরায়ণ মুনিঋষিরা সংসারের কোলাহল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করতেন'।"[১]

মোহিত সন্ন্যাসের সমর্থনে প্রমথর সহিত দীর্ঘ বাদানুবাদ করিয়াছে কিন্তু পরে সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরে মোহিতের এই উপলব্ধি হইয়াছে যে কর্মযোগ বিরহিত হইয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাসকে আশ্রয় করে সে এখানে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মননশীল হইয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই মনুষ্যের অচিরে ব্রহ্মলাভ হয়।

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে প্রভাতকুমার কোন দিনই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রানুসারী। ভোগবিমুখ বৈরাগ্য তাঁহাদের কাছে শুধু ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয় নাই, হাস্যকর বলিয়াও বোধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনে রত। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে চিরকুমার থাকিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হইবার জন্য একটি প্রেরণা আসিয়াছিল। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মনের মধ্যে তরুণ বাংলার এই নূতন সাধনার রূপ জাগিতেছিল। তাঁহার মতের বিরোধী এই চিরকৌমার্যকে তিনি প্রহসনের বিদ্রূপ বাণে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"[২]

প্রভাতকুমারও মোহিতের চির কৌমার্যের প্রতিজ্ঞাকে কটাক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে যে চিরকুমার থাকিয়া সংসার বিরাগী হইতে হইবে একথা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রভাতকুমারও বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমারের গল্পে এবং উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের যে সার্থক এবং মধুর চিত্র পাওয়া যায়, সার্থক সন্ন্যাস জীবনের সেরূপ কোন চিত্র কোথাও পাওয়া যায় না।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' পাঠে মগ্ন মোহিতের যে চিত্রটি লেখক আঁকিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া মোহিতের চরিত্রের একটি দিক বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'……মোহিত যেখানে বসিয়াছিল তাহার অনতিদূরেই দীঘিকাজলে পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, হাঁস সাঁতার দিতেছে, মাঝে মাঝে মাছরাঙ্গা পাখী আসিয়া ছোঁ মারিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে কিন্তু এ সকলের প্রতি মোহিতের দৃকপাত নাই। সে আপনার অধ্যয়নেই নিমগ্ন।"[৩]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া মোহিত নিজেকে শাস্ত্র পাঠে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি শাণিত শলাকার মত, শাস্ত্রপাঠ তাহাকে কঠোর কঠিন এবং সকল প্রকার কোমলতাশূন্য করিয়াছে। তাহার জীবনের এই নীরসতা ও শুষ্কতার পরিচয় বালক ভ্রাতা বিনোদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কিরণের প্রতি কঠোর ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছে। মোহিতের এইরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়া তাহার চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে মোহিতের নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থলভ্য ব্যবহারিক জীবনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিক প্রেম প্রীতির বন্ধন তাহা মোহিতের নিকট অজ্ঞানতাজাত মোহ মাত্র। তাই সাগরদীঘিতে প্রমথর পিতা গুরুদাসবাবুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনভোজনের আয়োজন হইলে মোহিতেব তাহা ভাল লাগে নাই। "সে ভাবিল এ মানবজীবন তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে কাটান কি মানবজীবনের অপব্যবহার করা নয়।"৪

জীবনকে ঘিরিয়া কোন আনন্দানুষ্ঠানই মোহিতের যেন মনঃপুত নয়।

লেখক প্রমথ এবং তাহার স্ত্রী সুশীলাকে মোহিতের চিন্তাধারার বিপরীত মুখে স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরভক্তির পক্ষে বিবাহ বাধা কিনা আলোচনা প্রসঙ্গে সুশীলার উক্তি—

"তবে দেখ, তুমি যদি বিবাহ না কর স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্র কন্যার স্নেহ, তোমার জন্য এই সকল সুন্দর উপহারগুলি হাতে করে এসে তিনি দাঁড়ালেন আর তুমি যদি তা গ্রহণ না করে, বিমুখ হয়ে বনে চলে যেতে চাও, আর সেখানে বসে তাঁকে ভক্তি কর তাহলে বই না পড়ে সমালোচনা, রান্না না চেখে রাঁধুনির প্রশংসা করা হল না কি ?"৫

সংসারবিমুখ মোহিতেরও সন্ন্যাস জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর এই সত্যই উপলব্ধি হইয়াছিল।

"এক সময়ে মনে করিত বটে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে সাধন ভজনের বিঘ্ন হয়, আত্মচিন্তার অখণ্ড অবসর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় সে যেন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা ভ্রম। সংসারে থাকিয়া সে যে পরিমাণে সাধন-ভজন ও শাস্ত্র চর্চা করিতে সক্ষম হইত, গৃহত্যাগী হইয়া অবধি তাহার শতাংশও সে করিতে পারে নাই। গৃহত্যাগ করিয়া অবধি অন্নচিন্তা ও আশ্রয়চিন্তাই তাহার মনে একাধিপত্য করিয়াছে।"৬

অবশ্য যৌবন ধর্মকে মোহিত সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই। চিনির সহজ সপ্রতিভ ব্যবহার মোহিতকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মোহিত স্বপ্ন দেখিল যে সে বরবেশে চিনিকে বিবাহ করিতেছে। কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া মোহিত নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "হৃদয়ের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিল।"৭ কিন্তু

চোখ রাঙ্গানী সত্ত্বেও চিনির জ্বরের কথা শুনিয়া এবং সান্ধ্য চায়ের আসরে চিনিকে অনুপস্থিত দেখিয়া সেদিনকার সন্ধ্যা মোহিতের নিকটে আনন্দহীন হইয়া উঠিল। "যেন গাছ আছে ফুল নাই, আকাশ আছে জ্যোৎস্না নাই।"[৮]

মোহিতের জীবনে ইহাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। মোহিত এতদিন প্রাণপণে প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিল। আজ এক মুহূর্তে প্রেম আসিয়া মোহিতের হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইল।

"চিনি—চিনি—চিনি—তাহার মন কেন সারাদিন চিনি চিনি করিতেছে? কি আছে সে বালিকার? যাহাতে এত আকর্ষণ? কি জানে সে? দর্শন জানে না, বিজ্ঞান জানে না, শাস্ত্রচর্চা করে নাই, গীতা উপনিষদ তাহার অনধীত। মুর্খ বিচারশক্তিবিহীন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা।"[৯] মোহিত দৃঢ় হইয়া চিনিকে মন হইতে নির্বাসিত করিতে চেষ্টা করিল। "সে যে মোহিত! সংসারসুখ মায়াবিনী মোহিনী মুর্তি ধরিয়া তাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল? মানুষ চেনে না?"[১০]

কিন্তু চিনি প্রবলভাবে জরাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়াই মোহিতের মন পুনরায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নিকট চিনির রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইল। এতদিন মোহিত বহু গ্রন্থপাঠ করিয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তি এমন করিয়া কোনওদিন তাহার কাছে ধরা দেয় নাই। চিনির প্রতি ভালোবাসাই মোহিতের হৃদয়ে গভীর ভক্তির বীজ বপন করিয়া দিল। চিনি সুস্থ হইল, কিন্তু মোহিতের শিক্ষা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সে বুঝিয়াছে যে সংসারে থাকিলে মায়ার বন্ধন এড়াইতে পারিবে না, সুতরাং মোহিত এইবার পুর্ণভাবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইল। চিনিদের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে কিন্তু মোহিত চিনির হাতের এক কাপ চা খাইতে স্বীকৃত হইল। সে ভাবিল "আজই তো শেষ দিন। সব রকম অসংযম, আত্মপরায়ণতার আজ শেষ।"[১১]

যে মোহিত চপলতার জন্য বালিকা ভ্রাতুস্পুত্রীকে কঠোর ভৎসনা করিয়াছিল সেই মোহিত যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা বোঝা যায়। তাহার পর মোহিত চিনির মাকে মা সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় চাহিল। ইতিপুর্বে মোহিত আর কখনও অন্যের মাকে মা বলে নাই। পর পর এই দুই ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় শুষ্ক কঠোর সন্ন্যাসীর হৃদয় প্রেমের স্পর্শে অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রব হইয়াছে। ইহার পর মোহিতের সন্ন্যাস জীবন সুরু হইয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে যেটুকু মোহ মোহিতের ছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী অভিজ্ঞতায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরু খুঁজিতে গিয়া ক্ষেমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল মোহিতের। এই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসজীবন

সম্পর্কে মোহিতকে যে জ্ঞানদান করিয়াছে তাহাতেই মোহিতের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে।

এদিক ওদিক চাহিয়া স্বর নামাইয়া মোহিতের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "বলি কোন্ ধারা ?"

মোহিত বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন ?" সন্ন্যাসী রাগিয়া বলিল, "ন্যাকামি কর কেন ? যেন কিছুই জানেন না—নিরীহ ভাল মানুষটি। বলি, খুনী মোকদ্দমা না ডাকাতি মোকদ্দমা, না জালের মোকদ্দমা কিসে পড়েছিলে ?"

মোহিত গম্ভীরভাবে বলিল, "কোন মোকদ্দমায় পড়িনি।" সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া বলিল, "ইল্‌লো ! দাঁত দেখি তোর বয়স কত ? শুধু শুধু পালিয়েছ ! তুমি তেমনি ইয়ার কিনা !" বলিয়া সন্ন্যাসী গাঁজার ছিলিমে অগ্নি সংযোগ করিল।[১৩]

একদিকে সাধু সন্ন্যাসীদের ভাব গতিক দেখিয়া অপরদিকে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিয়া মোহিতের মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মনের এইরূপ অবস্থায় এক পত্নী বিয়োগকাতর যুবকের সহিত তাহার দেখা হইল। মৃতা পত্নীর কল্যাণের জন্য যুবককে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া মোহিতের মনে পড়িল একবার চিনির জন্য সেও একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকিয়াছিল। সেদিন তাহার হৃদয়ে ভক্তিস্রোত সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল। চিনির প্রতি তাহার ভালবাসা তাহাকে ঈশ্বরের সম্মুখীন করিয়া দিয়াছিল। আবার এই পত্নী প্রেমিক ভূতপূর্ব নাস্তিক যুবকটিও ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছে স্ত্রীকে ভালবাসার মধ্য দিয়া।

"সে ভদ্রলোকটি যদি তাঁহার পত্নীর প্রতি প্রণয়ানুভব না করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি অমন একান্ত মনে ভগবানকে ডাকিতে পারিতেন ? তিনি ত নাস্তিকই ছিলেন প্রেম তাঁহাকে আস্তিকতায় ভগবদভক্তির উচ্চলোকে উত্থিত করিয়া দিয়াছে।"[১৪]

ঈশ্বরকে খুঁজিতে গিয়া মোহিত ঈশ্বরকেই হারাইয়া ফেলিতেছিল। যেখানে প্রেম, যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ, শুষ্কজ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় না। তিনি আনন্দময়, আনন্দস্বরূপ। নিরানন্দময় সন্ন্যাস জীবনে আনন্দময় ঈশ্বর কোথায় ? মনে পড়িল স্বপ্নে চিনি তাহাকে 'এস' বলিয়া ডাকিতেছিল। বুঝি চিনি তাহাকে তাহার ভ্রান্ত পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতেছিল, তাহাকে ঈশ্বরের কোলে, এই আনন্দধারা প্রবাহিত জগতের মাঝখানে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছিল। মোহিতের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইল। একবার যে দ্বিধা উপস্থিত না হইল তাহা নহে। একবার ভাবিল প্রিয় পরিজনের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকিলেও সেই প্রার্থনা ত সকাম প্রার্থনা। ঈশ্বরের প্রতি স্বার্থলেশহীন ভালবাসা বা

অহৈতুকী ভক্তির প্রকাশ তো তাহার মধ্যে নাই। ইহাত শ্রেষ্ঠতম উপাসনা হইতে পারে না।

"কিন্তু তখনই আবার ভাবিল, শুষ্ক নিরুপাসনার চেয়ে সকাম উপাসনা ত ভাল, পঙ্কিল জলযুক্ত নদী যে প্রদেশে রহিয়াছে সে প্রদেশ মরুভূমির চেয়ে ত ভাল।"[১৫]

মোহিতের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় মোহিতের পরিবর্তন হইয়াছে প্রধানত তিনজনের প্রভাবে। চিনির প্রতি আকর্ষণ তাহাকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভণ্ডামী ও প্রতারকসুলভ আচরণ তাহার অন্তরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সন্ন্যাসজীবনের যে সমুন্নত আদর্শ সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বাস্তব সন্ন্যাস জীবন তাহার সেই বিশ্বাসের মুলে কুঠারাঘাত করিল। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘাতে তাহার হৃদয়ে যে আত্মচিন্তার উদয় হইল, পত্নীপ্রেমিক বিপত্নীকের সহিত আলোচনার ফলে সেই চিন্তাধারা তাহাকে সংসারে ফিরিবার পথটি দেখাইয়া দিল। সংসারে যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া ত্যাগ করি, বস্তুত তাহারও মধ্যে বৃহতের স্পর্শ রহিয়াছে। সেটি উপলব্ধি করিবার মত অন্তর চাই। মুক্তি বাহিরে পাওয়া যায় না, অন্তরেই বন্ধন, অন্তরেই মুক্তি। মোহিতের এই উপলব্ধিটি বড় সুন্দর—

"খৃষ্টানদের প্রার্থনায় আছে, **Give us this day our daily bread**—প্রভু অদ্য আমাদের দৈনিক আহার দিও। পুর্বে বলিতাম, খৃষ্টানদের এ প্রার্থনাটুকু বড় আধিভৌতিক রকমের ; প্রভু আমায় ভক্তি দিও, মুক্তি—দিও না বলিয়া, প্রভু আমায় অন্ন দিও! কিন্তু অন্ন যে ঈশ্বরের কত বড় দান তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অন্ন বিনা উপায় নাই। অন্নই জীবের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রার্থনীয়।"[১৬]

গৃহে থাকিয়া মোহিত ঈশ্বর চিন্তার জন্য যেটুকু সময় পাইত পথে নামিয়া অন্ন চিন্তার জন্য সেটুকুও পাইত না।

উপন্যাসটির নাম 'নবীন সন্ন্যাসী'। বলা বাহুল্য মোহিতই এই নবীন সন্ন্যাসী অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক। কাহিনীর আরম্ভ এবং সমাপ্তি মোহিতের কাহিনী দিয়া হইলেও উপন্যাসের মধ্য ভাগে মোহিতকে পিছনে ঠেলিয়া গদাই পালই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ মোহিত চরিত্রে নায়কোচিত দৃঢ়তার অভাব। কাহিনীর নায়ক হিসাবে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া মোহিত নিজেই ঘটনা স্রোতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাহার আত্মসংযম প্রচেষ্টার মধ্যে কিছুটা ছেলেমানুষি ভাব রহিয়াছে। মোহিত যে সংসার ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল তাহার মুলে যতটা না ঈশ্বরানুরক্তি তাহার অপেক্ষা বেশী পলায়নী মনোবৃত্তি। মোহিত সৎ কিন্তু দীপ্তিহীন পৌরুষহীন নিছক সাধুতা সংসারে নিজেরও হিত করিতে পারে না, অন্যেরও উপকারে আসে না। এই প্রকার দুর্বল চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতে পারে না। মোহিতের চরিত্রে কোন action নাই। বাহিরের বিভিন্ন ঘটনা তাহাকে স্রোতের কুটার ন্যায় বহিয়া লইয়া গিয়াছে। একটি আদর্শ, তাহা ভ্রান্ত হউক বা অভ্রান্ত হউক তাহাকে মনে প্রাণে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত মানস শক্তি বা বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝিবার মত দৃঢ়তা তাহার চরিত্রে নাই। মোহিতের মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রও উপন্যাসটিতে ফুটিয়া উঠে নাই। মোহিত ও চিনির প্রেমের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এক তরফা হইয়া গিয়াছে। "Many Happy Returns of the Day" কথাটির ভাবানুবাদ করিবার ফাঁকে কিম্বা চা খাইবার অনুনয় ও স্বীকৃতির মধ্য দিয়া চিনি এবং মোহিত কিছুটা কাছাকাছি আসিয়াছে একথা অনুমান করা যাইতে পারে, তবে লেখক চিনির মনের গতির কোন সন্ধান তাঁহার পাঠক-পাঠিকাকে দেন নাই। ফলে এক তরফা প্রেমকাহিনী তাহার ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে নায়িকা চরিত্র নাই, চিনি নায়িকা হইতে পারে না। চিনি তাহার পিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে হৈ চৈ করিয়াছে, মোহিতকে জোর করিয়া চা খাওয়াইয়াছে, সর্বশেষে রোগাক্রান্ত হইয়া মোহিতের মনে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনের কোন ঘটনার সহিত মোহিতের কোন যোগ নাই। মোহিতের মনে সে নিজ অজ্ঞাতসারে পরিবর্তন আনিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের মনে মোহিত বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলিতে পারে নাই। প্রধান চরিত্র দুইটির এই প্রকার নিষ্ক্রিয়তা উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।

মোহিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীকান্ত মোহিতের বিপরীত চরিত্রের মানুষ। প্রাচীন জমিদারসুলভ কয়েকটি কু অভ্যাস তাঁহার ছিল। নৈতিক চরিত্রও তাঁহার সুবিধার ছিল না। তিনি মদ খান, গাঁজা খান, বাগান বাড়ীতে যান, অল্প বয়সী সুন্দরী বিধবাকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখেন, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী সুলোচনা সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যেও স্বামীকে সন্দেহ করিবার অবকাশ পায় নাই। গোপীকান্তর আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি একজন জমিদার। নবনিযুক্ত কর্মচারী গদাই পালের নির্দেশমত তিনি যে ভাবে ভীতত্রস্ত চিত্তে জমিদারী ছাড়িয়া পুলিশের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, ষ্টীমারে জনৈক ভণ্ড সাধুর সঙ্গে বসিয়া তিনি যেভাবে গাঁজা খাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন জমিদার ভাবিতে রীতিমত কষ্ট হয়। গঙ্গামণি সংক্রান্ত ব্যাপারে বুঝা যায় তিনি স্খলিত চরিত্রের মানুষ। অথচ গঙ্গামণিকে দীর্ঘকাল বাগানবাড়ীতে আটকাইয়া রাখিলেও একবারও তাহার সম্মুখীন হন নাই, হাতে পাইয়াও তাহার ধর্ম নষ্ট করেন নাই। মোটকথা লেখক জমিদাররূপে অথবা লম্পটচরিত্র রূপে গোপীকান্তকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে উচ্চ নীতিবোধ এবং

ব্যভিচারের চিত্রাঙ্কনে স্বাভাবিক সঙ্কোচ দুইয়ে মিলিয়া এই চরিত্রটির সার্থক রূপায়ণে লেখককে বাধা দিয়াছে। সুলোচনার পাতিব্রত্য অপমানিত হইবে এই আশঙ্কাতেই তিনি যেন গোপীকান্তর চরিত্র রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের 'সতীর পতি' উপন্যাসের হীরালাল এবং 'প্রতিমা' উপন্যাসের 'খগেন্দ্র'র কথা মনে পড়ে। এই সকল ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রতা বর্ণনার সুযোগ লেখক গ্রহণ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রষ্ট চরিত্র গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরকে ইহজীবনে মিলিত হইতে দেন নাই। ফলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১২৮২) উপন্যাসের পরিণতি বিয়োগান্তক। প্রভাতকুমার পারতপক্ষে কাহাকেও অসুখী রাখিতে চাহেন নাই। তাই ভ্রষ্টাচার হইতে গোপীকান্তকে রক্ষা করিয়া লেখক তাহাকে তাহার পতিব্রতা পত্নীর হাতে তুলিয়া দিয়া সর্বরক্ষা করিয়াছেন।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে গদাই পালের চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। এই চরিত্রটি তাহার কার্যকলাপের দ্বারা সম্পূর্ণ উপন্যাসটিকে পাঠকের নিকট চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এই কারণেই আজ পর্যন্ত সকল সমালোচকই গদাইকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। 'প্রবাসী' বলেন—

"গদাই পালের চরিত্রচিত্রণ অসাধারণ নৈপুণ্যে জীবন্ত করিয়া তোলা হইয়াছে—ইহাই এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এবং সমগ্রের সকল ত্রুটি অংশের সফলতায় ঢাকা পড়িয়া যায়—ইহা লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক।"[১৭]

ডঃ সুকুমার সেন গদাইকে "আবহমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পাষণ্ডদলের পংক্তিতে ভাঁড়ু দত্ত ও ঠকচাচার পরের আসনেই অধিষ্ঠিত" করাইয়াছেন।[১৮]

আমাদের দেশে জমিদারতন্ত্রের যুগে নায়েব গোমস্তা শ্রেণীর একদল লোক খুবই প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবত ধূর্ত এবং জাল জুয়াচুরি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, মামলা মোকর্দমা ইত্যাদিতে অত্যন্ত পারদর্শী হইত। ইহাদের না হইলে জমিদারদের চলিত না, আবার জমিদারদের আশ্রয় করিয়া ইহারাও বেশ দুই পয়সা ঘরে আনিত। গদাই পাল এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসেও এক বা একাধিক ষড়যন্ত্র কুশলী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

গদাই পালের লোকচরিত্রে জ্ঞান অসাধারণ। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য মুখে মুখে অলীক কাহিনী রচনা করিবার দক্ষতাও তাহার অসামান্য। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ভাঁড়ু সম্পর্কে বলিয়াছেন—"ভাঁড়ু শকুনি শ্রেণীর ব্যক্তি—ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।" গদাই পাল সম্পর্কেও কথাটি খাটে। তবে কিছু পার্থক্যও আছে। ভাঁড়ু নিজের স্বার্থটুকুই বোঝে, নিজের স্বার্থের জন্য অন্নদাতা

প্রতিপালকের সর্বনাশ করিতে তাহার একটুও বিবেকে বাধে না। সে শুধু কৌশলীই নয় ক্রূরও বটে। কিন্তু গদাই পালের মধ্যে ক্রূরতা নাই। জমিদারী কার্যে সে রমানাথ বাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, তাঁহারই স্বার্থে সে তমসুক জাল করিয়া ছিল এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া জেল খাটিয়াছিল। গোপীকান্তবাবুর আশ্রয়লাভের পর হইতেই গদাই তাহার কুটকৌশল প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু গদাই স্বেচ্ছায় গোপীবাবুকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করে নাই। গোপীকান্তকে না সরাইলে পূর্বশত্রু রমণ ঘোষকে ফাঁদে ফেলা যাইবে না বলিয়াই সে তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু গোপীকান্তবাবুর যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য সে গঙ্গামণিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—"কখনও কারুর কাছে বকুল গঞ্জের মেজবাবুর নাম করবিনে।"[২০] গঙ্গামণিকে তাহার ভাসুরের সংসারেও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে গদাই! অথচ গদাই এই গঙ্গামণি ঘটিত ব্যাপারটি লইয়া অনায়াসে গোপীকান্তবাবুকে বিপদে ফেলিতে পারিত। যেখানে স্বার্থের যোগ নাই সেখানে গদাই সত্যই ভাল মানুষ।

গদাই কথায় কথায় 'ধর্মস্য সূক্ষ্ম গতি'র কথা বলে, কিন্তু ধর্মে তাহার মতি আছে বলিয়া মনে হয় না। পুজা পাঠ ইত্যাদি ধর্মীয় ক্রিয়াগুলি তাহার নিকট কার্যসিদ্ধির সহায়ক মাত্র। তাই দরিয়াপুরে গিয়াই সে গোঁফ কামাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া বৈষ্ণব ভক্তের বেশ ধারণ করিয়াছে। আবার প্রয়োজনবোধে কালীভক্ত সাজিতেও তাহার বাধে না। সে একদিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে জোড়া পাঁঠা বলি দিবে বলিয়া মানত করে, আবার কামাখ্যার কালীর প্রশংসা করিতে গিয়া অন্যান্য কালীকে ঘেটো কালী, মেঠো কালী, কাঠকুড়ুনি কালী বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতে সে বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। কার্যসিদ্ধির জন্য কালীর চরণামৃত বলিয়া হরিদাসীকে মদ খাওয়াইতেও তাহার বাধে না।

গদাই চরিত্রটি চিত্রণে লেখক অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। এই চরিত্রটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থের একস্থানে একটু যেন অসঙ্গতি দেখা যায়। গদাইকে লেখক যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে তাহার চরিত্রে ভূতের ভয় থাকিবে ইহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অথচ আমরা তাহাই দেখিতেছি। একদিন রাত্রে নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে আপাদমস্তক শ্বেত বস্ত্রে আবৃত হরিদাসীকে দেখিয়া গদাইয়ের মনে হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই পেত্নী। অথচ এই গদাই ভূতচতুর্দশীর গভীর রাত্রে ডাকিনী সাজিয়া যেভাবে গঙ্গামণিকে মুক্ত করিয়াছে তাহা কোন ভূত ভীত মানুষের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। গদাই চরিত্র পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র ত্রুটিটুকু না থাকিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

হরিদাসীর চরিত্রটিও সুচিত্রিত। সে অন্তঃপুরের দাসী। কিন্তু কাহিনীর অপ্রধান অংশে তাহার ভূমিকাও কিছু কম নয়। তাই তাহাকে এই অংশের নায়িকা বলিলে বোধকরি অন্যায় হয় না। হরিদাসী সদ্‌গোপকন্যা এবং বালবিধবা। তাহার চেহারাটি গোলগাল 'বাতাবিনেবু' সদৃশ। কিন্তু চেহারা যেমনই হউক নিজেকে সুন্দরী ভাবিতে সকলেরই ভাল লাগে। গদাই যখন হরিদাসীর বালিকা বয়সের চেহারার উচ্চ প্রশংসা করিল তখন সে অত্যন্ত পুলকিত হইল। লেখক বলিয়াছেন হরিদাসী বোকা সোকা ভাল মানুষ। তাই গদাইয়ের প্রেমাভিনয়কে প্রথমে ধাঁচা বলিয়া মনে হইলেও পরিশেষে গদাইয়ের অভিনয় দক্ষতায় হরিদাসী তাহার প্রেমকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। বালবিধবা নারীর অতৃপ্ত সংসারাকাঙ্‌ক্ষা সংস্কারের চাপে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অনুকূল বায়ু প্রবাহে এই অতৃপ্ত আকাঙ্‌ক্ষাগ্নি যে কি প্রবল দাহিকা শক্তি সঞ্চার করিতে পারে তাহার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রটির মাধ্যমে দিয়াছেন। প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় 'সিরিয়াস' লেখক নন। জীবনের জটিলতাকে তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পরিহার করিয়া গিয়াছেন। হরিদাসীর ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটি গুরুতর জীবন সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই। তাই গদাইয়ের প্ররোচনায় সে যেমন বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে তেমনই গদাইয়ের নামে ওয়ারিন্‌ বাহির হইয়াছে শুনিয়া সে তাহার হবু স্বামীটিকে মন হইতে বিসর্জন দিতে দুঃখ অনুভব করে নাই। বরং সে যেভাবে নিজ প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার বোকা সোকা ভালমানুষের দুর্নামটি খারিজ হইয়া যাইবার কথা। তবে হরিদাসী নির্মম নয়, নারীসুলভ কোমলতা তাহার হৃদয়েও বর্তমান। "সাবধানে পালিও, যেন ধরে না ফেলে"[২১]—প্রতারক গদাইয়ের প্রতি হরিদাসীর এই সাবধান বাণী শুনিয়া মনে হয় গদাইয়ের প্রতি সে একেবারে নিষ্করুণ নয়। এখানে সে যেন স্বয়ং লেখকের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও বেশ উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। প্রভাত-কুমারের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই এইরূপ চরিত্র চিত্রণে তাঁহার সফলতার কারণ বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে এক আলোচনায় বলিয়াছেন—

"দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের দোষগুণের কারণ···আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে· যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব সেখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইবাছে।"[২২]

প্রভাতকুমার সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রভাতকুমার জীবনে বহু

বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প উপন্যাসের বহু চরিত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ রহিয়াছে। আবার তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতির ফলেই তাঁহার সৃষ্ট দুর্বৃত্ত চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ 'ভিলেন' হইয়া উঠে নাই।[২৩]

প্রভাতকুমার তাঁহার প্রথম জীবন বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটাইয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি তাহার গল্প উপন্যাসে কাজে লাগাইয়াছেন। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে বিহারের চম্পারণ জেলার অধিবাসী মালী, তাহার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং শাশুড়ীসহ, লেখকের অল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মুখের ভাষাও তাহাদেরকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে অনেক স্থলে সংলাপের ভাষায় হিন্দী ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ভুল হিন্দী প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন চন্দ্রশেখরে 'এ দোসরা চাঁদ স্থলতানা' অথবা 'পাকড়ো হামারা বিবি', 'রাজসিংহ', 'বড়া খুব সুরত আপকা বোলনাই কিয়া জরুর, হামরা শুন নাই কিয়া জরুর' ইত্যাদি। প্রভাতকুমারে এইরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। মালীর মুখে 'তু তো বড়া পাজি বুঝাওত হরে' কিংবা মালীপত্নীর মুখে 'আগে ছোঁড়ি তোরা হাম মারতে মারতে'···এই অর্ধ-সম্পূর্ণ বাক্যটির মধ্য দিয়া কন্যাকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার চিত্রটি যেমন স্বাভাবিক তেমনই স্বাভাবিক কাশিয়াদহের অতিথিশালার পশ্চিমা সাধুটির হিন্দী 'জিসনে ইস দুনিয়ামে আকর, ইয়ানে জনম লে কর, একদিনভি ভাঙ্গ নেহি পী লিয়া, উসনে জাহানকা—জাহান, কহতেহৈ দুনিয়াকো ফার্সী হায় উসনে দুনিয়াকো রং ঢং ক্যা দেখা? কুছ নেই দেখা।'[২৪] আবার বঙ্গভাষী সন্ন্যাসীর মুখে তিনি যে হিন্দী তুলিয়া দিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ-স্বাভাবিক হইয়াছে 'হ্যাঁ না এখনও উস্কো চেলা নেহি কিয়া। লেকেন, হামরা চেলা হোনেকে বাস্তে উস্কো বহুৎ আকিঞ্চন।'[২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সন্ন্যাসী চরিত্রগুলিও অত্যন্ত সজীব রেখায় চিত্রিত এবং ইহারা ইতিমধ্যেই সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী ক্ষেমানন্দর উক্তির সামান্য একটু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

"দেখ, একটা বিষয় সাবধান করে দিই। ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে খুব ভারিক্কে হয়ে থাকবে, বুঝেছ? এমন ভাবটা দেখাবে যেন সর্বদাই মনে মনে পরমার্থ চিন্তা করছ। পৃথিবীর কিছু যেমন টাকাকড়ি লুচি মালপুয়া এসব জিনিষের প্রতি যেন দৃকপাতও নেই। আমরা যেসব মস্করা করি, তা গোপনে নিজেদের মধ্যে। ওদের সামনে একেবারে বিশ্বম্ভর মূর্তি।"[২৬] এই সন্ন্যাসীই মোহিতকে সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্পর্কে অন্যত্র বলিয়াছে—

"কি, এখনও গাঁজা খেতে শেখনি? নতুন ভর্তি হয়েছে নাকি? তা আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। স্পষ্ট কথা বলি ভাই তুমি নেহাৎ আনাড়ি রাম। মাথায়

জটা কই ? শুধু গেরুয়া কাপড় পরলে আর কাঁধে ঝুলি নিলেই কি সন্ন্যাসী হয় ? গায়ে ছাই মাখা চাই, মাথায় জটা চাই, ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা খাওয়া চাই, চক্ষু রক্তবর্ণ হবে, তবে ত দেখে লোকের ভক্তি হবে। আমি যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, একেবারে কলকাতা টেরিটি বাজার থেকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এতখানি এক পেল্লায় জটা কিনে মাথায় দিয়েছিলাম। ফাঁকি দিয়ে কি হয় স্যাঙ্গাত ?"[২৭]

এই শ্রেণীর ভণ্ড সন্ন্যাসীর সংখ্যাই সংসারে বেশী। পরবর্তীকালে অন্যান্য লেখকেরাও এইরূপ ভণ্ড সন্ন্যাসী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রভাতকুমার নিজে ব্যারিস্টার ছিলেন। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে মামলা মোকদ্দমার বিবরণ অনেকখানি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই উপন্যাসে দারোগা শেফায়েৎ হোসেন এবং কেনারাম এই চরিত্র দুইটিও সুচিত্রিত।

প্রভাতকুমার তাঁহার গল্প উপন্যাসে কোন সমস্যা কোন মতবাদ অথবা তত্ত্বকে রূপ দিতে আগ্রহী ছিলেন না। 'নবীন সন্ন্যাসী'ই একমাত্র উপন্যাস যাহাতে হিন্দুধর্মের বহু প্রসংশিত বৈরাগ্য মার্গ সম্পর্কে লেখক তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এই উপন্যাসের মূল নায়ক সংসার বিরাগী, তাছাড়া কতকগুলি ভণ্ড সন্ন্যাসীর ভূমিকাও উপন্যাসে আছে। বাস্তবজীবনে লেখক কোন সন্ন্যাসীকে সংসারে ফিরাইতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু উপন্যাসে তিনি দুইটি শিক্ষিত যুবক, 'নবীন সন্ন্যাসী'র মোহিত এবং 'মনের মানুষে'র যোগেন্দ্রকে সন্ন্যাসী জীবন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য এবং সন্ন্যাসী চরিত্রের অতিমানবিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কারণেই হউক বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীদের যোগবলে এবং অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখিতেন বলিয়া মনে হয়। 'চন্দ্রশেখরে'র রমানন্দ স্বামী, 'রজনী'র সন্ন্যাসী, 'আনন্দমঠে'র মহাপুরুষ, প্রত্যেকের চরিত্রে অতিমানবতা স্পষ্ট। 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হাত দেখা, ভবিষ্যৎগণনা ইত্যাদি বিষয়কে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। জন্মান্ধ রজনী চক্ষুলাভ করিয়াছে একজন সন্ন্যাসীর কৃপায়।

সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও একথা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র সংসার ত্যাগ করিয়া গেরুয়াধারণ করাকেই সন্ন্যাসের লক্ষণ বলিয়া মানিতেন না। 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধটির এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম সম্বন্ধেই সন্ন্যাসী তিনিই ধার্মিক।......এখন বৈরাগীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না।"[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য asceticism ও ভারতীয় বৈরাগ্যকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শেষ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসীবেশী

গোবিন্দলালকে বলিতে শোনা যায় 'সন্ন্যাসে শান্তি নাই, ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপনই শান্তি পাইবার উপায়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে কয়জন সন্ন্যাসীকে পাওয়া যায় তাহারা কেহই সংসার স্পর্শশূন্য মোক্ষলোভী বা গুহাবাসী নহেন। সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে, মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব হয় এবং বহুজন হিতার্থে ও দুষ্কৃতি-দমনার্থে সংসারের মধ্যে তাঁহাদের আগমন ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা উপন্যাসে অতিলৌকিকতার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যে অতিমানব নাই, কিন্তু আপনাতে আত্মস্থ পরিপূর্ণ মানুষ আছে। "মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখ দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার……।"[২৯] সমস্ত সুখ দুঃখ সমেত সংসারকে ভক্তি নম্রচিত্তে স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যেই আছে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন।—

"আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"[৩০]

নিজের মঙ্গল অথবা অন্যের মঙ্গল, কোন কারণেই সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই। সংসার যাহারা ত্যাগ করে তাহারা কোন কাজের কাজী নহে, আবর্জনাস্তূপমাত্র—"সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়, এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া দেওয়া মেকি টাকা, জীবন কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসারত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে, সংসার হইতে তার ফসকাইবার জো নাই।"[৩১]

ইহানন্দ বিমুখ কৌমার্য ব্রতধারীদের লইয়া লঘুবিদ্রূপাত্মক উপন্যাস লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—'চিরকুমার সভা'। 'নৈবেদ্য'র 'মুক্তি' 'চৈতালি'র 'বৈরাগ্য' এবং 'ক্ষণিকা'র 'প্রতিজ্ঞা', 'কবির বয়স' 'শাস্ত্র' ইত্যাদি কবিতার মধ্যেও রবীন্দ্রমানসের প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্রানুরাগী লেখকদের মধ্যেও বৈরাগ্য মার্গকে বিদ্রূপ করিবার প্রবণতা দেখা গেল। প্রমথ চৌধুরী লিখিলেন, "বুদ্ধি যদি নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ, তপস্বী হব না আমি

জীবনের শেষ" (ব্যর্থজীবন), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিলেন, 'শবাসীন' (তুলির লিখন) এবং 'ঊর্ধ্ববাহুর প্রেম' (অভ্র আবীর)। প্রভাতকুমার লিখিলেন—

"তাই আমি নাহি যাব চক্ষু কর্ণ রোধ করি
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি ;
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
অত শীঘ্র অধমের মোক্ষে কায নাহি।"৩২

আসল কথা যাহারা জীবন রসিক তাঁহারা বৈরাগ্য সাধনাকে শ্রদ্ধা জানাইতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্রও বৈরাগ্য সাধনার মধ্যে শুধু রিক্ততাই দেখিয়াছেন।৩৩ তবে ধর্মসাধনা বা আত্মার মুক্তির কামনায় সংসারত্যাগকে সমর্থন করিলেও পরার্থে সংসার ত্যাগের প্রতি শরৎচন্দ্র অশ্রদ্ধা দেখান নাই। 'শ্রীকান্তে'র বজ্রানন্দ চরিত্রটির প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রেণীর সংসারত্যাগীরা ঠিক বৈরাগ্যমার্গী নয়, প্রকৃতপক্ষে ইহারা মানবসেবাব্রতধারী। সেবাব্রতধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রভাতকুমারেরও কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সংসারত্যাগ, তা সে নিজ আত্মার মুক্তির জন্যই হউক বা মানবসেবার জন্যই হউক, প্রভাতকুমার সমর্থন করেন নাই। তাই 'মনের মানুষে', সেবাব্রতধারী যোগেন্দ্র এবং 'জামাতা বাবাজী' গল্পে সন্তানব্রতধারী পূর্ণচন্দ্রকে তিনি গৃহসংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। 'নয়নমণি' গল্পের বিনোদ এবং 'ভুলভাঙ্গা' গল্পের হরিপ্রিয়াও সংসারে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে প্রভাতকুমারের বিরূপতা তিনটি ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত যাঁহারা 'জনসঙ্গ বর্জন' করিয়া কেবল 'শুচি' হইয়া থাকে, কেবল নাম জপ করে এবং প্রকৃতি সমেত জীবনের সমস্ত আনন্দোপকরণকে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চায় তাহাদের প্রতি লেখকের বিরাগ স্পষ্ট। মোহিত চরিত্রটির প্রতি লেখক তাই কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন। দ্বিতীয়ত যাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ হইতে জগদ্ধিতায় ব্যাপারটি বর্জন করিয়া তাহাকে গোব্রাহ্মণহিতায় করিয়া রাখিতে চান তাঁহাদের প্রতি লেখকের অপ্রসন্নতা পরিষ্কার বুঝা যায় 'পণ্ডিতজী' চরিত্রটির মাধ্যমে। পণ্ডিতজীর উক্তি—

"লোকসেবা হিন্দুর ধর্ম, একথা কোন পুঁথিতে দেখি নাই। তবে যদি বলেন গোসেবা—হ্যাঁ সেটা আলবৎ হিন্দুর ধর্ম বটে।......ইংরাজী পড়িয়া আজকাল কেউ আর হিন্দু ধর্ম মানে না। আজকাল অনেক বড়লোক আছে, যাহারা বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসী আসিলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে একটা সিকি দেয় না কিন্তু হাসপাতালে হাজার হাজার টাকা চাঁদা

দেয়।......অন্নদান মহাদান বটে, কিন্তু সেকি ডোম চামার কুর্মী কাহারকে অন্নদান? সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিত জ্যোতিষীকে অন্নদানই পুণ্য।"[৩৪]

তৃতীয়ত বাহ্য আচার পরায়ণতাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার খোলসে মুড়িয়া শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে নব্য হিন্দু সম্প্রদায় তাহাদের প্রতি লেখকের বিদ্রূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে 'বৈদ্যুতিক হিন্দু সভা' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদটিতে। এই সম্পর্কে লেখক একটি কৈফিয়ৎও দিয়াছেন—

"বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার বিবরণ পাঠ করিয়া আমার কোন কোন বন্ধু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন ইহাতে আমি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে শাস্ত্রোক্ত বা প্রচলিত কোনওরূপ হিন্দুধর্মকে আমি আক্রমণ করি নাই। হিন্দুনামধারী বিকৃত মস্তিষ্ক এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়াছি মাত্র।"[৩৫]

যদিও লেখক সম্প্রদায়টিকে ক্ষুদ্র বলিয়াছেন তথাপি ইহাদের দাপট তৎকালীন সমাজে নিতান্ত কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের মনে সংস্কার ও আচারপরায়ণতার দৃঢ় মূলটি শিথিল হইয়া পড়িল তখন একদল নব্যহিন্দু শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রথাপালনকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অনেকেই তখন এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুধু সহরে নহে, গ্রামেও এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল। প্রভাতকুমার তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'তেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৬]

হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়ের গোঁড়ামিকে প্রভাতকুমার আমল দেন নাই। ধর্মধ্বজাধারীদের লইয়া তিনি অনেক স্থলেই কৌতুক করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের কতকগুলি বাহ্য আচার বিচারকে লইয়া কৌতুক করিলেও প্রভাতকুমার মোটামুটিভাবে স্বধর্মনিষ্ঠ প্রাচীন এবং দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ চরিত্রগুলিকে শ্রদ্ধাযোগ্য করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। মোহিতের পিতা ব্রজকিশোরের মৃত্যুকালীন কথাবার্তার মধ্য দিয়া একটি ধর্মপ্রাণ সদ্‌ব্রাহ্মণের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিনির পিতা গুরুদাসের চরিত্রটিও শ্রদ্ধাযোগ্য। তাঁহার চরিত্রটির উপর সমসাময়িক ধর্মান্দোলনের কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই যুগে ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা শেষে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। গুরুদাসও যৌবনে ব্রাহ্মণ সমাজে যাতায়াত করিতেন, পরে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি টিকি রাখিয়াছেন, মাছ মাংস ছাড়িয়াছেন, প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করেন, কিন্তু কোনও প্রকার গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁহার নাই। প্রমথ ও মোহিতের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে

তিনি সত্যধর্ম ও হিন্দুধর্ম লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার গোঁড়ামিশূন্য অথচ ভক্তি নম্র চরিত্রের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'উনি কারুর মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। বলেন, যখন ক্ষিদে পাবে তখন ও আপনিই খাবে।'[৩৭] গুরুদাস সম্পর্কে এই উক্তিটি প্রমথর। কিন্তু এই উক্তিটিকে লেখকের নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেও বোধকরি অন্যায় হইবে না। অন্যের স্কন্ধে নিজ মতামত চাপাইয়া দিবার চেষ্টাতেই সংসারে যাবতীয় গণ্ডগোল দেখা দেয়। সেইখানেই যেন প্রভাতকুমারের আপত্তি।

প্রভাতকুমার ছিলেন জীবন প্রেমিক। জীবনকে যথার্থ ভাল না বাসিলে জীবনকে চিত্রিত করা যায় না। তবে জীবনকে ভালবাসিয়াও কেহ দেখেন জীবনে হাহাকার বেশী, সেখানে আকাশে মেঘ ওঠে, কুসুমে কীট প্রবেশ করে, চারু প্রেম প্রতিমায় ঘুণ লাগে। 'কিন্তু প্রভাতকুমার শুধু জীবন প্রেমিকই নহেন জীবনরসিকও। তাই তাঁহার দৃষ্টিতে জীবনের মূল্য আছে, সব কিছু জাল জঞ্জাল আশা নিরাশা সত্ত্বেও।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বৈরাগীর গেরুয়া ঘুচাইবার সাধনা করিয়াছেন এবং তাহারই উল্টা পিঠে আসিয়াছে বিশ্ব-বিধাতার রমণীয় সৃষ্টি, এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ, এই স্নেহ-প্রেম-প্রীতিপূর্ণ মানব জীবনকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা।

"তিনি স্নেহ করে, করুণা করে, আমাদের যা কল্যাণ সাধন করেছেন তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে নিত্য যে সকল সুখের সামগ্রী আমরা পাচ্ছি সেই সকলের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁর সমস্ত বিধান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে উপলব্ধি করা এরই নাম ত ভক্তি।"[৩৯]

একমাত্র 'নবীন সন্ন্যাসী' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসে প্রভাতকুমার তত্ত্বালোচনা করেন নাই। মানুষ গড়িতে গড়িতে মত গড়িতে যাওয়ার তিনি ছিলেন একান্ত বিরুদ্ধে। তাছাড়া প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিও তত্ত্বাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার অনুকূল নয়।

॥ টীকা ॥

১। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৩০৪।

২। 'রবীন্দ্র জীবনী' (১ম খণ্ড) পৃ: ৩৪৪।

৩। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ২১৮।

৪। ঐ, পৃ: ৩৮৫।

৫। ঐ, পৃ: ৩৬২।

৬। ঐ, পৃ: ৩৯৭।

৭। ঐ, পৃ: ৪৪৮।

৮। ঐ, পৃ: ৪৪৯।

৯। ঐ।

১০। ঐ, পৃ: ৪৫০।

১১। ঐ।

১২। ঐ।

১৩। ঐ, পৃ: ৪৬৯।

১৪। ঐ, পৃ: ৪৯৭।

১৫। ঐ, পৃ: ৪৯৭-৯৮।

১৬। ঐ পৃ: ৪৯৪।

১৭। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

১৮। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃ: ৬০।

২০। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৩৫০।

২১। ঐ, ৫২৮

২২। র, র, (২য় খণ্ড) ৮৩৩।

২৩। বর্তমান গ্রন্থের ১২৫—২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৪৭৩।

২৫। ঐ।

২৬। „ পৃ: ৪৭১।

২৭। „ পৃ: ৪৬৯।

২৮। 'ধর্মতত্ত্ব' র, র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৬৩২।

২৯। 'বিচিত্র প্রবন্ধ', র, র, (১৪শ খণ্ড) পৃ: ১৪।

৩০। 'নৈবেদ্য' (২০ সংখ্যক কবিতা) র, র (১ম) পৃ: ৮৬৮।

৩১। 'চতুরঙ্গ' র, র, (৯ম খণ্ড) পৃ: ৩৬৮।

৩২। 'মহাযাত্রা' প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃ: ৪১৫।

এই উদ্ধৃতিটিকে প্রসঙ্গক্রমে অভিশাপের অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত।

দ্র: 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' (১ম সং) পৃ: ৩৭৮।

৩৩। দ্র: 'পথের দাবী': শ, সা, স, (১৩শ খণ্ড) পৃ: ২৯০।

৩৪। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৩০৭।

৩৫। 'নবীন সন্ন্যাসী': প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩৬। 'শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, খনির তিমির গর্ভে, এ বিশালাক্ষী গ্রামেও এসে পৌঁছেছে। ভাবতাম বুঝি শহর অঞ্চলেই এর প্রাদুর্ভাব।

৩৭। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৩৭২।

৩৮। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃ: ৫৬।

৩৯। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃ: ৩৬২।

রত্ন-দীপ।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'রত্ন-দীপ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা

রত্নদীপ ঃ—

'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের তৃতীয় উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনীটির বাস্তব ভিত্তি আছে। এই প্রসঙ্গে জাল প্রতাপচাঁদের বিখ্যাত মামলাটির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।১

প্রভাতকুমার স্বয়ং তাঁহার উপন্যাসে এই মামলাটির উল্লেখ করিয়াছেন।২ 'রত্নদীপে'র কাহিনী পরিকল্পনায় বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাসে **Prisoner of Zenda**৩ (১৮৯৪) গ্রন্থখানিরও কিছু প্রভাব থাকিতে পারে।

প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গি এই উপন্যাসে অনেক পরিণত। প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'তে দেখিয়াছি যে ইহার দ্বিতীয়ার্ধ ভ্রমণকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'নবীন সন্ন্যাসী'তেও দেখা যায় যে মুখ্য কাহিনী অপেক্ষা উপকাহিনী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া মুল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উপরোক্ত দুইটি উপন্যাসেই বর্জনযোগ্য অংশ ছিল প্রচুর। কিন্তু 'রত্নদীপ' উপন্যাসটিতে পরিকল্পনাগত কোন ত্রুটি নাই বলিলেই চলে। কাহিনীর ঘটনাগুলি কার্যকরণের শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কাহিনীকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির পথে লইয়া গিয়াছে। একটি সার্থক উপন্যাসে চরিত্রের কার্যকলাপের বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ডঃ সুকুমার সেন যাহাকে বলিয়াছেন—"চরিত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা এবং চরিত্রের দিক দিয়া ঘটনার নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ"৪ তাহা উপন্যাস সার্থক হইবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। 'রত্নদীপ' সার্থক উপন্যাসে এই দাবী সম্পূর্ণত না হইলেও কতকটা পুরণ করিয়াছে।

রাখাল ভট্টাচার্য খুস্রুপুর রেলস্টেশনের ছোটবাবু। পাঁচ ছয় বৎসর রেলে চাকুরি করিতেছে—বেতন মাত্র পঁচিশ টাকা। কিন্তু মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়া বাড়ী যাইবার অভিযোগে যেদিন এই পঁচিশ টাকার চাকুরিটিও হাতছাড়া হইয়া গেল সেদিন রাখাল চোখে অন্ধকার দেখিল। দেশে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। তাহার গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে লইয়া গ্রামে ঢী ঢী পড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় নাই। তাহার উপর চাকুরি হারাইয়া কেহ গৃহে ফিরিয়া আসিলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে তাহার কিরূপ অভ্যর্থনা জোটে তাহা সর্বজনবিদিত। সুতরাং কোনদিকে কুলকিনারা না পাইয়া নিজের জীবনটা সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতই অন্ধকার বলিয়া রাখালের মনে হইতে লাগিল। অদৃষ্টের অদ্ভুত যোগাযোগে রাখালের চাকুরি জীবনের এই শেষ দিনটিতেই খুস্রুপুর স্টেশনে ট্রেনের কামরা হইতে একজন অজ্ঞাত পরিচয় সন্ন্যাসীর মৃতদেহ নামাইয়া রেলের গুদামে

রাখা হইল। সন্ন্যাসী দেড়া মাশুলের কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব মৃত সন্ন্যাসীর নিকট কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকিলেও থাকিতে পারে। রাখাল ভাবিল যে এই অর্থ যদি সে গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকার কিছুটা দুর হইতে পারে। পরাস্বাপহরণের এই অবৈধ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের চিত্তে সুরু হইল ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। রাখালকে লেখক একেবারে অমানুষ করিয়া আঁকেন নাই। আবার তাহাকে অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের মানুষ বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ নাই। সে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মতই তাহার লোভ আছে। প্রবল প্রলোভনের সম্মুখে যে আত্মদমন করিতে পারে তাহাকে বলি মহৎ। কিন্তু দুর্বল মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই যে নিজেকে সংযত রাখে তাহা আত্ম জয় করিবার ক্ষমতার জন্য নহে বরং শেষ রক্ষা হইবে না এই আশঙ্কাই তাহাদের পিছাইয়া রাখে। প্রচণ্ড প্রলোভনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাখালও মনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। অবশেষে অবশ্য লোভেরই জয় হইয়াছে। রাখাল পার্শেল গুদামে গিয়া সন্ন্যাসীর অর্থ অপহরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, মেঘের গর্জন, এবং বর্ষণ মিশিয়া পরিবেশটিকেও অবৈধ কর্মের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু রাখাল প্রথমবার পার্শেল গুদামের দরজা পর্যন্ত গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্যায়বোধের সঙ্গে সঙ্গে রাখালের দুর্বল মস্তিষ্কে জন্ম লইয়াছে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। কিন্তু দুর্নিবার লোভ ভয়কে পরাজিত করিয়াছে—রাখাল সন্ন্যাসীর বাক্স হইতে টাকার থলি এবং একটি গেরুয়া বাঁধান 'দপ্তর' বাহির করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। এই দপ্তরের ভিতর হইতে সন্ন্যাসী রচিত জীবন চরিত বাহির হইয়াছে। রাখাল তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছে যে দীর্ঘ যোল বৎসর পরে সন্ন্যাসী নিজ পৈতৃক বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয়ের জমিদারীটি দখল করিতে বাগুলি পাড়া যাইতেছিলেন। তখনও জাল সন্ন্যাসী সাজিবার কোন পরিকল্পনা রাখালের ছিল না। রাখালের মনে এই সম্ভাবনার বীজ বপন করিয়াছে তিনজন৫ — বাজারের মহাজন রাম খেলাওন, স্টেশনের বড়বাবু এবং রেলের ডাক্তার। তাহাদের মুখেই রাখাল জানিতে পারে যে বয়স, গায়ের রঙ্ এবং চেহারা সব দিক দিয়াই সন্ন্যাসীর সহিত তাহার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। তারপর বাসায় ফিরিয়া সন্ন্যাসীর জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে রাখালের ভাবান্তর, খাতা বন্ধ করিয়া উত্তেজিত মস্তিষ্কে পদচারণা, তাহার মুখের ভাব পরিবর্তনে আলোছায়ার দ্বৈতনৃত্য এবং অবশেষে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ—

"আমি যাব, এ বিষম প্রলোভন দমন করা আমার সাধ্য নয়। লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী যুবতী স্ত্রী একটা মিথ্যা কথা দ্বারাই আমি লাভ করিতে পারি। যে এতক্ষণ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তার বয়স, তার গায়ের রং তার চেহারা সমস্তই আমার মত। বৎসর অদর্শনের পর কার সাধ্য আমার জুয়াচুরি ধরে? তার জীবন চরিত আমার হাতে

তাতে প্রত্যেক খুঁটিনাটি কথাটি পর্যন্ত লেখা আছে। সেখানা আমি মুখস্থ করে নিলে, কার সাধ্য আমায় সন্দেহ করে? রাখাল, তুমি মর, তুমি মর, মরে ভবেন্দ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ কর।"[৬] প্রভাতকুমারের বর্ণনা এই অংশে যেন চলচ্চিত্রে পরিণত হইয়াছে।[৭]

গল্পের প্রথম ধাপে মনে যত চিন্তা, যত দ্বিধা থাকে, একবার পাপের গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ করিলে তখন আর ততটা সঙ্কোচ থাকে না। তখন শেষ রক্ষা করিবার প্রচেষ্টাই প্রবল হইয়া উঠে। রাখালও নিজেকে সবদিক হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। সে মুসলমান ফকিরের বেশে বাগুলিপাড়ায় গিয়া সেখানকার সমস্ত কিছু চিনিয়া আসিয়াছে। তাহার পর প্রয়াগে গিয়া মাথা মুড়াইয়া গৈরিক ধারণ করিয়া বেশে বাসে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। তদুপরি প্রকৃত সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য দুই মাস কাশীতে সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে থাকিয়া রাখাল নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাখালের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনা এবং তাহাকে কার্যে রূপায়িত করার মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বর্তমান। লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী এবং যুবতী স্ত্রী দুইটিই ছিল রাখালের প্রলোভনের বস্তু। কিন্তু যুবতী স্ত্রীটিকে দখল করিবার সময় যখন সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইল তখন রাখালের মন পিছাইয়া গিয়াছে—

"শীতকালের দিন স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াও, জলের ধারে বসিয়া লোকে যেমন একটু বিলম্ব করে রাখালের মনোভাবও তদ্রূপ।"[৮]

অতএব রাখাল ছয় মাস ব্রতের অছিলায় বউ রানীর স্পর্শ বাঁচাইল। 'যখন ভবেন্দ্র হইয়াছে তখন সর্বাংশে ভবেন্দ্র ত হইতেই হইবে তথাপি কিছুদিন যাউক না।' রাখালের এই সঙ্কোচ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি যে প্রভাত-কুমার নারীর পাতিব্রত্য এবং দৈহিক পবিত্রতাকে খুব উচ্চে স্থান দিয়াছেন। এদিক দিয়া তিনি কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'নবীন সন্ন্যাসী' এবং 'প্রতিমা' উপন্যাস দুইটিতে নারীর এই পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া লেখক যথাক্রমে গোপীকান্ত এবং খগেন্দ্র চরিত্রের স্বাভাবিকতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছেন। কিন্তু রাখালের চরিত্রে এই সংকোচটুকু না থাকিলেই যেন অস্বাভাবিক হইত। রাখাল ছয় মাসের ব্রতের অছিলা করিয়া বউরানীর দৈহিক স্পর্শ হইতে নিজেকে দুরে রাখিয়াছে, কিন্তু বউরানীর সরল পবিত্র রূপ, কোমল মধুর ব্যক্তিত্ব এবং তাহার অচঞ্চল স্বামীভক্তি ধীরে ধীরে রাখালকে তাহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে রাখালের নবজন্ম হইয়াছে। এই প্রেম রাখালের মনোরাজ্যে আনিয়াছে এক রূপান্তর। যে রাখাল বিষয় সম্পত্তির লোভে জাল ভবেন্দ্র সাজিয়াছে সেই রাখালই বিষয় সম্পত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া

॥ টীকা ॥

১। প্রতাপচাঁদের ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)। জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) শীর্ষক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

২। 'রত্নদীপ' প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৫০৮।

৩। উপন্যাসটির লেখক Anthony Hope (১৮৬৩-১৯৩৩)।
প্রভাতকুমারের সমসাময়িক।

৪। বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৪৯।

৫। তুঃ 'ম্যাকবেথ'।

৬। 'রত্নদীপ', পৃঃ ৫৪।

৭। শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য 'রত্নদীপ' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (১৩৪৭)। 'রত্নদীপ' অবলম্বনে ছায়াচিত্রও রচিত হইয়াছে শ্রীদেবকীকুমার বসুর পরিচালনায়।

৮। 'রত্নদীপ', পৃঃ ১৬৯।

৯। ঐ, পৃঃ ২৭৭।

১০। ঐ, পৃঃ ২৮২।

১১। প্রকাশ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩১০—১২)।

১২। সূচনা, 'নৌকাডুবি' র, র, (৮ম খণ্ড) পৃঃ ৪৯৮।

১৩। নৌকাডুবির রমেশও একটি পত্রের মাধ্যমে কমলার নিকট নিজ প্রণয়পিপাসু অন্তরটিকে ব্যক্ত করিয়াছিল।

১৪। 'রত্নদীপ', পৃঃ ৭৬।

জীবনের মুল্য ঃ—

'জীবনের মুল্যে'র প্লটটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—

"এই আখ্যায়িকার মুল ঘটনাটি সত্য। এক বুড়া কোন প্রকার স্বপ্ন না দেখিয়াই বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়াছিল, কথা দিয়া কন্যাপক্ষ অবশেষে অন্য এক ব্যক্তিকে আনিয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছিল, বুড়া বর সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া সেখানে যায়, এবং বিবাহ সভায় পৈতা ছিঁড়িয়া পুস্তক বর্ণিত মত অভিশাপও দিয়াছিল। কিছুদিন পরে মেয়েটি বিধবা হইয়া যায় এবং বুড়ার মনে অনুতাপও হয়।"

বিপত্নীক বৃদ্ধের বিবাহাকাঙ্ক্ষার চিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন নয়। এই বিষয় লইয়া বিশেষ করিয়া নাটক ও প্রহসন বাঙ্গলা ভাষায় অনেকগুলিই রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র (১৮৬৬) নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রহসনটির ঘটনাটিও সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।[১]

বাঙ্গলাদেশে বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে অসমবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। পণপ্রথাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কন্যার পিতার দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া অর্থশালী ব্যক্তি, তিনি বিপত্নীক অথবা বহুপত্নীক যাহাই হউন না কেন নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনায়াসে অল্পবয়স্কা কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিতেন। কৌলীন্য শাসিত সমাজে ইহার অনুমোদনও ছিল। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় অসম-বিবাহের কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন—'অর্থনৈতিক কারণ এবং কৌলীন্যপ্রথা উভয়ই আমাদের দেশের সমাজে অসমবিবাহের জন্য দায়ী।'[২]

গৌরী কন্যার শিবের মত (বৃদ্ধ ?) স্বামী পাওয়া ছিল ভাগ্যের বিষয়। এই সৌভাগ্য লাভের জন্য কুমারী কন্যাগণ নানা প্রকার বারব্রত ইত্যাদি করিত। সন্দেহ নাই শিবের মত স্বামী প্রার্থনার মুলে ছিল পার্বতী পরমেশ্বরের অভেদ সম্পর্ককে নিজ বিবাহিত জীবনে উপলব্ধির আশা। যাঁহাকে নমস্কার করিয়া কালিদাস বলিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ ॥[৩]

'জগতঃ পিতরৌ' যাঁহার মধ্যে চির পুরুষ ও চির নারী, শব্দ ও অর্থের মত নিত্য সংবদ্ধ হইয়া আছেন সেই সম্পর্কই ভারতীয় হিন্দু স্বামী স্ত্রীর নিত্যকাম্য। উমাপতি শিব উমার নিকট 'বাহাত্তুরে বুড়ো' নন—

যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণম্।
কথং স লক্ষ্য প্রভবো ভবিষ্যতি ॥[৪]

কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজে দেবতা হইতে পারে না বলিয়া দেবতাকেই মানুষ করিয়া লয়। তাই মধ্য যুগীয় বাঙ্গলা সাহিত্যে শিবের যে পরিচয় পাই তাহা এক দরিদ্র, অলস ও কামুক বৃদ্ধের। সমগ্র 'মঙ্গল সাহিত্যে' শিবের প্রায় একই চিত্র। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্যা ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবন কাহিনী।"[৫]

সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক যে কারণেই হউক বৃদ্ধ বর ও বালিকা কন্যার অসম বিবাহ যখন সমাজে বহু প্রচলিত হইল তখন মানুষ সাধারণ প্রেরণাবশেই স্বামীর বার্ধক্যকে দেব মর্যাদায় ভূষিত করিয়া লইল। বৃদ্ধ স্বামী পাওয়াটাই হইল শিবের মত পতি পাওয়া। চিন্তাধারার এইরূপ পরিবর্তনের ফলে পিতা যেমন বয়স্ক পাত্রের হাতে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনে করিতেন গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করিলেন, তেমনই বয়স্ক পাত্রটিও গৌরীকে ঘরে আনিয়া নিজ সম্ভোগ বাসনার তৃপ্তি ঘটাইতেন। বিশেষতঃ সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় পুরুষেরা একই সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের বধুর সহিত দাম্পত্য লীলা করিতে পারিতেন, পূর্ণ বয়স্কা এবং অপূর্ণ বয়স্কা উভয়েই তাহাদের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিত। কিন্তু গৌরীদের যে প্রাণান্ত হইত তাঁহার খোঁজ সে যুগের সমাজ বড় একটা রাখিত না। বলা বাহুল্য সমাজ ছিল পুরুষ শাসিত। ইহ জীবনে স্বামীই নারীর একমাত্র সম্বল, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলদাতা সুতরাং স্বামীর বয়সের গাছপাথর না থাকিলেও সতী নারীর পতিভক্তিতে কোন ব্যত্যয় ঘটা উচিত নয় এই ছিল সমাজের ধারণা। সাহিত্য সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা রক্ষণশীল তাঁহাদের রচনায় এই মতেরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার 'রজনী' উপন্যাসে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে মনের মিল তাহা অনেক সময় নবীন দম্পতির মধ্যেও থাকে না।

"সেই প্রাচীনে, নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত।"[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র অসম বিবাহের কুফল প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু বঙ্কিম সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁহার 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাসে অসম বিবাহের জটিলতা দেখাইয়াছেন। পরবর্তী যুগে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) রচনাতেও 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহার 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের মৃণাল এবং 'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসের পার্বতী এই দুইটি তরুণী ভার্যার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্র কেহই বৃদ্ধের বিবাহলালসার চিত্র আঁকেন নাই। বৃদ্ধের উৎকট বিবাহ লালসার চিত্র আমরা পাই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯) এবং 'ফোকলা দিগম্বর' (১৩০৭) উপন্যাস দুইটিতে, রমেশচন্দ্রের 'সমাজে' এবং প্রভাতকুমারের 'জীবনের মূল্যে'। এইগুলির মধ্যে 'কঙ্কাবতী' ব্যঙ্গরসাত্মক, 'সমাজ' সিরিয়াস এবং 'জীবনের মূল্য' করুণরসাত্মক রচনা।

দীনবন্ধুর রাজীবলোচন, রমেশচন্দ্রের তারিণী, ত্রৈলোক্যনাথের জনার্দন এবং প্রভাত-কুমারের গিরিশ ইহারা সকলেই বিয়ে পাগলা বুড়ো হইলেও গিরিশের চরিত্রটি একটু ভিন্নধর্মী। রাজীবলোচন, তারিণী এবং জনার্দন তাহাদের স্রষ্টার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত কিন্তু গিরিশ সহানুভূতি ধন্য। তাছাড়া গিরিশ ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে বিবাহাকাঙ্ক্ষা-রূপী অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপের জন্য অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। ইহারা সকলেই নিজ নিজ লালসাবহ্নিতে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। তাই রাজীবলোচন অথবা জনার্দনের ব্যর্থতায় এবং তারিণীর মর্মান্তিক পরিণতিকে পাঠক কোন দুঃখ অনুভব করে না। যেমন কর্ম তেমন ফল এই অনুভূতিই সেখানে জাগে। কিন্তু গিরিশের ব্যর্থতায় পাঠক-হৃদয়ে কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়। প্রভার জন্য গিরিশের উন্মত্ততার কারণ হিসাবে একটি স্বপ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই স্বপ্নের অনুকূল ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে এবং সর্বোপরি জুটিয়াছে সতীশ দত্তের প্ররোচনা। 'জীবনের মূল্যে'র ভূমিকায় প্রভাতকুমার বলিয়াছেন "এক বুড়া বাস্তবিকই কোন স্বপ্ন না দেখিয়াই বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়াছিল।" তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রভাতকুমার স্বপ্নরূপ ডালপালা লাগাইয়া কাহিনীটিকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

গিরিশ লোক নিতান্ত মন্দ নহেন। প্রথমা স্ত্রী গত হইবার পর তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়া, প্রবৃত্তির তাড়নায় নহে।

·····প্রথমবার যখন গৃহশূন্য হলাম, ছেলে দুটি অতি শিশু, আমারও বয়স অল্প। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে আনলাম, তিনি ছেলে দুটিকে মানুষ করতে লাগলেন, বেশ মানিয়ে গেল, কোনও গোলমাল হল না।"[৭] কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় স্ত্রীরও মৃত্যু হইলে গিরিশ পুনরায় বিবাহের কোন চিন্তাই করেন নাই। বরং পিসিমার বারংবার অনুরোধ

সত্ত্বেও বিবাহে রাজী হন নাই। তাহার পর একদিন সগুস্নানসিক্তকুন্তলা কোকিল পাড় শাড়ী পরিহিতা চতুর্দশবর্ষীয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া গিরিশের মনটা সারাদিন 'আঁচড় পাঁচড়' করিতে লাগিল। কিন্তু সেজন্য গিরিশ লজ্জিত হইলেন। এই পর্যন্ত গিরিশের চরিত্র সুস্থ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সেইদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার প্রথমা পত্নীই প্রভাবতী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য গিরিশকে অনুরোধ করিতেছে। এই স্বপ্ন দর্শনই কাহিনীটিতে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। লেখক গিরিশকে যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী একজন সরলপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। গিরিশ মহাজনী কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু সুদখোর মহাজন বলিতে যেরূপ চরিত্র আমরা ধারণা করি গিরিশ ঠিক সেইরূপ চরিত্র নহে। জগদীশকে তাহার ভিটা হইতে উৎখাত করিবার পিছনে গিরিশের অর্থ আদায়ের ফন্দী ছিল না, প্রভাকে বিবাহে ব্যর্থতাজনিত প্রবল ক্ষোভই তাঁহাকে এইরূপ কার্যে প্ররোচিত করিয়াছে। কিন্তু পরে কৃতকর্মের জন্য গিরিশ যথেষ্ট অনুতপ্তও হইয়াছেন।

স্বপ্নে প্রথমা পত্নীকে দেখিবার পর গিরিশ মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন যে প্রথমা পত্নী স্বর্গগতা হইবার এক বৎসরের মধ্যেই প্রভাবতীর জন্ম হইয়াছে। এই যোগাযোগ গিরিশকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে এবং স্বপ্নকে তিনি অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। স্বপ্ন অবশ্য অলীক নয়ও। আধুনিক মতে আমাদের অবদমিত কামনাই স্বপ্নের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

গিরিশের স্বপ্ন দর্শনকে এই তত্ত্বানুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয় সংসার করিবার ইচ্ছা হয়ত গিরিশের মনে ছিল। বিশেষতঃ সেই যুগে অসম বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং গিরিশের পিঁসিমাও বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ বার্ধক্য এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রদের কথা স্মরণ করিয়া গিরিশ মনের গোপনতম ইচ্ছাকে হয়ত আমল দেন নাই। কিন্তু প্রভাবতীকে দেখিয়া তাঁহার মনের সুপ্ত কামনা চাড়া দিয়া উঠিল, 'এই ত একটি বেশ ডাগর মেয়ে রয়েছে, একে যদি ঘরে আনি তাহলে বোধ হয় পিসিমা খুশী হন।' সারাদিন মনটা গিরিশের 'আঁচড় পাঁচড়' করিবার পর রাত্রিতে পূর্বোক্ত স্বপ্ন দর্শন হইল। গিরিশ স্বপ্নকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। পুরোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়ও স্বপ্নের আধুনিক ব্যাখ্যাকে খ্রীষ্টানী মত বলিয়া তাচ্ছিল্য করিলেন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের 'স্বপ্নতত্ত্ব' অধ্যায় হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিলেন যে এইরূপ স্বপ্ন যে দেখে সে রাজা হয়। অতএব গিরিশ রাজা হইবেন তাহা বিশ্বাস না করিলেও স্বপ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। দিনে প্রভাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের ফলেই তিনি রাত্রে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন এইভাবে বিচার না করিয়া, তাঁহার প্রথমা স্ত্রীই প্রভাবতীরূপে জন্ম লইয়াছে

এবং সেই জন্যই প্রভার জন্য তাঁহার মনে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কার্য করিতে কারণের দিকে না গিয়া তিনি কারণ হইতে কার্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

দিব্যাস্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্তি স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই শ্লোকটির ভট্টাচার্যকৃত ব্যাখ্যা গিরিশকে আরও উত্তেজিত করিয়াছে। ভট্টাচার্য বলিয়াছেন দিব্যাস্ত্রীর অর্থ স্বর্গগতা স্ত্রী। মৃতা স্ত্রী যদি স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে আমায় বিবাহ কর তাহা হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা রাজা হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা গিরিশকে প্ররোচিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। একদিকে কিশোরী ভার্যা অপরদিকে সম্পত্তি লাভের আশা বৃদ্ধের শিথিল মস্তিষ্ককে বিচলিত করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য নায়কের ন্যায় গিরিশের চিন্তাজগতে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। প্রভাকে ঘরে আনিলে তাঁহার পুঁটু ও বুঁচি নাম্নী দুই শিশু কন্যার দুর্গতির একশেষ হইবে এ বিষয়ে গিরিশের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার কোন মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ কন্যাদ্বয়ের প্রতি তিনি যে বিরূপ ছিলেন তাহাও নহে। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' তাহার দুই বিধবা কন্যার প্রতি নির্মম ছিল। লেখকের পরিবেশ রচনার গুণে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ফলে চরিত্রটির স্বাভাবিকতা সেখানে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু গিরিশের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিকতা ব্যাহত হইয়াছে। উপন্যাসে আর একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার—সতীশ দত্তের প্রভাবতী সম্বন্ধে মিথ্যা ভাষণ এবং গিরিশের তাহাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন। সতীশ ধড়িবাজ, মানুষের মন তাহার নখদর্পণে। কিন্তু গিরিশ কিছু অবিচক্ষণ ছিলেন না। বিশেষ করিয়া যে ব্যক্তি মহাজনী কারবার করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন তাঁহাকে কল্পিত কাহিনী শুনাইয়া বিভ্রান্ত করা নিশ্চয়ই সহজ নয়, অথচ সতীশ দত্ত অনায়াসে তাহাই করিয়াছে। ফলে বিষয়টি বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। বিপরীত যুক্তিতে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে গিরিশ ঐ কথাগুলি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন, ঐ ধরণের কথা শুনিতে তাঁহার মন উৎসুক হইয়া আছে অনুমান করিয়াই ধূর্ত সতীশ মিথ্যা কাহিনী রচনা করিয়া গিরিশকে শুনাইত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। সতীশের স্বার্থ সিদ্ধি হইত অবশ্যই কারণ সতীশ বিনা হ্যাণ্ডনোটে ৫০০ টাকা ধার পাইয়াছে, ইচ্ছামত টাকা শোধ করিবার অনুমতিও পাইয়াছে। এমন বন্ধু বাৎসল্য গিরিশ আর কাহাকেও দেখান নাই। গিরিশ কল্পিত কাহিনী শুনিয়া পুলকিত হইবেন তাহা স্বাভাবিক কিন্তু পুলকিত হইলেই বিশ্বাস করিতে হইবে এমন কি কথা আছে। পুলক সঞ্চার করিতে পারিলেই কোন কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে না। চাটুকার পরিবৃত

রাজা স্তাবকদের খোসামুদিতে তৃপ্ত হইতেন। চাটুকার হয়ত বলিল রাজা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতার সমতুল্য। এইরূপ উক্তিতে রাজা খুশী হন। কিন্তু নিতান্ত বেকুব রাজা ছাড়া নিজেকে সত্য সত্যই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ বলিয়া কে বিশ্বাস করিবেন? অর্থাৎ আমরা বলিতে চাই যে সতীশের স্তাবকতায় গিরিশের আনন্দ লাভে অস্বাভাবিকতা নাই, অস্বাভাবিক হইয়াছে ঐ সব মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস করায়। তাঁহার মৃতা প্রথমা পত্নীই প্রভাবতী রূপে জন্ম লইয়াছে একথা বিশ্বাস করিলেও, প্রভাবতী জাতিস্মর একথা গিরিশ বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং প্রভাবতীও গিরিশকে বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছে, গিরিশের প্রথম পক্ষের পুত্রদ্বয়ের প্রতি প্রভার সন্তান বাৎসল্য জন্মিয়াছে ইত্যাদি কল্পিত কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন গিরিশের পক্ষে স্বাভাবিক হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

কাহিনীর ঘটনাস্থল পল্লীগ্রাম। কিন্তু পল্লীসমাজের চিত্র কাহিনীতে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। গিরিশের বিবাহকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপক্ষ দলের মধ্যে দলাদলির ছবি আঁকিবার যে সুযোগ ছিল, লেখক তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। গিরিশের বিবাহের বিপক্ষে মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু এই চরিত্রটি তাহার শ্লেষ্মা কবলিত নাসিকা, তাহার বিকৃত উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা কাহিনীতে কিছুটা স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, গিরিশের বিরুদ্ধে সে অথবা তাহার সমমতের অন্যান্য ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা লইয়া আসরে অবতীর্ণ হয় নাই। এদিকে যে প্রভাবতীকে কেন্দ্র করিয়া সতীশ নিত্যনূতন মুখরোচক কাহিনী বানাইতেছিল সেই প্রভাবতী বৃদ্ধকে বিবাহের আতঙ্কে দিন দিন শুকাইতেছিল এবং গিরিশের প্রতি নানারূপ কটূক্তি করিয়া মনের জ্বালা মিটাইতেছিল। গিরিশকে বিবাহে অনিচ্ছা প্রভাবতীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনিচ্ছার কথা প্রভার পিতা-মাতা জানিয়াছে, পাড়া প্রতিবেশী জানিয়াছে, জানে নাই শুধু গিরিশ এবং তাহার পিসিমা। ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

কাহিনীর এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিগুলি পাঠক ক্ষমাপ্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারে কারণ কাহিনীর মধ্য দিয়া যে স্নিগ্ধ মধুর কৌতুক-রসধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা কাহিনীর ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে দেয় না। কিন্তু হরিপদর প্রচেষ্টায় রাজকুমারের সহিত প্রভার বিবাহ হইয়া গেলে এবং বিবাহ সভায় গিরিশের পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দানের পর হইতে কাহিনী ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। কৌতুক রচনায় ঘটনার অতিরঞ্জন অথবা সামান্য অসঙ্গতি পাঠক উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকে কিন্তু গুরুগম্ভীর (serious) কাহিনীর ক্ষেত্রে পাঠক সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। প্রভার সহিত রাজকুমারের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনীটিকে তাহার সমস্ত অসঙ্গতি সত্ত্বেও আমরা উপভোগ করি। সতীশ দত্তর বাক পটুতা, উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি, বৃদ্ধ গিরিশের

কিশোরী ভার্যা গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি, মাধব চক্রবর্তীর উচ্চারণ বিকৃতি কাহিনীর প্রথমার্ধকে হাস্যরসের অবিরল ধারায় অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই হাস্যরস স্নিগ্ধ ও মধুর, লেখক কাহাকেও কটাক্ষ বা বিদ্রূপ করেন নাই, এমন কি রচনার গুণে বৃদ্ধের বিবাহ নেশাকে আমরা সহানুভূতির চোখে দেখি। কাহিনীটি সম্পূর্ণত একই সুরে গাঁথা হইলে, আমরা একটি হাস্যরস প্রধান উপন্যাস পাইতাম। কিন্তু লেখকের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কাহিনীর প্রথম পরিকল্পনাকালে তিনিও কাহিনীর করুণ অথবা মধুর কোন্ পরিণতি করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। দুইটি পরিণতিই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন।৭ক কিন্তু শেষে করুণ পরিণতিই করিয়াছেন। করুণ পরিণতি করিবার জন্য তাহাকে উপর্যুপরি চারিটি মৃত্যু ঘটাইতে হইয়াছে। বাস্তব জগতেও এইরূপ মৃত্যু ঘটিতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীর ক্ষেত্রে এই মৃত্যু দৃশ্যগুলির অপরিহার্যতা অবশ্যই বিচার্য। গিরিশের অভিশাপের ফলেই প্রভা বিধবা হইয়াছে এই অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন এবং লেখকও সেকথা বলেন নাই। গিরিশের অভিশাপ এবং রাজকুমারের মৃত্যু কাকতালীয়ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। এইরূপ কাকতালীয় যোগাযোগ (coincidence) সাহিত্যে এবং মানব জীবনেও একেবারে বিরল নয়। প্রভার পিতা মাতা এবং ভ্রাতার মৃত্যুর প্রয়োজনও ছিল। তাহাদের মৃত্যু না হইলে প্রভা সম্পূর্ণরূপে সহায় সম্বলহীনা হইতে পারে না অথচ প্রভাকে সেইরূপ চিত্রিত করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। উপন্যাসের নামকরণের দিক হইতে বিচার করিলেও কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতিই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সহায় সম্বলহীনা পরাশ্রিতা প্রভাকে অনুতপ্ত গিরিশ সাহায্য করিতে গেলে তাহাকেই নিজের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করিয়া প্রভা তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। কারণ জীবনের মুল্য টাকায় পরিশোধ করা যায় না। প্রভার ব্যর্থ জীবন টাকার দ্বারা সার্থক হইয়া উঠিবে না।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসেও প্রধান চরিত্রগুলি পরিস্ফুট নয়। কিন্তু ধড়িবাজ সতীশ দত্তের চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত। উপন্যাসটির প্রথমার্ধ সে তাহার কার্যকলাপের দ্বারা জমাইয়া রাখিয়াছে। এই শ্রেণীর চরিত্রচিত্রণে প্রভাতকুমার সিদ্ধহস্ত। উপন্যাসের প্রাথমিক খসড়ায় এই চরিত্রটির কোন উল্লেখ নাই। লেখক পরে চরিত্রটি কাহিনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ফল ভালই হইয়াছে।

পরিশেষে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। লেখক বলিয়াছেন, 'জীবনের মুল্য' উপন্যাসের কাহিনীর মুল ঘটনাটি সত্য কিন্তু প্রাথমিক খসড়াগুলিতে সত্য ঘটনার উল্লেখ লেখক করেন নাই।৮

॥ টীকা ॥

১। "দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"

ব, র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৮২৭।

২। 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' : পৃঃ ১৯৪।

৩। রঘুবংশম্ : শ্লোক সংখ্যা ১।

৪। কুমারসম্ভবম্ : (৫ম সর্গ) শ্লোক সংখ্যা : ৮১।

৫। নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' : পৃঃ ২৬।

৬। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৯৩।

৭। 'জীবনের মূল্য' : পৃঃ ৪।

৭ক। বর্তমান গ্রন্থের ১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৮। প্রাথমিক খসড়া-পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় এবং পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সিন্দূর-কৌটা :—

'সিন্দূর-কৌটা' উপন্যাসে প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসটির আংশিক অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে কুন্দনন্দিনী যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। প্রভাতকুমারের সুশীও উগ্র আধুনিকতার আবহাওয়ার মধ্যে অনুরূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে বিজয় ও বকুরানীর জীবনে। কিন্তু প্রভাতকুমার সৃষ্ট 'বিংশ শতাব্দীর সূর্যমুখী'[১] অর্থাৎ বকুরানী সূর্যমুখীর ন্যায় অভিমানে গৃহত্যাগ না করিয়া সপত্নী সুশীকে সিন্দূর-কৌটা উপহার দিয়া সাদরে বরণ করিয়া লওয়ায় কাহিনীটির পরিণতি 'বিষবৃক্ষ' হইতে ভিন্ন হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পুরুষের একাধিক বিবাহের উল্লেখ প্রভাতকুমারের অনেকগুলি ছোটগল্পেই পাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও একাধিক স্ত্রী জীবিত থাকিবার দৃষ্টান্ত নাই। একমাত্র 'সিন্দূর-কৌটা' উপন্যাসেই দেখা যাইতেছে একাধিক স্ত্রী একই সঙ্গে বর্তমান। পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণে প্রভাতকুমারের সমর্থন ছিল বলিয়া মনে হয়। 'সিন্দূর-কৌটা' উপন্যাসে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় খ্রীষ্টান রমণীর সহিত হিন্দুর বিবাহ। অবশ্য খ্রীষ্টান রমণী যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর্য সমাজ মতে বিবাহিতা হইয়াছে। 'গরীব স্বামী' উপন্যাসেও বিদেশিনী খ্রীষ্টান যুবতীর সহিত হিন্দু যুবকের বিবাহের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানেও খ্রীষ্টান রমণীর শুদ্ধিকরণ হইয়াছে। এই দুইটি দৃষ্টান্ত ছাড়া প্রভাত সাহিত্যের আর কোথাও এইরূপ বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। গল্পের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে প্রভাতকুমার বিধবা বিবাহ, এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই জাতিকুল বাঁচাইয়া চলিয়াছেন। অবশ্য উপরোক্ত দুইটি ক্ষেত্রেও খ্রীষ্টান রমণীকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিবার ফলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রভাতকুমার প্রচলিত সমাজ বিশ্বাসকে আঘাত করিতে চাহেন নাই। আধুনিকতা এবং রক্ষণশীলতা—আমাদের মনে হয় প্রভাতকুমার কোনটারই চরম সীমায় যাইতে চাহেন নাই। এই জন্যই আমরা অন্যত্র তাঁহাকে 'রক্ষণশীল আধুনিক' বলিয়াছি।[২]

'সিন্দূর-কৌটা'র নায়ক বিজয় ধনী, সচ্চরিত্র, পত্নীব্রত যুবক। হাইকোর্টে তিনি ওকালতী করেন নিতান্ত সখের খাতিরে, জীবিকার তাড়নায় নহে। পত্নী বকুলাবলিকা ওরফে বকুরানীকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালবাসেন। এহেন বিজয় ভ্রমণোদ্দেশ্যে জব্বলপুরে

আসিয়া ঘটনাচক্রে এক বিবাহিতা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যুবতীর প্রেমে পড়িয়া গেলেন। অনুরূপ-ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথও জমিদারী পর্যবেক্ষণ উপলক্ষ্যে নিরাশ্রয়া কুমারী কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্রর ন্যায় বিজয়েরও আর্তপ্রতিপালনজনিত কর্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে যাহা ছিল সহানুভূতি, পরে তাহাই প্রবল আকর্ষণে পরিণত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ আদর্শ-পত্নী সূর্য-মুখীর কথা ভাবিয়া বিচলিত হইতেন, বিজয়েরও দ্বিধার কারণ বকুরানী। এই পর্যন্ত 'বিষবৃক্ষে'র সহিত 'সিন্দুর-কৌটা'র কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি 'বিষ-বৃক্ষে'র কমলমণিও এখানে সৌদামিনীরূপে আবির্ভূতা। তবে সৌদামিনী বিধবা এবং পিতৃগৃহনিবাসিনী। সৌদামিনী সুশীকে লইয়া বকুরানীর সহিত আলোচনা করে এবং বকুরানীর জীবনে যে সূর্যমুখীর ভূমিকা আসন্ন সে বিষয়ে ইঙ্গিতও দেয়।[৩] কিন্তু ইহার পর হইতে প্রভাতকুমার তাঁহার কাহিনীকে নিজস্ব চিন্তাপথে চালিত করিয়াছেন। বিবাহিত পত্নীব্রত যুবকের পক্ষে অপর নারীতে আসক্ত হওয়া পাঠকের নৈতিক সমর্থন পাইতে পারে না, বিশেষ করিয়া সেই নারী যদি পরস্ত্রী হয়। কুন্দনন্দিনী বিধবা এবং সুশী সধবা। অবশ্য প্রভাতকুমার সুশীর স্বামী পলের আরও একটি স্ত্রীর উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাদের বিবাহ অসিদ্ধ এবং সুশী প্রকৃতপক্ষে কুমারী। কিন্তু তাহা মাত্র আইনের চোখে। বিবাহ বিচ্ছেদপ্রাপ্তা নারী পুনরায় পিতৃপদবীতে ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কুমারীত্ব একবার হারাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। তাই সুশীর প্রতি প্রেমকে বিবাহিত রমণীর প্রতি প্রেম বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্রভাতকুমার এই প্রেমকে কিন্তু নানা-ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। একদিক দিয়া তিনি অতিমাত্রায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের একাধিক বিবাহের সমর্থনে তিনি বকুরানী এবং বিজয়ের মুখে যে যুক্তিগুলি বসাইয়াছেন তাহা কালিদাসের যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য নিজেকে বলি দিতে চাহিয়াছেন। বকুরানীও তাহাই করিয়াছে। ইহাই বোধকরি আদর্শ হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সূর্যমুখী জানিত যে সে নিজ মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানায় সহি করিতেছে—

'দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!'[৪] সূর্যমুখীকে একান্ত ক্ষমাশীলা আদর্শ হিন্দুরমণী বলিতে বাধা নাই। কিন্তু তার মনের দুঃখ এবং অভিমানও একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বকুরানীর নির্বিকার ঔদাসীন্য, উপরন্তু স্বামীর পুনরায় বিবাহের স্বপক্ষে তাহার যুক্তিতর্ক তাহাকে একেবারে আদর্শের পুতুল করিয়া তুলিয়াছে।[৫] তাঁহার চরিত্রে প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন একান্ত ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। আদর্শ এবং বাস্তবের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত

হৃদয় বকুরানীর যে ট্রাজিক চরিত্র চিত্রিত হইতে পারিত লেখক সেদিক দিয়া যান নাই। ফলে নিষ্প্রাণ চরিত্রটি পাঠক মনে রেখাপাত করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতিনায়িকা সুশীর ভূমিকাটিও পরিস্ফুট হয় নাই। সে হিন্দু সমাজের অসহায়া অরক্ষণীয়া কন্যা নয়। অতএব যে কেন মর্কটমূর্তি মাদ্রাজী পলকে বিবাহ করিতে গেল লেখক তাহার পর্যাপ্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই, বিশেষত খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে যখন কোর্টশিপ প্রথা বর্তমান। সুশীর আত্মীয়স্বজন ছিল না বটে, কিন্তু লেখক তাহার পিতৃবন্ধু চৌধুরী সাহেবকে আত্মীয়াধিক সহানুভূতিসম্পন্নরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। অতএব সুন্দরী শিক্ষিতা সুশী নেহাৎ অসহায় অবস্থায় পলকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে এরূপ অনুমান করিতে কষ্ট হয়। তাছাড়া বিজয় এবং সুশীর প্রেমও খুব উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুশী বিজয়কে পত্নী প্রেমিক জানিয়াও যেভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে তাহাতে তাহাকে মোটেই উন্নতচরিত্রা বলিয়া মনে হয় না। অথচ লেখক তাহাকে যেন আদর্শ প্রেমিকারূপেই চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সুশীর সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়া তাহার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। এদিক দিয়া এই প্রগলভা রমণীটির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর কোন তুলনাই চলে না। সুশী চরিত্রটির স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটার ফলে তাহা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিপরীতপক্ষে পত্নী প্রেমিক বিজয়ের চরিত্রটিও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুশীকে পরস্ত্রী জানিয়াও তিনি যেভাবে তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকেও একজন ইন্দ্রিয়পরবশ স্বার্থপর ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অথচ লেখক যেন তাহাকে একদিকে পত্নী প্রেমিক অপরদিকে আদর্শ প্রেমিকরূপে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের অধিকাংশ উপন্যাসে ষড়যন্ত্র কুশল এক একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পল সাহেব অনেকটা সেই জাতীয় চরিত্র। কিন্তু প্রভাতকুমারের পূর্ববর্তী অন্যান্য উপন্যাসের অনুরূপ চরিত্রগুলির তুলনায় পল সাহেবের ভূমিকাটি উপন্যাসের কাহিনীতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই এবং তেমন চিত্তাকর্ষকও হইয়া উঠে নাই।

প্রভাতকুমারের খ্যাতি প্রধানত ছোটগল্পকার হিসাবে। কিন্তু উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও চরিত্র রূপায়ণ, বিষয় বৈচিত্র্য এবং চিত্তাকর্ষক আখ্যানের জন্য তিনি প্রশংসা লাভের যোগ্য। কিন্তু 'সিন্দুর-কৌটা' উপন্যাসে লেখক ঘটনা সংস্থাপন অথবা চরিত্র রূপায়ণ কোন দিক দিয়াই কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিজয়, বকু এবং সুশী উপন্যাসের এই তিনটি চরিত্রই একই স্থানে দাঁড়াইয়া লেখকের নির্দেশ অনুযায়ী হাত পা নাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের মানসিক দ্বন্দ্ব বিক্ষোভেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

অথচ 'সিন্দুর-কৌটা' উপন্যাসটি যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে নায়ক নায়িকার মানসম্বন্ধের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আবশ্যক ছিল। কিন্তু লেখক তাহা করেন নাই। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তব অথবা সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটি জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বকুরানীর স্বার্থত্যাগ এবং মহত্ত্ব সে যুগের অশ্রুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। যে দেশে সতীনকে আঁষবটি দিয়া কাটিবার ক্ষমতা লাভের জন্য বালিকা বয়স হইতে ব্রতব্রত করা হইত সেই দেশে সতীনকে 'সিন্দুর-কৌটা' দিয়া বরণ করিয়া লওয়া চরম মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।[৬]

উপন্যাসের নামকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি লেখক বকুরানীর স্বার্থত্যাগ এবং মহত্ত্বের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সে 'সিন্দুর-কৌটা' দিয়া সপত্নীকে বরণ করিয়া লইয়াছে, এই ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার অসাধারণ স্বামিভক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। নামকরণ সেদিক দিয়া সার্থক।

॥ টীকা ॥

১। দ্রঃ 'সিন্দুর কৌটা' দ্বিতীয়খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

২। ৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। "সৌদামিনী বলিল আজ কুন্দ সূর্যমুখী তোর মাথায় ঢুকে গেল কেন রে?" বকু বলিল "তুমিই ত ঢুকিয়ে দিলে ভাই।" "সৌদামিনী বলিল দেখ ভাই, দাদাকে তুমি চিঠি লেখ যে, শীগ্‌গির চলে এস"। 'তাকে যদি সঙ্গে করে আনেন।' 'আনলেই বা।' 'কুন্দ এস—দিদি এস'—বলে তার হাত ধরে তাকে ঘরে তুলে নিবি।" বকুরাণী বলিল "ইস্‌। ঘরে তুলে নেব। ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেব না।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "সে কি রে! এই বুঝি তুই সূর্যমুখী? তুই দাদাকে কোথায় বলবি—প্রভু, তোমার সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর, আমি সুখী হইব।—তা নয় ঝাঁটা!" বকুরাণী হাসিয়া বলিল—"আমি যে বিংশ শতাব্দীর সূর্যমুখী—ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা।" প্র, প্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৯।

৪। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩০৮।

৫। তুঃ 'দুই বোন' : রবীন্দ্রনাথ।

৬। "অশ্বত্থতলায় বাস করি,
সতীন্ কেটে আল্‌তা পরি।"
"বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের শ্রাদ্ধের কুটনো কুটি।"
"হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা।"—ইত্যাদি। সেঁজুতি ব্রতের ছড়া।

মনের মানুষ :—

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দুইটি তরুণতরুণীর প্রেমকে অঙ্কুরোদ্গমেই কিভাবে বিনষ্ট করিয়াছে 'মনের মানুষ' মুলত তাহারই কাহিনী।

কুঞ্জর সহিত ইন্দুবালার প্রেম প্রাথমিক পর্যায়েই সমাপ্ত হইয়াছে। উভয়ের প্রেম পত্রালাপের মাধ্যমে যতটা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সাক্ষাৎ আলাপের সুযোগ ততটা হয় নাই। অপরিণত বয়সের উচ্ছ্বাসে তাহারা উভয়ে ঠিক করিয়াছিল—"পরস্পরকে না পাইলে তাহারা কেহই বাঁচিবে না, যদি উভয়ের মিল হয় ত উত্তম, যদি পিতামাতার দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবশতঃ ইহলোকে তাহাদের মিলন না হয় তবে তাহারা কুমার ও কুমারী ব্রত ধারণ করিয়া পরলোকে মিলনাশায় ইহজীবন যাপন করিবে।"[১] বলা বাহুল্য উভয়ের কেহই এই প্রতিজ্ঞা পুরণ করে নাই। পরবর্তীকালে কুঞ্জ ধনীকন্যাকে বিবাহ করা সম্ভব না হওয়ায় গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজ আশ্রিতা একটি গ্রাম্য বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। ইন্দুবালাও নিজ উপযুক্ত একটি শিক্ষিত এবং ধনী যুবককে বিবাহ করিয়াছে। বাল্যপ্রণয়ের ন্যায় কৈশোর প্রণয়েও বোধ করি অভিসম্পাৎ আছে। তাই প্রতাপ-শৈবলনী, অমরনাথ-লবঙ্গলতা, দেববাস-পার্বতীর ন্যায় কুঞ্জলাল-ইন্দুবালার প্রেমও বিবাহ বন্ধনে সফল হইতে পারিল না। কিন্তু বঙ্কিম শরতের নায়ক নায়িকাদের সহিত প্রভাতকুমারের নায়ক নায়িকার কত পার্থক্য। ইন্দুবালার প্রেমিকটি প্রণয়িণীর পিতা মাতার নিকট হইতে বাধা পাইয়া সে ব্যাপার একেবারে চুকিয়া গিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তিন চারি বৎসর এইভাবে কাটিয়াছে। কুঞ্জ ঔষধ ক্রয়ের জন্য মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসে। কিন্তু ভ্রমক্রমেও ইন্দুবালার খোঁজ লয় না। বলাবাহুল্য কুঞ্জ প্রতাপের ন্যায় আত্মদমন করিতেছিল না। 'রমা-সুন্দরী' উপন্যাসে প্রভাতকুমার বলিয়াছেন "যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নুতন, তাহার আকর্ষণ অল্প বয়সের মনে অত্যন্ত প্রবল······কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। তাহার অপেক্ষা আর একটি প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নুতন পথে ছুটিবে।"[২] কুঞ্জ-ইন্দুবালার প্রণয়ের মধ্যেও এই আকর্ষণই প্রধান। কন্যা কুঞ্জকে ভালবাসে শুনিয়া ডাঃ সরকার ভাবেন 'পনেরো বছরের মেয়ে, তাহার মতামতের মুল্যই বা কতটুকু? সংসারের কি জানে সে? ইহার পত্নী হইলে চিরদিন তাহাকে পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে হইবে, জন্মাবধি কলিকাতায় লালিতা পালিতা, বিদ্যুৎ পাখার নীচে শয়ন না করিলে ঘুম হয় না, পল্লীগ্রামে গিয়া সে কয়দিন বাঁচিবে?'[৩]

বাঙ্গলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতেও বাল্যবিবাহের জের চলিতেছিল। যে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেই সমাজে বিশেষত নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণনা প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। "বালিকার প্রেম, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মেয়ের পূর্বরাগ ও সব বঙ্কিমবাবুর গাঁজাখুরি।"[৪] তাই বঙ্কিমপরবর্তী যুগের লেখকগণ হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রাক্ বিবাহ প্রেম-বর্ণনার সুযোগ না পাইয়া ইঙ্গবঙ্গ, ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টানসমাজের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই বিষয়ে প্রভাতকুমারও ব্যতিক্রম নন। 'সিন্দূর-কৌটা' উপন্যাসে বিজয়ের প্রণয়িণী সুশী খ্রীষ্টান। 'যুবকের প্রেম' গল্পের অবৈধ প্রণয়িণীও খ্রীষ্টান, তদুপরি বিদেশিনী। 'মনের মানুষের' ইন্দুবালাও ইঙ্গবঙ্গ সমাজভুক্তা।

ইন্দুবালা অনেকটা 'প্রণয় পরিণাম' গল্পের মানিকলালের নারী সংস্করণ। ১৪ বৎসরের মানিক রাশি রাশি বাঙ্গলা উপন্যাস পাঠ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দুবালাও ইংরাজি বাঙ্গলা উপন্যাস ঘাঁটিয়া কুঞ্জকে প্রেমপত্র লিখিত। তাহার পর পিতার আদেশে উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেলে প্রথম প্রথম ইন্দুর কিছু কষ্ট হইত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জর স্মৃতি ম্লান হইতে থাকিল। পরে হঠাৎ একদিন কুঞ্জর সহিত কিরণকে দেখিয়া তাহার মনে নারীসুলভ কৌতূহল জাগিয়াছে। এই সাক্ষাতকারের বর্ণনায় লেখক পাঠকের মনে ভ্রম জন্মাইয়াছেন যে ইন্দুর কৈশোরপ্রেম ভাবালুতামাত্র নয় তাহার মুল বুঝি মনের গভীরে প্রসারিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। যাহাকে যে একবার 'শিকার' করিয়াছিল তাহার ক্ষতচিহ্ন কতটা বর্তমান তাহাই নিরীক্ষণ করাই যেন ইন্দুবালার ইচ্ছা। এইরূপ না হইলে ইন্দুবালা কিরণের জন্য মহৎ ত্যাগ করিয়াছে বলিতে হইবে। প্রভাতকুমার কাহাকেও দ্বিচারিণী করিয়া আঁকেন নাই। 'যুবকের প্রেমে'র এল্‌সি, 'হীরালালে'র নীরদা এবং 'সিন্দূর-কৌটা'র সুশীর কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা এইরূপ মন্তব্য করিতেছি—কারণ এই চরিত্রগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। তাই আমরা ধারণা করিতে পারি যে ইন্দুবালা যোগেন্দ্রনাথকেই ভালবাসিয়াছে এবং যোগেন্দ্রনাথই তাহার 'মনের মানুষ'। যতীন্দ্র সিংহও ইন্দুর নিকট আমল পায় নাই। নৌকাডুবি হইতে উদ্ধৃত, অসুস্থ যোগেন্দ্রর সেবার ভার ইন্দু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। রোগশয্যা বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক প্রেমের জন্ম দিয়াছে, অনেক প্রেমের জটিলতা উন্মোচন করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "বীরত্ব ও সাহস যেমন পুরুষের ধর্ম, করুণা, মমতা, সেবা, শুশ্রূষা তেমনি নারীর ধর্ম।..... সুতরাং কাব্য জগতে দেখা যায় যে কোমল-হৃদয়া নারী আহত বা পীড়িত পুরুষের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে তাহার প্রতি প্রণয়বতী হইতেছে, অর্থাৎ তাহার করুণা ঘনীভূত হইয়া প্রণয়ে রূপান্তরিত হইতেছে, পুরুষও কৃতজ্ঞতা-বশতঃ অনেকক্ষেত্রে তাহার প্রতিদান করিতেছে।"[৫] ইন্দুবালার হৃদয়েও যোগেন্দ্রনাথের

সেবাশুশ্রূষার ভিতর দিয়া অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য যোগেন্দ্র ইন্দুবালার প্রেমের কোন বর্ণাঢ্য চিত্র প্রভাতকুমার দেন নাই।

যোগেন্দ্রনাথ চরিত্রটির প্রতি লেখকের একটি স্মিত কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাস এবং বৈরাগ্যমার্গ সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা 'নবীনসন্ন্যাসী' উপন্যাস আলোচনাকালে করিয়াছি। তাহার পুনরুক্তি না করিয়া এখানে বলিতে পারি যে যোগেন্দ্রনাথও একজন 'নবীন সন্ন্যাসী'। মোহিতের ন্যায় তাহাকেও সন্ন্যাস হইতে সংসারে টানিয়া আনিয়াছে নারীর প্রেম।

'মনের মানুষে'র নায়ক কুঞ্জলাল। কুঞ্জলালের কার্যকলাপই পাঠকের হাসির উৎস। কুঞ্জ শহরে লেখাপড়া শিখিয়াছে, আলট্রামডার্ণ পরিবারের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, 'জাত' ব্যাপারটিকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জন করিতে শিখিয়াছে। এ হেন কুঞ্জলাল ভণ্ড জ্যোতিষীর নিকট করকোষ্ঠী গণাইয়া শুভাশুভ জানিতে যায়, স্বামী নিগমানন্দের নিকট অদৃশ্য হইবার ঔষধ খোঁজে, চোখে বনবিড়ালের রুধির হইতে প্রস্তুত অঞ্জন মাখে। সংসারে অবশ্য এইরূপ চরিত্র বিরল নয় যাহারা বাহিরে নিজেদের সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাঁচি টিক্‌টিকি সব মানে। নেটিব ডাক্তার কুঞ্জলালের চরিত্রের মধ্যেও এইরূপ পরস্পরবিরোধিতা বর্তমান। ইন্দুর প্রতি কুঞ্জর প্রেমের মধ্যেও কোন গভীরতা নাই। ইন্দু শিক্ষিতা এবং ধনীর দুলালী। কুঞ্জ নিজেকে তাহার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টা করে না, বরং দিবাস্বপ্ন দেখে যে উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় তাহার প্রণয়িণী ইন্দু তাহার বিরহে মরণশয্যা পাতিয়াছে। কুঞ্জর এইরূপ অসঙ্গত কল্পনাবিলাস পাঠকমনে কৌতুকের উদ্রেক করে। ইন্দুবালা কিরণকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলে কুঞ্জ কল্পনা করে ইন্দু যেন কিরণকে বলিতেছে—"ভগিনি, তুমি আমার জীবন দান কর। যাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে আমি স্বামী জ্ঞান……বল আমায় স্বামী দান করিবে কিনা?" কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির কথোপকথনের অনুকরণে কুঞ্জলালের এই কল্পনাবিলাস পাঠকমনে কৌতুকেরই সঞ্চার করে। কুঞ্জ চরিত্রের মধ্য দিয়া একজন কল্পনাবিলাসী গ্রাম্য যুবকের ছবিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, মার্জিত রুচি বলিষ্ঠ চিত্ত কোন প্রেমিক চরিত্র তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোধকরি লেখকের ইচ্ছানুসারেই এইরূপ হইয়াছে।

কাহিনীর মধ্যে একটি সুদীর্ঘ স্বপ্নের অবতারণা 'মনের মানুষ' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের উল্লেখ প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্প উপন্যাসেও আছে। এই প্রসঙ্গে 'নবীন সন্ন্যাসী'তে মোহিতের স্বপ্ন এবং 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসে

গিরিশের স্বপ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত দুইটি স্বপ্নই মনোবিজ্ঞানসম্মত।[৫] কিন্তু 'মনের মানুষে'র স্বপ্নটি লেখকের কল্পনাবিলাসের ক্রীড়াভূমি মাত্র। লেখক নায়কের জ্বরবিকারের সুযোগ লইয়া তাহার স্বপ্নের মাধ্যমে কয়েকটি ছোট ছোট কাহিনী বর্ণনা করিয়া লইয়াছেন—এইগুলির সুখপাঠ্যতার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিতে হয় যে মূল কাহিনীর কোন প্রয়োজন ইহারা সিদ্ধ করে নাই। 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীটি গিরিশদৃষ্ট স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু 'মনের মানুষে' কুঞ্জলালের স্বপ্নের কোন প্রয়োজনই কাহিনীর পক্ষে ছিল না। অথচ লেখক কুঞ্জর স্বপ্নটিকে উপন্যাসের অনেকখানি স্থান অধিকার করিতে দিয়াছেন।[৬] ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে হয়ত এইরূপ মন্তব্যই করিতে হয় যে ক্ষুদ্রকায় কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করা ছাড়া ইহা আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নাই।

॥ টীকা ॥

১। মনের মানুষ, পৃঃ ১২-১৩।
২। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩২১।
৩। 'মনের মানুষ', পৃঃ ১৬।
৪। 'প্রাইভেট টিউটর', 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' পৃঃ ৮১।
৫। 'প্রেমের কথা', পৃঃ ৬৩।
৬। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ (১৮৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)।

আরতি ঃ—

প্রভাতকুমারের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের ন্যায় 'আরতি'তেও দুইটি কাহিনী রহিয়াছে। নরেন্দ্র-আরতির জন্মকলঙ্কের জন্য পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অবশেষে সেই কলঙ্ক মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়া এই আখ্যানটি উপন্যাসে প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসের নামকরণের দিক হইতে বিচার করিলে, স্বামীর সহিত আরতির বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে মিলন—এই কাহিনীটিই লেখক পরিকল্পিত মুখ্য কাহিনী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে মুখ্য কাহিনী অপেক্ষা উপকাহিনীই প্রভাতকুমারের উপন্যাসে গুরুত্বলাভ করিয়াছে। 'আরতি'ও ব্যতিক্রম নয়। এই প্রসঙ্গে 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সত্যবালা', 'সুখের মিলন' ইত্যাদির নাম স্মরণীয়।

স্বামী যেরূপ চরিত্রেরই হউন না কেন, স্ত্রীর স্বামী ভক্তি তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না—অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। প্রভাতকুমারের স্ত্রী চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয়। আরতির স্বামী বিনোদ গণিকাসক্ত, স্ত্রীর প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু বিনোদ যখন ছুরিকাহত হইয়া ঘটনাচক্রে পরিত্যক্ত স্ত্রীর আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল তখন আরতি আদর্শ হিন্দু রমণীর ন্যায় সেবাযত্নে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। নিজ রক্ষিতা সম্পর্কে বিনোদের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। অতএব এখন যে স্ত্রীর প্রতি মুখ ফিরাইল। আরতির মনেও পূর্ব স্মৃতি কোন ক্ষোভের সঞ্চার করিল না। অতএব বিনোদ ও আরতির মনের মিল হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এইরূপ মিলনকে সার্থক মিলনরূপে গণ্য করা একটু কঠিন।

আরতির কাহিনীটি লেখকের 'বউচুরি' গল্পটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানে অনাথ ভালবাসিয়া বিবাহ হয় নাই বলিয়া মন্দান্দিনীকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিত না। এমন কি বিবাহ বিচ্ছেদ করিবে বলিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু পথে জরাক্রান্ত স্ত্রীকে সেবা করিতে গিয়া অনাথ স্ত্রীর প্রেমে পড়িয়া গেল এবং তখন আর স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকিল না। ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে যাহা সার্থকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে আরতি উপন্যাসের ঘটনাবহুল কাহিনীর মধ্যে তাহা খুব বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ।

আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি যে প্রভাতকুমার বিধবা বিবাহ সেইখানেই সমর্থন করিয়াছেন সেখানে পাত্রী নিতান্ত বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছে। আরতির মাতা বিধবা হইয়াছিলেন দশ বৎসর বয়সে এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই তিনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হন। হরেন্দ্রবাবুর সহিত পুনরায় বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ছিল সতের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'ধর্মের কল' গল্পের মনোরমা পনেরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে "কিন্তু মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও, কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতি শিশুবৎ শরীরের সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্যন্ত হয় নাই।"[১] দীর্ঘকাল স্বামীর ঘর করিয়া বিধবা হইয়াছে, এমন কোন বিধবার বিবাহ প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রভাতকুমার 'আরতি' উপন্যাসে বাঙ্গলা উপন্যাসে প্রেম বর্ণনার গতানুগতিকতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন—

"প্রচলিত প্রথা অনুসারে এই বৃদ্ধের গৃহে একটি মাতৃহীনা কন্যা বা দৌহিত্রী থাকা দরকার যাহার বয়স বৎসর তেরো চৌদ্দ, যাহার গায়ের রং ইঁদুরের মত পরিষ্কার, যে এই বয়সেই ইংরেজি বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের রসগ্রহণে সমর্থ এবং যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া যখন তখন রবিবাবুর গান বাজাইয়া থাকে। কিন্তু নরেন এমনই দুর্ভাগ্য যে, বৃদ্ধের সেরূপ কোন কন্যা বা দৌহিত্রী কিছুই নাই।"[২]

কিন্তু সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বৃদ্ধের দৌহিত্রী না থাকিলেও তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে একাদশবর্ষীয়া একটি মুখরা দৌহিত্রী ছিল এবং যথারীতি তাহার 'ফুটফুটে রং'। নরেনের সহিত এই বালিকাটির (প্রেম) আলাপ হইয়াছে এবং পরে বিবাহও হইয়াছে। অর্থাৎ প্রভাতকুমার তৎকালীন প্রচলিত বাঙ্গলা উপন্যাসের গতানুগতিকতাকে কটাক্ষ করিলেও নিজেও সেই পথকে একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই।

'অলকা' গল্পে ব্যবহৃত দুইটি কৌশল প্রভাতকুমার 'আরতি' উপন্যাসেও কাজে লাগাইয়াছেন। 'অলকা' গল্পে হেদুয়ার বাগানে সান্ধ্যভ্রমণকারী অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথ সরকারের সহিত বিনোদের পরিচয় হইয়াছে এবং পরে সে কেদারবাবুর কন্যা অলকাকে বিবাহ করিয়াছে। 'আরতি'তেও নরেন হেদুয়া বাগানেই রায় বাহাদুর দুর্গাচরণের সাক্ষাৎ পাইয়াছে এবং পরে তাঁহারই দৌহিত্রীকে বধূরূপে পাইয়াছে। নরেনের মা বাবার বিবাহের ঘটনাটি যেমন ২৬।২৭ বৎসরের পুরাতন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায়, 'অলকা'তেও তেমনই ২০ বৎসরের পুরাতন 'আর্য পত্রিকায়' প্রকাশিত সংবাদে কেদারবাবুর আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের কথা জানিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আন্তঃপ্রাদেশিক এবং বিধবা বিবাহ

প্রভাতকুমারের রচনায় স্থান পাইলেও অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ কোথাও নাই। তাই 'অলকা'য় দেখি কেদারবাবু এবং বিনোদ উভয়েই কায়স্থ এবং 'আরতি'তে—দুর্গাচরণবাবু এবং নরেন উভয়েই ব্রাহ্মণ।

'আরতি' উপন্যাসে ঘটনাগুলি খুব সুবিন্যস্ত নহে—প্রধান চরিত্রগুলির চিত্রণেও লেখক বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু কুচক্রী পঞ্চাননের চরিত্রটি জীবন্ত। এই শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে প্রভাতকুমার যে সিদ্ধহস্ত তাহার পরিচয় আমরা লেখকের অন্যান্য উপন্যাসেও পাইয়াছি।

॥ টীকা ॥

১। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৮৯।

২। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৪।

সত্যবালা :—

'সত্যবালা' উপন্যাসের আখ্যান ভাগ দুইটি অংশে বিভক্ত। কাহিনীর প্রথমাংশে কিশোরী, সত্যবালা এবং মল্লিক সাহেবকে লইয়া ত্রিভুজ প্রেমের যে জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ ছিল লেখক তাহা গ্রহণ করেন নাই। বরং একটি আকস্মিক ঘটনার সুযোগ লইয়া লেখক কাহিনীর নায়ক কিশোরীকে দার্জিলিং হইতে একেবারে তিব্বতে নির্বাসন দিয়াছেন। পটভূমি হইতে নায়কের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের প্রথমাংশে যবনিকাপাত ঘটে। কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে কিশোরী তিব্বতে পৌঁছিয়া একজন তিব্বতী কন্যার আশ্রয় লাভ করে। পরে সেই তিব্বতী কন্যা নিনাকে বিবাহ করিয়া কিশোরী তাহার পিতার সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। এদিকে সত্যবালা একনিষ্ঠ প্রেমিকার ন্যায় তাহার দয়িতের স্মৃতি সম্বল করিয়া জীবনযাপন করে। তিনটি সন্তানের পিতা হইবার পর কিশোরী জরবিকারে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে নিনাকে সে তাহার পুর্ব প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত করে এবং সত্যবালার সহিত যোগাযোগ করিতে বলে। নিনা কলিকাতায় আসিয়া সত্যবালার সহিত মিলিত হয়।

কাহিনীর নায়ক কিশোরী। সে দুইটি নারীর হৃদয় জয় করিয়াছে। কিন্তু কোন গুণে তাহা পাঠকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। হয়ত তাহার অসহায়ত্ব এবং অনাভিজাত্যই তাহাকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছে। সত্যবালার প্রতি কিশোরীর অকৃত্রিম অনুরাগ লেখক দেখাইয়াছেন। কিন্তু কিশোরী পুলিশের ভয়ে ভীত হইয়া প্রণয়িনীকে ফেলিয়া রাখিয়া তিব্বতে পাড়ি জমাইয়াছে। সেখানে গিয়া নিনাকে ভাল না বাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। সিন্দুর কৌটা উপন্যাসে আমরা দেখিয়াছি পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রভাতকুমার সমর্থন করিয়াছেন। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যবালা উপন্যাসেও ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়।

নর-নারীর প্রেমের বিশ্লেষণ প্রভাতকুমার কোথাও করেন নাই। কিশোরীর প্রেমিক রূপটি সুচিত্রিত হয় নাই। নিনার সহিত তাহার ব্যবহারের মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা যায়। কিশোরী একবার মনে মনে ভাবে "কেন রে বাপু তোদের স্বজাতির এত পুরুষ থাকিতে এই গরীব বাঙ্গালী কায়স্থ সন্তানের উপরেই তোর মন পড়িল কেন?" আবার অন্যত্র আছে—"আমি ত উহাকে ভালবাসিতে পারিব না, আমি যে অন্যের। তাছাড়া……বাঙ্গালীর পক্ষে তিব্বতী মেয়েকে ভালবাসা কি সম্ভব?" কিন্তু নিনার

একটি সখা আছে শুনিয়াই কিশোরীর মুখখানি গম্ভীর হইল। সে ধরা গলায় বলিল "তোমার সেই সখাটি কে? নাম শুনিতে পাই না?" অথচ লেখক এরূপ কোন বর্ণনা দেন নাই যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারে যে কিশোরীর মন ধীরে ধীরে নিনার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কিশোরী নিনার অতুল অর্থের সন্ধান পাইয়াছে। প্রভূত অর্থ, অনায়াস জীবন, হয়ত কিশোরীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। কিন্তু নিনার নিকট পূর্ব বৃত্তান্ত গোপন করায় কিশোরীর চরিত্রের কুটিলতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যবালার এবং নিনার প্রেমকে সে চন্দ্র এবং মাটির প্রদীপের সহিত তুলনা করিয়াছে।[১] সুতরাং ধরিয়া লইতে হয় নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে নিনাকে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু লেখক কিশোরীকে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন কুটিল স্বভাবের ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করেন নাই। একটি সহানুভূতিসম্পন্ন, কোমল হৃদয়, কিন্তু ভাগ্যহত যুবকরূপেই লেখক তাহাকে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। ফলে তাহার চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সত্যবালার চরিত্রটি ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের অন্যান্য কুমারী চরিত্রগুলির ন্যায় সত্যবালাও একনিষ্ঠ প্রেমিকা। 'মাতৃহীন' গল্পের বিদেশিনী নায়িকার ন্যায় সে আজীবন তাহার প্রেমিকের স্মৃতি পুজায় কাটাইয়াছে।

'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের নায়ক কাশ্মীর গিয়াছে—সত্যবালার নায়ক তিব্বত গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সেখানকার মেয়েকে বিবাহ পর্যন্ত করিয়াছে। কাশ্মীরের বর্ণনা লেখক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। তিব্বতের বর্ণনাতেও লেখক শরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত মানচিত্র সম্বলিত "লাসা ও মধ্যতিব্বত ভ্রমণ" শীর্ষক গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কারণ লেখক স্বয়ং তাঁহার উপন্যাসে এই গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

॥ টীকা ॥

১। একটি যেন আকাশের চন্দ্র—অপরটি যেন মাটির প্রদীপ। প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ। পৃঃ ২০।

২। দ্রঃ 'সত্যবালা', দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৯৩।

সুখের মিলন :—

'সুখের মিলন' উপন্যাসের কথাবস্তুতে দুইটি কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে। শান্তি এবং উষার প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনীটিই মূল কাহিনী। কিন্তু হ্যারি বনার্জি, বেলা ও জেমসের উপকাহিনীই উপন্যাসে চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পাশে শান্তি উষার প্রেম চিত্রটি ম্লান ও বিবর্ণ। মূল কাহিনী অপেক্ষা উপকাহিনীর প্রাধান্য প্রভাতকুমারের উপন্যাসের একটি সাধারণ ত্রুটি। 'নবীন সন্ন্যাসী', 'আরতি', 'সত্যবালা' ইত্যাদি উপন্যাস তাহার উদাহরণ।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে হ্যারি বনার্জির জীবনেতিহাস একটু বিচিত্র ধরণের। আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি দেশত্যাগী এবং সমাজত্যাগী। যৌবনে খ্রীষ্টানী মতে খ্রীষ্টান কন্যাকে বিবাহ করিবার ফলে ইনি ত্যাজ্যপুত্র হন। কিন্তু সরকারী চাকুরী সূত্রে বর্মা গিয়া প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তিনি মির্জাপুরে বসবাস করিতে থাকেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন বিবাহ করেন নাই। কিন্তু যোসেফ চক্রবর্তীর অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা বেলিণ্ডা বা বেলাকে দেখিয়া তাঁহার মনে দ্বিতীয় সংসার করিবার বাসনা জাগিল।[১] বেলা হ্যারির ধনবত্তার কথা অবগত ছিল—অতএব বিবাহে আপত্তি করিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ছিল জেমস খোসলা। অতএব বিবাহের অল্পদিন পরেই বিবাহবিচ্ছেদ হইল এবং বেলা জেমসকে বিবাহ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিল। প্রতারিত বনার্জি যে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিতেছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহারই পাতা ফাঁদে পা দিয়া বেলা ও জেমসও মৃত্যুবরণ করিল। প্রভাতকুমারের অন্য কোনও উপন্যাসে এইরূপ ভয়াবহ পরিণতি চিত্রিত হয় নাই। কাহিনীটিতে গাঙ্গুলী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় "অতি ভয়ানক। খোসলা বেলা মহা অন্যায় করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু মনে হয় তাদের শাস্তিটা বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়াছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'কুকুরের উপযুক্ত মুগুর' শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে মৃত্যুফাঁদ রচনার পরিকল্পনাটি যে একদা বিখ্যাত ইংরাজি রহস্যোপন্যাস-লেখক ফার্গাস হিউমের রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রভাতকুমার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।[২]

শান্তি উপন্যাসের নায়ক, কিন্তু তাহার চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয় নাই। হ্যারি বনার্জি এবং বেলার চরিত্র সুচিত্রিত। আয়া রোজিনার ভূমিকাও বেশ প্রাণবন্ত। 'সুখের মিলন'

উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য তাহার রহস্যময়তা। গল্পের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত লেখক ডিটেকটিভ গল্পের ন্যায় ঔৎসুক্য বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য যেটি উপন্যাসের মুল কাহিনী সেটি নিতান্তই গতানুগতিক প্রেমের কাহিনী। শান্তি উষার 'সুখের মিলন' হইল কি না হইল তাহার সম্পর্কে পাঠকের কোন ঔৎসুক্য থাকে না। হ্যারি বনার্জির চিত্তাকর্ষক কাহিনীটির পক্ষে শান্তির কাহিনীটি অপরিহার্যও নয়। একমাত্র উপন্যাসের নামটি সার্থক করা ছাড়া তাহার অন্য কোন আবশ্যকতা নাই।

॥ টীকা ॥

১। তুঃ জীবনের মূল্য।

২। ফার্গাস হিউম্ (১৮৫৯-১৯৩২) প্রথম জীবনে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে থিয়েটার ম্যানেজারদের সহযোগিতা না পাইয়া তিনি উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত হন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার একদা বিখ্যাত রহস্যোপন্যাস "The Mystry of a Hansom Cab" প্রকাশিত হয় এবং লেখকের মৃত্যুকালাবধি গ্রন্থটির ৫০০,০০০ কপি বিক্রীত হইয়াছিল। গ্রন্থটির সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া লেখক পর পর ১৪০ খানি ডিটেকটিভ্ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই প্রথম রচনাটির সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করিতে পারে নাই।

সতীর পতি ঃ—

'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসটি আলোচনাকালে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র সহিত ইহার তুলনা করিয়াছিলাম। 'সতীর পতি' উপন্যাসটিও অনুরূপভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত তুলনীয়। সতী সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হওয়া এবং তাহার দুঃখকর পরিণতিই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র পরিণতি ছাড়া 'সতীর পতি' উপন্যাসেরও বিষয় তাহাই। পরিণতি যে ভিন্ন হইয়াছে তাহার কারণ প্রভাতকুমারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

'সতীর পতি'র নায়ক হীরালাল অবশ্য গোবিন্দলালের ন্যায় ধনী নয় বরং চাকুরী প্রার্থী বেকার গ্রাম্য যুবক। চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় গিয়া সে ঘটনাচক্রে রঙ্গালয় জগতের অদ্বিতীয়া গায়িকা ও 'নাচিকা' রেবতী সুন্দরীর সহিত পরিচিত হইল। পরিচয় হইতে মোহ, মোহ হইতে প্রেম জন্মিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী বিধবা, প্রভাতকুমারের নায়িকা বহুভোগ্যা নটী। নটী হইলেও তাহার অন্তরের সম্পদ অন্য কোন সতী সাধ্বী রমণী অপেক্ষা কম নহে। রেবতী প্রেমের এবং প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্যই নিজেকে দুরে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর সমাপ্তিতে রেবতীর এইরূপ মহৎ ত্যাগ অনেকটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহার পুর্ব ব্যবহারের সহিত পরের ব্যবহারের খুব একটা সঙ্গতি নাই। লেখকের মনে কাহিনীর প্লটটি নিশ্ছিদ্রভাবে দানা বাঁধিতে পারে নাই। উপন্যাসের নামকরণের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয়। 'সতীর পতি' নামটি শুনিলে মনে হয় কোন সতী নারীর সতীত্বের তেজ প্রদর্শনই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা কতদুর সার্থক হইয়াছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাহিনীর প্রথমাংশে লেখক হীরালাল-পত্নী সুরবালার মধ্যে তথাকথিত সতীত্বই দেখাইয়াছেন। সুরবালা এমনই পতিপ্রাণা সতী যে যাত্রার আসরে স্ত্রীবেশধারী পুরুষও তাহার স্বামীকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলে সেই দৃশ্য চোখে দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এহেন স্ত্রীকে ভুলিয়া হীরালাল প্রেমে পড়িয়া গেল থিয়েটারের নটী রেবতীর এবং তাহাকে লইয়া অবসর বিনোদনের জন্য দার্জিলিঙ্গে পাড়ি জমাইল। হীরালালের বন্ধুকে লেখক আখ্যা দিয়াছেন 'নব নিশাকর'। অর্থাৎ লেখক এখানে জ্ঞাতসারেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কথা স্মরণ করিয়াছেন। নিশাকরের ন্যায় বিপিনও হীরালালকে রেবতীর হাত হইতে হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছে এবং হীরালালের পত্নীকে আশ্বাস দিয়াছে যে যথার্থ পতিব্রতা নারীর স্বামীকে কোন রাক্ষসীই হজম করিতে পারিবে না। কাহিনী এই পর্যন্ত বঙ্কিমানুসারী—এমন কি রেবতীর নামকরণে বঙ্কিমপ্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু ইহার পর হইতে কাহিনী প্রভাতকুমারের নিজস্ব পথে পরিচালিত হইয়াছে।

প্রভাতকুমার তাহার কাহিনীতে বঙ্কিমের ন্যায় পাপের পরিণাম অথবা রূপজ মোহের ফলে সুখের সংসারের ধ্বংস দেখাইতে চাহেন নাই। তাঁহার সুরবালাও ভ্রমরের ন্যায় দর্পিতা অভিমানিনী নয়। ভ্রমর গোবিন্দলালের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন নাই, ব্যভিচারী স্বামীর সহিত একত্র বাস তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সুরবালা মাটির মানুষ। স্বামীর পদস্খলনের সংবাদে সে কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইবার কথা শুধু চিন্তা করে। কাহিনীর সমাপ্তিতে তাহার স্বামীটি ঘরে ফিরিয়াছে বটে, তবে তাহার সতীত্বের তেজের জোরে নহে, বরং রেবতীর দয়ার দান হিসাবেই সে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে 'সতীর পতি' নামটি খুব সার্থক হয় নাই। উপন্যাস হিসাবেও 'সতীর পতি' উল্লেখযোগ্য নয়। বারাঙ্গনার প্রেমকে লেখক সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, প্রশ্ন করিয়াছেন—"ফুল কি শুধু বাগানেই ফোটে? বাগানেও ফোটে, শ্মশানেও ফোটে। রেবতীর হৃদয়ে এই যে ভাব—ইহাও প্রেম এবং খাঁটি প্রেম।" এখানে লেখক সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন এবং এ বিষয়ে সমসাময়িক অন্য একজন ঔপন্যাসিকের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয় কিন্তু দুঃখের বিষয় রেবতীর চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয় নাই। মনে হয় লেখক যাহা চাহিয়াছেন সে তাহাই করিয়াছে। হীরালাল এবং তাহার বন্ধু বিপিনবাবুর চরিত্র দুইটিও সঙ্গতিপূর্ণ নহে। বিপিনবাবু গ্রামের জমিদার, কাহিনীর প্রথমাংশে লেখক তাহার চরিত্রে জমিদারোচিত গাম্ভীর্য আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু 'নবনিশাকর' রূপে সে যেভাবে হীরালাল ও রেবতীর সহিত দাদা-বৌদি সম্পর্ক পাতাইয়াছে তাহাতে তাহার কোন গাম্ভীর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। হীরালালের চরিত্রটিও বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। গ্রাম্য যুবক হীরালাল গ্রামের স্কুল হইতে দুইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এইরূপ চরিত্রের মুখে 'একেই বলে **from sublime to the rediculous**' ইত্যাদি উক্তি অসম্ভব না হইলেও তাহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উপন্যাসে একটি দুর্ধর্ষ গুণ্ডার ভূমিকা আছে। কিন্তু লেখক তাহার ভয়াবহ চিত্র আঁকিতে গিয়াও আঁকিতে পারেন নাই। ঠনঠনে কালীর জিভ ছিঁড়িয়া কুত্তা দিয়া খাওয়াইতে চায় যে গুণ্ডা সে রেবতীকে নিজের হাতে পাইয়াও দাড়িটি ধরিয়া সাদরে একবার নাড়িয়া দিয়াছে মাত্র। এই করিম গুণ্ডার হৃদয়েও লেখক সুগভীর প্রেমের জন্ম দিয়াছেন, কিন্তু প্লেটোনিক প্রেমের মাহাত্ম্য একটি অশিক্ষিত গুণ্ডা কিভাবে বুঝিল তাহা বোঝা ভার। মোট কথা করিম গুণ্ডার গুণ্ডারূপটি খুব সার্থকরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র চরিত্র রমেশ—তাহার মাতালরূপটি অতি অল্প পরিসরে লেখক বাস্তবোচিত করিয়া চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন।

প্রতিমা :—

একজন শিক্ষিতা, সুন্দরী, আধুনিকা তরুণীর জীবনের একটি ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া 'প্রতিমা'র কাহিনী গঠিত হইয়াছে। রচনাটি উপন্যাস নামে প্রকাশিত হইলেও মনে হয় ইহাকে বড় গল্প আখ্যা দেওয়াই ঠিক হইবে। উপন্যাসোচিত বিস্তৃতি অথবা চরিত্রচিত্রণ ইহাতে নাই। সমসাময়িক যুগের শিক্ষিতা তরুণীর স্বাধীনচিত্ততার উপর আলোকপাত করিয়াছে বলিয়া কাহিনীটির কিছু গুরুত্ব আছে।

কলেরায় মাতা-পিতার মৃত্যু হওয়ায় অসহায়া প্রতিমা দুর সম্পর্কের আত্মীয় ভৈরব চক্রবর্তীর আশ্রয় পাইল। ভৈরব তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রর সহিত প্রতিমার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। সুরেন্দ্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাত প্রবাসী। প্রতিমা এবং সুরেন্দ্র উভয়েই উভয়ের ফোটো দেখিয়া বিবাহে সম্মত হইল। কিন্তু গোল বাধাইল ভৈরবের বিপত্নীক মধ্যম পুত্র খগেন্দ্র। খগেন্দ্র জিদ ধরিয়া বসিল যে সেই প্রতিমাকে বিবাহ করিবে। পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে ভৈরববাবুও সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রতিমা একবার মনে মনে সুরেন্দ্রকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে বলিয়া এই নুতন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে ভৈরববাবু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিমার অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিলেন। প্রতিমা নিজ কলেজের সহপাঠিনীর গৃহে আশ্রয় লইল এবং সেখান হইতে সুরেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করিয়া ভৈরববাবুর মত পরিবর্তন করাইল। ভৈরববাবু প্রতিমাকে সুরেন্দ্রের ভাবী বধু হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। খগেন্দ্র রাগ করিয়া বর্মা চলিয়া গেল এবং সেখানে বর্মী মেয়েকে বিবাহ করিল।

খগেন্দ্র চরিত্রটি খল স্বভাবের। সে মদ্যপান করে, নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত করে এবং মিথ্যা ভাষণে পটু। সে কৌশল করিয়া প্রতিমাকে তাহার কলেজ হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে এক নির্জন বাগান বাটীতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ একটি নষ্ট চরিত্রের যুবক প্রতিমাকে হাতে পাইয়া তাহার সম্ভ্রমহানির বিন্দুমাত্র চেষ্টা ত করেই নাই বরং অনুনয় বিনয় করিয়া প্রতিমার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে চরিত্রটি খুব বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই।[১]

'প্রতিমা'র নায়িকা প্রতিমা। নায়ক নাই। লেখক প্রতিমার চরিত্র এবং তাহার জীবনের ঘটনার উপরই আলোকপাত করিয়াছেন। এই কারণেই উপন্যাসটির নামও 'প্রতিমা'র নামে। প্রতিমার চরিত্রটির মধ্যে তৎকালীন আদর্শে কিছুটা আধুনিকতার স্পর্শ লাগিয়াছে।

॥ টীকা ॥

১। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের গোপীবাবু

গরীব স্বামী :—

একজন যুবকের পত্নী নির্বাচনের উদ্‌ভট খেয়ালের উপর ভিত্তি করিয়া 'গরীব স্বামী' উপন্যাসের কাহিনী গঠিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু ধনী জমিদার, বয়স তাঁহার ত্রিশ বৎসর। তিনি সাইকেলে চড়িয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান—উদ্দেশ্য একটি দশ এগার বৎসরের বালিকা সংগ্রহ করা। বালিকাটি দূরে কোন শিক্ষা শিবিরে প্রেরিত হইবে এবং সেখানে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষিকার সাহায্যে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। বালিকাটি যৌবনে পদার্পণ করিলে দেবেন্দ্রবাবু তাহাকে বিবাহ করিবেন। ধনী ব্যক্তি যাহাদের কোন কাজ থাকে না তাহাদের মস্তিষ্কে নানারূপ উদ্‌ভট খেয়াল জাগিয়া থাকে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ধনী হইলেও ঠিক সেই প্রকৃতির ব্যক্তি নহেন। যে আমলে অনধিক কুড়ি বৎসরের মধ্যেই পুরুষের বিবাহ হইয়া যাইত সেই আমলে তিনি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত। অতএব পাত্রী নির্বাচনের এই অদ্ভুত প্রণালীটি চঞ্চলমতি ধনী যুবকের সাময়িক খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অথচ এইরূপ ব্যাপারকে বিশ্বাস করাও একটু কঠিন। প্রভাতকুমার এই ক্ষেত্রে কল্পনার রাশ শিথিল করিয়া দিয়াছেন—বাস্তব অবাস্তবের ধার ধারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনেও শঙ্কা ছিল। তাই কাহিনীর নায়িকা ঊষার পিতার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "এমন ব্যাপার বেদে নাই—কোরানে নাই।"[১] এবং 'এমন জাঁকাড়ে বিয়ের কথা আমার চোদ্দ পুরুষেও শোনেনি বাবা'।[২]

দেবেন্দ্র পরিকল্পিত পাত্রীর শিক্ষাপ্রণালীটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'কে অনুসরণ করিয়াছে। ভবানী পাঠক প্রফুল্লরূপ ইস্পাৎকে সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছেন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুরও কেন ইস্পাতের প্রয়োজন হইল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক দেবেন্দ্রবাবু ইস্পাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইস্পাৎটি মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বালিকা কন্যা ঊষা। ঊষা যথারীতি দার্জিলিং-এ শিক্ষাশিবিরেও প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু ইস্পাৎ তরবারিতে রূপান্তরিত হইয়া কোপটি দেবেন্দ্রবাবুর ঘাড়েই বসাইয়াছে। দেবেন্দ্রর অকাতরে অর্থব্যয়ের ফলে গ্রাম্য বালিকা ঊষার যখন নবজন্ম হইল তখন তাহার নূতন চেতনায় দেবেন্দ্রবাবুকে আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হইল না। তখন তাহার মন জুড়িয়া বসিল

উদীয়মান ব্যারিস্টার চারু ব্যানার্জি। বলা বাহুল্য চারুই হইলেন উষার গরীব স্বামী। চারুর উপার্জন এমন কিছু মন্দ ছিল না যাহাতে তাহাকে গরীব বলা যাইতে পারে। কিন্তু অমিত ধনশালী দেবেন্দ্রবাবুর তুলনায় সে গরীব সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রবাবু আশাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, বরং উদারতার তুঙ্গে আরোহণ করিয়া উষাকে দার্জিলিং-এর একখানি বাড়ী এবং নগদ দশহাজার টাকা যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য দেবেন্দ্রকেও নিসঃঙ্গ জীবনযাপন করিতে হয় নাই। তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে একজন হিন্দুধর্মানুরাগিনী মার্কিনী মহিলাকে লইয়া আসিয়াছেন এবং যথারীতি তাহাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। প্রভাতকুমার পারতপক্ষে তাঁহার সৃষ্ট পাত্রপাত্রীদের অসুখী রাখিতে চাহিতেন না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু 'গরীব স্বামী' উপন্যাসে লীলা কাব্যে উপেক্ষিতার ন্যায় অবহেলিত থাকিয়া গিয়াছে। উষার শিক্ষিকা লীলা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুগায়িকা তরুণী। অথচ লেখক তাহার জন্য একটি সুপাত্র জুটাইলেন না।

চারুর চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক। অন্তত দেবেন্দ্র অপেক্ষা তাহার সহিতই উষার ম্যাচিংটি ভাল হইয়াছে তাহা পাঠককে স্বীকার করিতে হইবে। দেবেন্দ্রর চরিত্রের মধ্যে প্রবীণতা, গাম্ভীর্য এবং স্থৈর্য আছে। এই জন্যই মনোনীত পাত্রী হাতছাড়া হইয়া গেলেও তিনি কাতর হইয়া পড়েন নাই। বিপরীত পক্ষে চারু উষাকে দেবেন্দ্রর মনোনীতা শুনিয়াই অধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে এবং তাহার চাঞ্চল্যই উষার সহিত তাহার মিলনকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। দেবেন্দ্র তাহার অমিত বিষয় সম্পদ, অগাধ পাণ্ডিত্য, সুউচ্চ মহত্ত্ব লইয়াও রমণীর মন জয়ে ব্যর্থ হইয়াছে এবং ঐ তিনটির কোনটি না থাকিলেও চারুর গলায় বরমাল্য দুলিয়াছে।

উপন্যাসটিতে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। তাহাদের বেশ-বাস, আদব কায়দা, পার্টি এমনকি বিলাতী কায়দায় প্রেম নিবেদনের চিত্রও আলোচ্য উপন্যাসে বর্তমান। এইদিক দিয়া উপন্যাসটির কিঞ্চিৎ মুল্য আছে। অন্যথায় অবাস্তব, অতিমাত্রায় রোমান্টিক, রূপকথাধর্মী কাহিনীটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা হয়।

॥ টীকা ॥

১। **গরীব স্বামী**, পৃঃ ৩৮।

২। ঐ, পৃঃ ৫৬।

নবদুর্গা :—

একটি সত্যঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রভাতকুমারের 'নবদুর্গা' উপন্যাসটির কাহিনী রচিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনাটি নিম্নরূপ—

জনৈক নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী এলোকেশী তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজ মাধব গিরির সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। নবীন তাহা জানিতে পারিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু মোহন্তের চক্রান্তে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নবীন ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে স্বহস্তে দাও দিয়া কাটিয়া হত্যা করে এবং স্বয়ং পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বিচারে নবীনের দ্বীপান্তর এবং মোহন্তের তিন বৎসরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।[১]

উপরোক্ত ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় অসংখ্য নাটক, প্রহসন এবং কাহিনী রচিত হইয়াছিল।[২] প্রভাতকুমারের 'নবদুর্গা'র কাহিনীর উৎসও এই ঘটনাটি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কাহিনীতে তারকেশ্বর হইয়াছে কেদারেশ্বর এবং মোহন্ত মাধবগিরি হইয়াছে অম্বিকাপুরী। তাছাড়া মুল ঘটনাটিকে তিনি নিজ রুচি অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তনও করিয়াছেন। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রভাতকুমারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক ব্যভিচারের চিত্রাঙ্কনে অরুচি এবং সুখান্তক পরিণতির প্রতি প্রবণতার ফলে প্রভাতকুমার মুল ঘটনাটি হুবহু অনুসরণ করেন নাই। উপন্যাস রচনার পক্ষে সর্বদা ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণ বাধ্যতামুলক নয়। প্রভাতকুমার তাঁহার কাহিনীর নায়িকা নবদুর্গার দেহকে মোহন্তের পাপস্পর্শে কলুষিত হইতে দেন নাই।

ইন্দ্রিয়পরবশ মোহন্ত মহারাজের চরিত্রটি সুচিত্রিত। সাধুসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রভাতকুমারের কিঞ্চিৎ বিরূপতার পরিচয় আমরা অন্যত্রও পাইয়াছি। মোহন্ত জীবনের অন্ধকারময় দিকের পরিচয় 'রত্নদীপ' উপন্যাসে ভবেন্দ্রর জীবনচরিতের মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র 'নবদুর্গা' ছাড়া এরূপ লম্পট সন্ন্যাসীর চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে গুরুদেবের পদস্খলন দেখান হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেব লম্পট নহেন।

কাহিনীর নায়িকা নবদুর্গা। তাহারই জীবনের ঘটনা লইয়া উপন্যাসের কাহিনী গঠিত। অধরচন্দ্রের সহিত নবদুর্গার মিলনের মধ্য দিয়া লেখক কাহিনীটিকে সুখান্তক

পরিণতিদান করিয়াছেন। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে উপন্যাসের নামকরণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু নায়িকা হইলেও নবদুর্গার চরিত্রটি একেবারেই নিষ্ক্রিয়। কাহিনীর সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহার চরিত্রে কোন গতিশীলতা লক্ষিত হয় না। অথচ পার্শ্বচরিত্র প্রভা অতি অল্প পরিসরের মধ্যে তাহার চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লইয়া সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

নবদুর্গার মূল কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। একদিকে কন্যা বিবাহসমস্যা অন্য দিকে নৈতিক ব্যভিচার কাহিনীর বিষয়। কিন্তু প্রভাতকুমারের অন্যান্য রচনার ন্যায় ইহাতেও একটি মৃদু হাস্য রসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। প্রভাতকুমারের হাস্যরস এইক্ষেত্রে 'শঠে শাঠ্যং' নীতিকে অনুসরণ করিয়াছে। অধরচন্দ্র যেভাবে মোহন্তের কাছ হইতে দশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছে এবং কথার খেলাপ করিয়া নবদুর্গাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, অথবা প্রভাবতী যেভাবে সম্মার্জনীর আঘাতে মোহন্তের বিষ ঝাড়িয়া দিয়াছে তাহাতে পাঠক পুলকিত হইয়া উঠে। অথচ অধর এবং প্রভাবতী দুইজনের কেহই ধোয়া তুলসীপাতাটি নহে। অধরচন্দ্র তহবিল তছরূপ করিয়াছে, মোহন্তের নিকট দশহাজার টাকায় নিজ স্ত্রীর স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছে এবং এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা পরিচয় দিয়া নবদুর্গার পানিগ্রহণ করিয়াছে। প্রভাবতী বিবাহিতা, কিন্তু স্বামীর ঘর করে না—সে একটু অন্য রকমের মেয়ে। প্রয়োজন হইলে নিজ রূপ যৌবন ভাঙ্গাইয়া কার্যসিদ্ধি করিতে তাহার বাধে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহাদের এই সকল চারিত্রিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের রচনার গুণে ইহাদের প্রতি পাঠকের মনে কোন অপ্রসন্নতা জাগে না। বরং যে ভালমানুষি নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না তাহার তুলনায় অধরের প্রতারকমূর্তি এবং প্রভার বীরাঙ্গনামূর্তি পাঠকের নিকট অধিকতর মনোগ্রাহী হইয়া উঠে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে একটি করিয়া ষড়যন্ত্রকুশল চরিত্র যেন অপরিহার্য। 'নবদুর্গা'র মানিক ঘোষ এইরূপ চরিত্র। সে যেন 'নবীনসন্ন্যাসী'র গদাই পালের ছোট ভাই। গদাই পালের ন্যায় সে কুটবুদ্ধিসম্পন্ন, মিথ্যাভাষণে পটু এবং মোহন্তের সর্বপ্রকার কুকর্মের সাহায্যকারী। কিন্তু চরিত্রটি গদাই পালের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'নবদুর্গা'র কাহিনীটি সুখপাঠ্য হইলেও উপন্যাস হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

॥ টীকা ॥

১। দ্রঃ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, পৃঃ ৩৫৯।

২। দ্রঃ বা, সা, ই, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৩২০।

প্রভাত-সাহিত্যে সমাজচিত্র

প্রভাতকুমারের সাহিত্যে বিশেষ করিয়া তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে সমসাময়িক সমাজের মূল্যবান চিত্র রহিয়াছে। আমাদের সমাজব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। পরিবর্তিত সমাজের বুকে বিচরণশীল ভবিষ্যৎ পাঠক প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক সামাজিক রীতিনীতির সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রভাতকুমার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিবার পর তিনি বিলাত ফেরত সমাজের সহিত পরিচিত হইলেন। বিলাত ফেরত সমাজ বলিয়া পৃথক কোন সমাজ আজ আর আমাদের দেশে নাই, কিন্তু সেযুগে ছিল। আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, বিলাতও তাহার সেই সুউচ্চ মর্যাদা হারাইয়াছে। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনই স্থান পাইয়াছে বিলাত ফেরত বা তাহাদের অনুকারী ইঙ্গবঙ্গ সমাজ।

বিলাত ফেরত ও তাহাদের অনুকারী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, 'বাপ কী বেটি', 'বিলাত ফেরতের বিপদ', 'প্রত্যাবর্তন', 'লেডি ডাক্তার', 'ছদ্মনাম', 'ঢাকার বাঙ্গাল', 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স' ইত্যাদি গল্পে এবং 'সত্যবালা', 'গরীব স্বামী', 'সুখের মিলন', 'মনের মানুষ' ইত্যাদি উপন্যাসে।

মদ্যপান ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই সমাজের মেয়েরাও কখনও কখনও মদ্যপান করিয়া থাকেন। "শ্যাম্পেন আসিল সুকুমারী এক গ্লাসের বেশি গ্রহণ করিল না।"[১]

পুরাপুরি সাহেবি স্টাইলে চলিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং 'বাপ কী বেটি' গল্পের লাহিড়ী সাহেব মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন—

"একটা বাসন মাজা জল তোলা চাকর এবং একটা বেয়ারা আছে। ঝিকে ঘাঘরা পরাইয়া তাহাকে আয়া বানাইয়াছেন। বাবুর্চি আছে, কিন্তু রাঁধে সে দিনের বেলায়, ভাত দাল 'ছেঁচকি কারি', 'মাছের ঝোল'—বাঙ্গালীর খাদ্য সবই রাঁধে তবে সব ব্যঞ্জনেই পেঁয়াজ দেয়, মায় মাছের ঝোলে পর্যন্ত"।[২]

বিলাত ফেরত সমাজের অনুকরণকারীদের একটি উপভোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় 'লেডি ডাক্তার' গল্পে। সত্যেন্দ্রনাথ একজন সাহেবী ভাবাপন্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট "তাহার

খানসামা খলিল মিঞা মুর্গী রাঁধিয়া আনে এবং টেবিলের উপর ছুরি কাঁটা চামচ দিয়া খানা সাজাইয়া দেয়।" সুবলার পত্রখানি বাঙ্গলায় লিখিত বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে "তবে খামের ঠিকানা দেখিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। উহাতে 'বাবু' লেখা নাই, 'এস্কোয়ার' লেখা আছে।"৩

'বিলাত ফেরতের বিপদ' গল্প হইতে জানিতে পারা যায়, 'সধবা স্ত্রী লোককে স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে লেখাই নিয়ম। আমাদের দেশের সধবারাও মিসেস্ সরোজিনী গুপ্ত, মিসেস্ প্রভাবতী ঘোষ ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভুল।'

পূর্ব্বোক্ত 'লেডি ডাক্তার' গল্পে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতি প্রভাতকুমারের মৃদু কটাক্ষ পরম উপভোগ্য হইয়াছে—

"পাইপ মুখে করিলে ইংরাজি কাপড় পরা বাঙ্গালীকে সাহেবের মত না হউক অন্ততঃ ফিরিঙ্গির মত দেখায়। তুমি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান যতই কেন ইংরাজি কাপড় পর না, তোমার মুখের লালিত্যটুকু, বুদ্ধি ও সৌজন্যের আভাটুকু তোমার বাঙ্গালীত্ব ধরাইয়া দিবে, কিন্তু পাইপটি দাঁতের মধ্যে চাপিলেই মুখভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে উহারই মধ্যে একটু কাঠখোট্টা গোছ দেখায়, মনে হয় অত্যল্প কারণেই হয়ত এ ড্যাম্ বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিবে।"৪

'প্রত্যাবর্তন' গল্পটিতে হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সমাজের যুগ্মচিত্র রহিয়াছে। স্বধর্মিগণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া রামনিধি খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ করিবে স্থির করিল এবং চাঁদনীর বাজার হইতে সাহেবী পোষাক কিনিয়া পরিল। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন "আর তিনি ঘৃণিত, দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত ধোঁপা নহেন এখন তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে গাড়ী থামিতেই দরওয়ান তাহাকে লম্বা সেলাম করিল। ভৃত্যগণ আসিয়া তাহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট শয়ন কক্ষে স্থান দান করিল।"৫

কিন্তু ইংরাজি পোষাক পরিয়া সম্মান শুধু দেশীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতেই মেলে ইউরোপীয় সমাজ এই বিলাতী ময়ূরপুচ্ছধারীদের দাঁড়কাকের অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে নারাজ। এই গল্পটিতেই খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যেও জাতিভেদের অনাবৃত রূপটি লেখক প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

রামনিধি বলিল—'বৎসরে একদিন মাত্র? অন্যসময় য়ুরোপীয় গির্জায় দেশীয় খ্রীষ্টান-গণের কি প্রবেশ নিষিদ্ধ? কথাটা বড় রূঢ় শোনাইল। মহান্তি পরিবারের মুখ যেন অন্ধকার হইল। মিসেস্ মহান্তি য়ুরোপীয় হইলেও নেটিভ বিবাহ করার গুরুতর অপরাধে য়ুরোপীয় সমাজে জাতিচ্যুত ছিলেন"।৬

'সত্যবালা' উপন্যাসে ইঙ্গবঙ্গ সমাজে প্রবেশে ইচ্ছুক একটি যুবকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাহার নাম কিশোরী মোহন নাগ। তাহার সাহেব সাজার বিবরণ বেশ কৌতুকজনক—

"এখন দুয়ার বন্ধ করিয়া সে পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। প্রধান সমস্যা নেকটাইটা নির্দোষ ভাবে বাঁধা। দুই-তিনদিন অভ্যাস করিয়া এ বিদ্যা কতকটা আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একা নেকটাই সে কতবার বাঁধিল, কতবার খুলিল, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে যখন কতকটা পছন্দসই হইল, তখন তাহার দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরপি দর্পণের সম্মুখে গিয়া নূতন উজ্জ্বল ষ্ট্র হ্যাটটি মাথায় দিয়া দাঁড়াইল। মোহিত হইয়া নিজের চেহারাটি দেখিতে লাগিল। তাহার পর হেমচন্দ্র যখন শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মে মহিলাগণের নিকট তাহাকে 'ইনট্রোডিউস' করিয়া দিবে তখন কিরূপ ভঙ্গিতে টুপীটি তুলিয়া শিরোনমন (বাউ) করিবে বারংবার তাহারই মহলা দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিয়াছে, প্রথম আলাপে মহিলাগণ তাহার সহিত করমর্দন করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন—প্রথম আলাপে ইহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু যদি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ক্ষিপ্রহস্তে টুপীটি মস্তকে পুনঃস্থাপন করিয়া করমর্দন করিতে হইবে। সে সময় তাড়াতাড়িতে পাছে টুপীটি মাথায় সিধাভাবে না বসে, তাই বারংবার কিশোরী সেটি অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় ছিল, পাছে পরিচয়কালে টুপীটি তুলিতেই সে ভুলিয়া যায়। কোনও কোনও 'আনাড়ী' সাহেব নাকি প্রথম প্রথম এরূপ ভুল করিয়া থাকে, তাই হেমচন্দ্র কিশোরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল। যদি ভুলিয়া যায়, তবে তাহার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না, তখন হাওড়ার পুলে গিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।"[৭]

দেশীয় খ্রীষ্টান বা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক সাহেবিয়ানার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—'সিন্দুর কৌটা'র বিজয় এবং 'পত্নীহারা'র সুবোধ এই শ্রেণীর যুবক।

'বেনামি চিঠি' গল্পের সাহেবি ভাবাপন্ন নিমাইবাবু নিজের নামের বানান লেখেন Nemye Loll[৮] তিনি জামাতার প্রণাম গ্রহণ করেন না,[৮ক] তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করেন। লেখক মন্তব্য করিয়াছেন 'সেকালের অনেক লোক নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন।'[৯]

ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের চিত্রও প্রভাতকুমারের রচনায় পাওয়া যায়।

'খোকার কাণ্ড' গল্পে হরসুন্দরবাবু, 'বউ চুরি' গল্পে অনাথশরণ, 'বিলাত ফেরতের বিপদ' গল্পে প্রকাশ এবং 'মনের মানুষ' উপন্যাসে অমূল্য এই চরিত্রগুলি দীক্ষিত ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মভাবাপন্ন।

হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্ম, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। দাম্পত্য জীবনে এই বৈপরীত্য সে যুগে সুলভ দর্শন ছিল বলিয়া মনে হয়। যৌবনের আবেগে অনেক হিন্দু সন্তানই তখন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিত। বিবাহিত হইলে তাহা লইয়া শ্বশুরালয়ে গোলযোগও হইত। আবার ইহাও দেখা যাইত যে যৌবনকালে দীক্ষিত ব্রাহ্ম বৃদ্ধ বয়সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-ধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছে। হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী "পঙ্কজিনীর দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা কালী, মা দুর্গা তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন, তবে চুল পাকিবার দাঁত নড়িবার সময় তিনি অবশ্যই গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতৃক ধর্মের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবেন। এমন ত কত লোক আসিয়াছে। তাহাদেরই গ্রামের কুমুদিনীর পিতা এরূপ করিয়াছিলেন এবং ছেলে-বেলা মাতার সহিত সেই প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথা আজিও পঙ্কজিনীর মনে আছে।"১০

ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা সমাজ সংস্কারের কাজে উৎসাহিত হইয়া অসহায়া স্ত্রী লোকদের অথবা পতিতাদের উদ্ধার করিতেন। 'বেকসুর খালাস' এইরূপ একটি পতিতা উদ্ধার কাহিনী।

'বউ চুরি' গল্পের অনাথশরণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া মূর্তি বিদ্বেষী হইয়া পড়ে। গৃহে নারায়ণ শিলা থাকায় সে সেই ঘরে প্রবেশ করিত না। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই এবং পৌত্তলিক মতানুসারে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল এই দুইটি কারণে সে নিজ বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়া মনে করে এবং স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করে।১১

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মানুরাগীদের নব অভ্যুত্থানের চিত্রও প্রভাতকুমার দিয়াছেন।

"বিগত যুগের কলেজী ছাত্রদের মত, এখনকার ছাত্রগণ আর স্লেচ্ছাচারী নহেন। মুসলমানের দোকানের চপ, কাটলেট, শিক্‌কাবাব ত দূরের কথা পাঁউরুটি, বিস্কুট পর্যন্ত বর্জিত হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রের মস্তকে টিকি।"১২

'প্রতিজ্ঞা পূরণে'র ভবতোষ, 'আধুনিক সন্ন্যাসী' গল্পের নায়ক, 'যজ্ঞ ভঙ্গ' গল্পের বঙ্কুবাবু, 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের বৈহ্যুতিক হিন্দু সভার সদস্যেরা এইরূপ নব্য হিন্দু। ভবতোষ আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় ইংরাজি পড়িয়াছিল, নতুবা তাহার ইচ্ছা ছিল কোন টোলে পড়িয়া আর্যত্ব বজায় রাখা। বঙ্কুবাবু উত্তমরূপে অগ্নিশোধিত না হইলে মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি ভক্ষণকে 'অতি অনাচার' বলিয়া গণ্য করেন।

"টোস্টগুলো কাল কাঁচা ছিল, আমার জাতটে কি মারবি? আজ খুব ভাল লাল করে নিস্, একটু পোড়া পোড়া হলেও ক্ষতি নেই।"[১৩]

'প্রত্যাবর্তন' গল্পের নব্য হিন্দুরা হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"কার্তিকবাবু সগর্বে বলিলেন—"এই দেখুন, সেই জন্যেই একাদশীর দিন উপবাসের ব্যবস্থা ষাট ডিগ্রী—equilateral triangle সমত্রিভুজ[১৩ক] শরীরের সমস্ত রস equilibrium সমতাপ্রাপ্ত হবে বলেই একাদশীর উপবাসের ব্যবস্থা মুনি ঋষিরা করে গেছেন।"[১৪]

হিন্দু সমাজের দলাদলির চিত্র পাই 'বায়ুপরিবর্তন' গল্পে। হরিধনের পিতা বংশীধর জ্ঞাতি ভ্রাতা ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের জাতি মারিয়া একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলেন। কারণ ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বৈবাহিক (জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) "মহারানীর জুবিলী উপলক্ষ্যে রাজার সহিত গোপনে বিলাত গিয়াছিলেন।"

'বেনামী চিঠি' গল্পের রামসুন্দরও বিলাত গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত করায় সমাজ তাহাকে মার্জনা করিয়াছেন কিন্তু ভবিষ্যতে কন্যার বিবাহের সময় গোলমালের সম্ভাবনা থাকিয়াই গিয়াছে।

খাঁটি হিন্দু অথবা ইঙ্গবঙ্গ সমাজ যাহাই হউক না কেন কন্যা বিবাহের সমস্যা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল। সেক্ষেত্রে পিতা দুই জাতির মাত্র, ধনী এবং নির্ধন। তাই 'পরের চিঠি' গল্পের মনিকার পিতা বিলাত ফেরত সমাজে পাত্র খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন—"বিলাত ফেরত হইলে কি হইবে? চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সে শ্রেণীর পাত্রের দর অত্যন্ত চড়া। চারি অঙ্কে কুলায় না, পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক।"[১৫] তবে গোত্র, শ্রেণী ইত্যাদি ইঙ্গবঙ্গ সমাজে বাধার সৃষ্টি করিত না। 'বাপকী বেটি' গল্পের লাহিড়ী সাহেব "বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্ম হইয়া রাঢ়ী শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন অবশ্য হিন্দু মতেই। আজকাল ত অনেকেই বলিতেছেন ইহাতে জাতি যায় না এবং না যাওয়াই উচিত।"[১৬] 'যোগবল না সাইকিক ফোর্সে' সমাজান্তর বিবাহ ঘটিয়াছে। তবে বাধ্য হইয়া পিতা মাতা বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন। 'রেলে কলিসন' গল্পেও আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ হইয়াছে। সেকালের সমাজে হিন্দু যুবকের ইউরোপীয় স্ত্রী গ্রহণ সহজ ছিল না। আপাত উদার সংস্কারমুক্ত পিতারাও পুত্র-কন্যার বিবাহের সময় স্বজাতির মধ্যেই পাত্র-পাত্রী খুঁজিতেন। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়াছে 'প্রতিমা' উপন্যাসের সুরেন্দ্র। 'বিলাতী রোহিণী' গল্পেও এইরূপ বিবাহের হাত হইতে পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য সত্যবাবু 'নবনিশাকরের' সাহায্য লইয়াছেন। সত্যবাবুর মুখে যে যুগের সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়—

"মেম বিয়ে করে নিয়ে এলে, এদেশে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না যে! না দেশী সমাজে না বিলাতী সমাজে, কোন সমাজেই সে যে সুখ পাবে না। পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের

আশা পর্যন্ত লোপ হবে। দেখ দেখি নচ্ছার বেটার—আক্কেল খানা! উনি জানেন আমি উদার, মহৎ, আমার ভিতরে কোন রকম কুসংস্কার নেই! আরে মুর্গীই না হয় খাই, তাই বলেই কি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আর তোকে মেম বিয়ে করতে অনুমতি দেবো?"[১৭]

সংস্কারমুক্ত পিতাও পুত্র কন্যার বিবাহের সময় চরম অনুদারতার পরিচয় দিতেন। 'মাতৃহীন' গল্পেও এইজন্য বাঙ্গালী যুবকের সহিত ইংরাজদুহিতার অকৃত্রিম প্রেম বিবাহের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। আবার দেশীয় ব্যক্তি বিদেশিনীকে বিবাহ করিলে তাহার অবস্থা যে সত্য সত্যই 'ন ঘরকা না ঘাটকা' জাতীয় হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রত্যাবর্তন' গল্পটিতে।

ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানরা যে তাঁহাদের পূর্বজাতির সংস্কারমুক্ত হইতে পারিতেন না তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'কানাইয়ের কীর্তি' গল্পে মিস্ বীণার প্রণয়ী ধর্মান্তরের পূর্বে রজকজাতীয় ছিল বলিয়া তাহার পিতা বিবাহে অনুমতি দেন নাই।

হিন্দুসমাজের কন্যাবিবাহ সমস্যা সুবিদিত। প্রভাতকুমারের গল্পে এবং উপন্যাসেও পণ প্রথায় নিষ্পেষিত অনেকগুলি পিতার সন্ধান পাওয়া যায়। 'অঙ্গহীনা' গল্পে একটি বিবাহের দান সামগ্রীর বর্ণনা আছে—

"পঞ্চাশ ভরি সোনা, দুইশত ভরি রূপা, হাজার এক টাকা নগদ, তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, খাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয়? এই ধরুন ঘড়ি—সোনার ঘড়ি, সোনার গার্ডচেন, হীরার আংটি, চেলীর জোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টিসেট চাই।"[১৮]

সেযুগে ছেলেমেয়ের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২০।২২ এবং ১৩।১৪ ছিল। অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত থাকায় সাধারণত ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ হইয়া যাইত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রভাতকুমারের নিজের বিবাহও ছাত্রাবস্থায় হইয়াছিল। তাঁহার বয়স তখন প্রায় কুড়ি বৎসর মাত্র। অল্প বয়সে বিবাহ হইবার ফলে মেয়েদের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইত না, আর স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও তেমন ছিল না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন—

"প্রভাত মুখুজ্যের গল্প হইতে জানিতে পারি যে, সেকালের মেয়েরা ফার্ষ্ট বুকের গাধার গল্প পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে বিবাহের বাজারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইত।"[১৯]

শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সেযুগেও কিছু কম ছিল না। 'ঢাকার বাঙ্গাল' এবং 'কানাইয়ের কীর্তি' গল্পে তাহার উল্লেখ আছে। 'কলির মেয়ে' গল্পে দেখি বিনোদ ১২০ টাকার চাকুরী পাইয়াছে শুনিয়া গ্রামবৃদ্ধেরা তাহার উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন—

"গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক যাহারা বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা কনট্রোলর জেনারেলের অফিসে ত্রিশ্ টাকার কেরানীগিরির জন্য উমেদারী করিতেছিল এম, এ, পাশ করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারি জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা উঠিল।"[২০]

প্রভাতকুমারের গল্পে সমসাময়িক দ্রব্যমুল্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

পশারহীন উকীল সতীশবাবু ছয়টি পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না আসিয়া পদব্রজে বাড়ী আসেন। কারণ "ছয়টি পয়সা অর্ধসের চাউলের দাম, দুইবেলা তাহাতে একজনের আহার হয়, জমিলে মাসান্তে একযোড়া বস্ত্র কেনা চলে, ছয়টি পয়সা সতীশবাবুর ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে।"[২১]

মাসিক সাড়ে তিন টাকা ভাড়ার একটি গৃহের বর্ণনা নিম্নরূপ—

"মৃণ্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দামত। তাহার পরই অন্তঃপুর, দুখানি শয়নঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই), উঠানটি টালি বিছান, মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ, মাসিক ভাড়া ৩॥০ টাকা।"[২২]

'আদরিণী' গল্পের মোক্তার মহাশয়ও 'মাসিক তের সিকায় একটি বাসা ভাড়া' লইয়াছিলেন। আবার 'ভূত না চোর' গল্পে দেখি খোদ্ দিল্লীতেও তেতলার ভেন্টিলেটেড একাধিক ঘর, গোসলখানা, ছাদ সমেত বাড়ী মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় পাওয়া সম্ভব ছিল।

'কুড়ানো মেয়ে' গল্পে দেখি চারি সের চাউলের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ছয় পয়সা সের। তাহা সত্ত্বেও সেযুগে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। 'নীলুদা' গল্পে দেখি "নীচের ঘরগুলা যেমন অন্ধকার তেমনই স্যাতসেঁতে। উপরেও এখানটা ভাঙ্গা ওখানটা ফুটা, কড়ি বরগাগুলা জীর্ণশীর্ণ, ছাদ কখন পড়িয়া যায় ঠিকানা নাই। সারাইয়া দিতে বলিলেই বাড়ীওয়ালা বলে ভাড়া বাড়াইয়া দিন সারাইয়া দিতেছি। একটি ঝি আছে সে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন কামাই করে। বাঁধা রেট অপেক্ষা অল্প বেতনে সে সন্তুষ্ট এবং বাজারের পয়সাও চুরি করে না এই দুটি গুণের জন্য নীলমণি তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। একটু দুধ তা নীলমণির ছেলে মেয়েগুলি চোখে দেখিতে পায় না।"[২৩] মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের কেরানী নীলমণির সংসারের এইরূপ দারিদ্র্য জর্জরিত অবস্থা।

সেযুগের ছাত্রদের মেস বাড়ীতেও ভোজনের সময় জাতি অনুযায়ী পৃথক সারিতে বসিতে হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"রান্নাঘরের নিকট বিস্তৃত ভোজন কক্ষ। ব্রাহ্মণেরা এক সারি এবং অল্প দূরে কায়স্থগণ এক সারিতে বসিত।"[২৪]

ভোজবাড়ীতেও জাতি হিসাবে পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণদের ভোজন হইয়া গেলে অন্যান্য জাতিদের আসন পড়িত। কায়স্থ এবং বৈদ্যরা বোধকরি একই পংক্তিতে ভোজন করিতেন। 'যুগল সাহিত্যিক' গল্পে "কায়স্থমশায়েরা বৈদ্য মশায়েরা অনুগ্রহ করে গা তুলুন।" এইরূপ বলিতে শোনা যায়।

প্রভাতকুমারের সময়ে মেয়েরা ক্রমশ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিলেও, এই সময়েও বাঙ্গালীর গৃহে পর্দাপ্রথা ছিল। প্রায় প্রতিটি গৃহেই অন্দর মহল এবং বহির্মহল থাকিত। গৃহে জামাই আসিলেও সে সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাইত না। জামাইকে বহির্মহলে থাকিতে হইত এবং তাহার তদারকের ভার ঝি চাকরের হাতে থাকিত। 'বলবান জামাতা' গল্পটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সোনা দিয়া নবজাতকের মুখ দেখার রেওয়াজ তখন ছিল বহুল প্রচলিত। শুধু ছেলের নয় মেয়ের মর্যাদাও তখন কিছু বাড়িয়াছে। "মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না।"[২৫]

কলিকাতা অঞ্চলে বাড়ীর রান্নার জন্য পাচক বা পাচিকা রাখিবার প্রথা ছিল। নিতান্ত দরিদ্র না হইলে সকল পরিবারেই অন্তত রন্ধনকার্যে সাহায্যের জন্য লোক রাখা হইত। 'আমার উপন্যাস', 'বি, এ, পাশ কয়েদী', 'প্রেম ও প্রহার' ইত্যাদি গল্পে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সুভাষিনীর উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে—"আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি।...তবু কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে।"[২৬]

যে সব সংসারে পাচক থাকিত না, সেই সব সংসারে সকালবিকালের জলখাবার সম্ভবত বাজার হইতে কিনিয়া আনার রেওয়াজ ছিল। 'কাশীবাসিনী' গল্পে দেখি "বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন, ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরী করিতে জাননা? 'যুগল সাহিত্যিক' গল্পে তিনকড়ির স্ত্রী বলে, "ঝি জলখাবার আনতে গেছে, এখনি এল বলে। অন্ততঃ খাবারটা খেয়ে যাও।"

'নীলুদা' গল্পে দেখি "গলির মোড়ের দোকান হইতে এক এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহারা জল খায়।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালীর জলখাবার হিসাবে রুটি অথবা পাঁউরুটির প্রবেশ তখনও ঘটে নাই।

ফ্যাসান পরিবর্তনশীল, আবর্তনশীলও বলিতে পারা যায়। প্রভাতকুমারের সময়কার কিছু ফ্যাসান বর্তমানে অপ্রচলিত আবার কিছু ফ্যাসান মাঝে বিলুপ্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রভাতকুমারের সময়ে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে শাড়ীর সহিত জুতা ও মোজা পরার চল ছিল। বর্তমানে শাড়ীর সহিত মোজা পরিবার রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। সেযুগে অবিবাহিতা মেয়েদেরও মাথায় কাপড় দেওয়ার রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। 'হিমানী' গল্পে হিমানীর সাজ সজ্জার নিম্নরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

"তাহার পরিধানে একখানি মেঘলা রংয়ের দেশী শাড়ী, সেই কাপড়েরই জ্যাকেট, শাড়ীখানি অল্প তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ দিয়া আটকানো, যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। বাম স্কন্ধের একটু নিম্ন ভাবে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলংকার এবং আবশ্যকতা দুই সম্পাদন করিতেছেন।"[২৭]

মেয়েদের অলঙ্কার বর্ণনার প্রতিও প্রভাতকুমারের আগ্রহ দেখা যায়। 'নয়নমণি' গল্পে নয়নমণির সাজ সজ্জার বর্ণনা নিম্নরূপ—

"পরিধানে একটি চৌড়া লাল পাড় শাড়ী।......দুই হাতে দুই গাছি ডায়মন কাটা সোনার বালা, আর কতকগুলি রেশম চুড়ি। বাঁহাতে একটি সোনা বাঁধানো 'সাবিত্রী লোহা'। উপর হাতে দুইগাছি আঙ্গুর পাতা প্যাটার্ণ কুকুর মুখো তাগা, গলায় একগাছি ছোট চেন হার।"[২৮] 'গহনার বাক্সে' পাত্রপক্ষের সামনে মেয়েকে উপস্থিত করা হইয়াছে নিম্নরূপ সাজে—

"মনোরমা একখানি জরিপাড় খয়ের রংয়ের শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে সেই রংয়ের একটি রেশমী জ্যাকেট, হাতে চারিগাছি করিয়া আটগাছি হরতন চিড়িতন চুড়ি, মাথায় একটি পালিশ পাত চিরুণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রজাপতি আঁটা।"[২৯]

'প্রতিজ্ঞাপূরণ' গল্পে পুলিনার সাজের বর্ণনা নিম্নরূপ—

একখানা দেশী কালাপাড় শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোনার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।"[৩০]

বয়স্কা মহিলার সাজ সজ্জার বর্ণনা পাওয়া যায় 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে "কমলাদেবীর পরিধানে একখানি গরদের শাড়ী। তাহার লালপাড় তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভিজা চুলগুলি পিঠে কাপড়ের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, চুলের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি বাঁধা, কারণ একেবারে খোলা চুলে পুজাদি করিতে নাই। তাঁহার গলায় চিক্, উপরহাতে জসম্ ও নীচের হাতে চূড়।"[৩১]

পুরুষদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনার সুযোগ সাধারণত থাকে না। 'জীবনের

মূল্য’ উপন্যাসে সে যুগের আধুনিক পোষাক সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে এককালে ধুতির উপর কোট গায়ে দিয়া শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু “যারা আজ-কালকার ফেসানেবল্ লোক, তারা বলে বাঙ্গালা ধুতির উপর ইংরাজি কোট পরাও যা মুর্গীর ডিম ভাতে দিয়ে হবিষ্যান্ন খাওয়াও তাই।”[৩২] আধুনিক জামাইরা পাঞ্জাবী গায়ে দেয়—ধুতির উপর কোট দেখলে তারা বলে, হয় এ রেলের বাবু নয় পাড়া-গেঁয়ে ভূত। সরু মুখ জুতোর ফেসান এককালে ছিল বটে, এখন চাঁদনীর ফ্যাসান, ভদ্র সমাজের ফ্যাসান নয়। ভদ্র সমাজের ফ্যাসান এখন মীডিয়ম টোজ। “মুখ সরু জুতো পরা, মাংস দেখা যায় এমন করে পিছনের চুল ছাঁটা এসব এককালে ফ্যাসান ছিল বটে এখন উঠে গেছে।”[৩৩] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরুমুখ জুতা পরিবার ফ্যাসান আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষোভের যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে যে বিদেশী বর্জন বা স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল প্রভাতকুমারের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই তাহার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রভাতকুমারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া দেশভক্তি তাঁহার অন্য কাহারও অপেক্ষা কিছু কম ছিল না। সম্ভবত এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ‘মাদুলী’ গল্পে তিনি যেমন উগ্র দেশপ্রেমিকের মানবতাহীন চিত্র আঁকিয়াছেন, তেমনই ‘খালাস’ গল্পে জনৈক সাহেব প্রভুপদলোহনকারী ডেপুটিবাবুর আত্মিক উদ্ধার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই গল্পে বিদেশী বর্জন আন্দোলনেরও একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—

“ছেলেরা বলিল, ভাই এ টিনটাকে ‘বন্দেমাতরম্’ করা যাক এস। বলিয়া টিন খুলিয়া বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে বন্দেমাতরম্ এবং ‘বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত’ গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল।”[৩৪]

‘হাতে হাতে ফল’ গল্পটির পটভূমিও স্বদেশী আন্দোলন। গল্পটিতে বাঙ্গালী ও ইংরাজের সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে—ইংরাজ অন্যায়কারী তাই বলিয়া বাঙ্গালীকেও অন্যায় করিতে হইবে ইহা যুক্তি নয়, একজন আততায়ী ইংরাজকে তিন জন বাঙ্গালী মিলিয়া মারিলে কোনও দোষ হয় না ইহার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। ডাক্তারবাবুর পুত্র অজয় কিন্তু যুক্তি দেখাইয়াছে—

“বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবত একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরাজ

তিনজন বাঙ্গালী সমান না তার চেয়ে বেশী। একজন আততায়ী ইংরাজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মিলে মারলে কোন দোষ হয় না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ বা রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?"

অজয় বলিল, "গায়ের জোর না থাক, মনের জোর পাচ্ছে। মনের জোরই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তারবাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন "তা ঠিক বটে। মনের জোরই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ্য করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজের প্রতি বল প্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না।"[৩৫]

ডাক্তারবাবুর উক্তিগুলিকে প্রভাতকুমারের নিজস্ব বক্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বোধকরি অন্যায় হইবে না। এই গল্পটিতে তথাকথিত স্বদেশভক্তদের প্রতি দুই একটি মৃদু ব্যঙ্গাত্মক উক্তি আছে। 'বীরভারত' পত্রিকার সম্পাদক যিনি নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদস্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন, আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একজোড়া সোনার চশমা তাহার জন্য স্বতন্ত্র মুল্য দিতে হইয়াছিল, তিনি সাহেবের ধাক্কা খাইয়া চশমা খোওয়াইলেন এবং গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে না উঠিয়া (যদিও তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল) মধ্যম শ্রেণীতে উঠিলেন এবং পরদিন নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়া 'বীরভারতে' এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।[৩৬]

'সম্পাদকের আত্মকথা' গল্পের পটভূমিতেও আছে স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সাহিত্যকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় গল্পটিতে পাওয়া যায়।

"যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরা দমেই চলিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের মরাগাঙ্গেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে। আমিও আর্য্য শক্তিতে

উদ্দীপনা পূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাঝে মাঝে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘি, বিডন বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে—কয়েকটি সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জননায়কগণ দেশান্তরিত হইয়াছেন আবার গুজব উঠিয়াছে সিমলা শৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।"৩৭

স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগ দেশের ছাত্র সমাজেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহার এক কৌতুকপ্রদ বিবরণ 'রেলে কলিসন' গল্পটিতেও পাওয়া যাইবে। স্বদেশী আন্দোলন এবং স্বদেশী ডাকাতির প্রসঙ্গ 'সখের ডিটেকটিভ', 'পোষ্ট মাষ্টার', 'মাদুলী' ইত্যাদি গল্পেও আছে।

যাহারা রাজার জাত, সেই দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজও যে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদেশী বর্জন করিয়াছিলেন—তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'ভুল' গল্পে। গল্পটিতে লেখক নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

"ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিষ, অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ে কোন সম্পর্ক নাই—যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম, কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাঁহাকে যে 'সাহেব' হইতে হইবে, এমন কোন কথা ত নাই, বরং তাহা হইতে চেষ্টা করাই স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা।"৩৮

ঠাট্টা বিদ্রূপ কৌতুক ইত্যাদির ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গিও যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্র-প্রভাতের যুগ পর্যন্ত এমন অনেক ঠাট্টা বাঙ্গালী সন্তানের মুখে শোনা যাইত যাহা এখন অশালীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। সে যুগে বধূ নিজের স্বামীর সহিত ননদকে জড়াইয়া ঠাট্টা করিত। 'বউচুরি' গল্পে প্রভাতকুমার এইরূপ ঠাট্টার ইঙ্গিত দিয়াছেন—

"মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম হইবে না।"৩৯

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'তে দেখি উপেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরা বলিতেছে—"শুনিয়াছি, তুমি আমার ননদের বর।"৪০

ত্রিভুজ প্রেমের ক্ষেত্রে 'দুর্গেশ নন্দিনী'র জগৎ সিংহ ও ওস্‌মানের উপমা দেওয়া তখনকার কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভাতকুমার অনেক স্থলে এইরূপ উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

"ওস্‌মান বললে জগৎ সিংহ, এ পৃথিবীতে তোমার আমার দু'জনের স্থান নেই—" বলিয়া সুধাংশু হাসিতে লাগিল।৪১

কিশোরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ওস্‌মান জুটলো নাকি হে ?"[৪২]

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত মেয়েলি ছড়া, প্রবচন ইত্যাদির কয়েকটি উদাহরণ নীচে দিতেছি—

১। "চোরের মন পুই আদাড়ে।"[৪৩]

২। "দিদি যেন ঢং তেলা কুচো রঙ।"[৪৪]

৩। "তেষ্টার সময় মাষ্টার মশাই, তোমায় আমি হৃদে বসাই।"[৪৫]

৪। "যার সঙ্গে যার ভাব, মুখ দেখলেও লাভ।"[৪৬]

৫। "মরি মা মশারি ছিঁড়ে।"[৪৭]

৬। "সাধে কি হয় গো দিদি···।"[৪৮]

৭। "এস সখা, কাছে বোস
বসিতে কি আছে দোষ ?
তুমি যারে ভালোবাসো।"[৪৯]

বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়িতে গিয়া প্রভাতকুমার বিলাতী সমাজ এবং বিলাত প্রবাসী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার বেশ কয়েকটি গল্পে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত লেখক কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিলাতী সমাজের কথা লিখিতে বসেন তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—

"যিনি কখনও মানচিত্রে ভিন্ন বিলাত দেখেন নাই, রেনল্ডের নভেল ভিন্ন অন্যত্র বিলাতী সমাজের সহিত যাঁহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, তিনি বিলাতী সমাজের একটি গল্প লিখিয়া ফেলিলেন। অনেক সময় সে গল্প পড়িয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারি না।"[৫০]

ইংরেজ জাতির এটিকেট প্রিয়তার কথা সর্বজনবিদিত। 'মুক্তি' গল্পে দেখি চারু নরেনকে উপদেশ দিতেছে, দাসীকে শুধু নাম ধরেই ডাকতে হয় বটে, তবে "যেন মনে কোর না ঝিকে তাচ্ছিল্য করা হিসাবে মিস্‌টা বাদ দেওয়া হয়।······এখনও অনেক সেকালকার **chivalrous spirit**-এর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ করে থাকেন। ওরকম দেখা হলে, কোন একটা **pleasant remark** করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও তাকে নোটিশ না করে চলে যাবে তা ভয়ানক অভদ্রতা।"[৫১] নরেনের প্রতি মিসেস হ্যালামের ব্যবহারও এই এটিকেট রক্ষা করিয়া চলিবার দৃষ্টান্ত। নরেনের ব্যবহারে মিসেস্ হ্যালাম অসন্তুষ্ট, কিন্তু পাঁচজনের সামনে সে ভাব প্রকাশ করা চলে না। সুতরাং কি প্রাতরাশের সময় কিংবা সন্ধ্যায় ডিনারের পর ড্রইংরুমে বসিয়া গীতবাদ্য ও

আমোদের সময়েও নরেন মিসেস্‌ হ্যালামের ব্যবহারে কোনও রূপ অপ্রসন্নতার চিহ্নও খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর "যে মুহূর্তে নরেন একাকী হইল, সেই মুহূর্তেই তাহার প্রতি মিসেস্‌ হ্যালামের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।"[৫২]

'এটিকেট' প্রিয়তার মত ইংরেজ জাতির সৌন্দর্যপ্রিয়তারও খ্যাতি আছে। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—

"ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যপ্রিয়তা একটি বেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিজের কেশ বেশ, ছেলে মেয়ে, গৃহস্থালী দ্রব্য সমস্তই সে পরিপাটী পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে জানে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ত কথাই নাই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও ইহা দেখা যায়।"[৫৩] একটি জেলে পরিবারের উল্লেখ করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"দেখিতাম তাহারা জেলে হইলেও বাড়ীর গৃহিণী, ছেলেপিলেগুলি কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে যে তেমন পরিচ্ছন্নতা আমাদের দেশের ডেপুটি বা মুনসেফবাবুদের পরিবারেও দুর্লভ।"[৫৪]

'মুক্তি' গল্পটিতে এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রসঙ্গ রহিয়াছে—"শয়ন ঘরে কি তোরঙ্গ পেটরা স্তূপাকার করে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য হানি হবে যে।"[৫৫]

যে যুগের বিলাতী সমাজে মোমবাতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয়ও এই গল্পটিতে পাওয়া যায়—

"বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া মিথ্যা সাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে।……সে দেশে যে যতই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা sneak বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে চাহে না।"[৫৬]

সে যুগে লণ্ডনের বড় বড় বিভাগীয় বিপণিতে মেয়েরা shop girl-এর কাজ করিত এবং তাহাদের বেতন অত্যন্ত অল্প হইত। 'ফুলের মূল্য' গল্পে এইরূপ একটি বালিকার পরিচয় পাওয়া যায় যে Alice in the Wonderland নামক বিখ্যাত বইটির নামও শোনে নাই।

বিলাতী সমাজে বিবাহার্থী ছেলে মেয়েরা পরস্পর মন জানাজানির পালা শেষ করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রোপোজ করিবার ভার ছেলেদের উপর, মেয়েরা কখনও 'প্রোপোজ' করে না। রক্ষণশীল পরিবারে কখনও কন্যাকে একাকী বাহির হইতে অনুমতি দেওয়া হইত না, এমন কি Engaged হইবার পরও নয়। খ্রীষ্টান সমাজে

রবিবার প্রার্থনার দিন। এইদিন ধর্মনিষ্ঠ পরিবারেরা তাস খেলেন না, ধর্ম সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাওয়া পাপ মনে করেন। ভদ্র ইংরেজ সম্পূর্ণ পোষাক না পরিয়া মহিলাদের সামনে বাহির হন না। 'মাতৃহীন' গল্পের বিলাত প্রবাসী ছাত্র শরৎ ইংরেজের এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলে। তাই একজন মহিলার সম্মুখে জুতা খুলিবার প্রস্তাবে সে শিহরিয়া উঠে। এমন কি দাসীর সম্মুখেও নগ্নপদে থাকা অভদ্রতা। উক্ত গল্পে মিস্ ক্যাম্বেল তাই শরৎকে ভরসা দেন—"দাসী আসিবার পূর্বেই তোমার জুতা শুকাইয়া যাইবে।"

'প্রবাসীনী' গল্পটিতে দেখি 'পেনি'র সাহায্যে **heads** এবং **tails** করা হইত। আমাদের দেশেও এইরূপ করা হইয়া থাকে। অল্প বয়স্কা বালিকাকে **Bread and butter miss** বলিয়া পরিহাসের পরিচয় গল্পটিতে পাওয়া যায়। 'মাতৃহীনে'র **Rain before seven, clear before eleven** প্রবাদ বাক্যটির সহিত আমাদের দেশের প্রভাতে মেঘাডম্বরে ইত্যাদি প্রবচনটির তুলনা করা চলিতে পারে।

গল্প ছাড়া বিলাতী ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও বিলাতী সমাজের মুল্যবান চিত্র আছে।

॥ টীকা ॥

১। 'যোগবল না সাইকিক ফোর্স'।

২। 'বাপ কী বেটা, 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প' পৃঃ ১৭০।

৩। 'গল্পবীথি', পৃঃ ১২৯।

৪। 'গল্পবীথি', পৃঃ ১২৭।

৫। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৪৬।

৬। ঐ, পৃঃ ১৫৯।

৭। প্র, গ্র, (ব) (৫ম ভাগ) পৃঃ ৬৫।

৮। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫০। তুঃ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' অমিট্ রায়।

৮ক। তুঃ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশায়।

৯। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫০।

১০। 'গল্পবীথি', পৃঃ ৩।

১১। তুঃ "চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট/চক্ষু বোজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট/কচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে/এমন সময় বিয়ে হয়ে হিন্দু form এ/—ছেড়ে দিলাম পথটা/ বদলে গেল মতটা/:"

'বদলে গেল মতটা': দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫৭৮।

১২। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৩১।
১৩। 'গল্পবীথি : পৃঃ ৮৫।
১৩ক। সমবাহু ত্রিভুজ স্থলে প্রভাতকুমার 'সমত্রিভুজ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।
১৪। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৩৩।
১৫। 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প', পৃঃ ২১১।
১৬। 'বাপকী বেটী' ঐ, পৃঃ ১৭০।
১৭। 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' : পৃঃ ১৭২।
১৮। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৭০৮।
১৯। 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' : ২৬শে মাঘ ১৩৭৫, পৃঃ ঘ।
২০। প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৭৯।
২১। 'গংগার বাস' : প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২৪।
২২। 'কাশীবাসিনী' : প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৫৯।
২৩। 'গল্পবীথি' : পৃঃ ১৬৮-৬৯।
২৪। 'প্রত্যাবর্তন : প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৩৬।
২৫। 'কুড়ানো মেয়ে' : প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃ. ৬৩।
২৬। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩৫২।
২৭। প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৯।
২৮। প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৩।
২৯। ঐ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২৬।
৩০। প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৬৩।
৩১। 'রমাসুন্দরী', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৪৪।
৩২। 'জীবনের মূল্য', পৃঃ ৫৪।
৩৩। ঐ, পৃঃ ৫৫।
৩৪। 'খালাস', প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১১০।
৩৫। 'হাতে হাতে ফল,' ঐ পৃঃ ৯১-৯২।
৩৬। ঐ, পৃঃ ৯০।
৩৭। 'সম্পাদকের আত্মকথা।
৩৮। 'ভুল'।
৩৯। 'বউচুরি' প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৬।
৪০। ব, র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩৭৯।
৪১। 'নীলুদা', গল্পবীথি, পৃঃ ১৮০।
৪২। 'সত্যবালা', প্র, গ্র, (৫ম ভাগ) পৃঃ ৭২।
৪৩। সতীর পতি, পৃঃ ৩০।
৪৪। 'নয়নমণি', প্র, গ্র, (২য় ভাগ) পৃঃ ২৪৮।
৪৫। 'গুণীর আদর,' ঐ, (৫ম ভাগ) পৃঃ ২১৬।

৪৬। 'মনের মানুষ', পৃঃ ৩৫।
৪৭। 'প্রেম প্রহার', গ্র, গ্র, (ব), ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৫৭।
৪৮। 'সতীর পতি' পৃঃ ৯৫।
৪৯। 'প্রবাসিনী', গ্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৩৬।
৫০। সা, সা, চ, মা (৫৪) পৃঃ ৩৪।
৫১। গ্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৭৫।
৫২। ঐ, পৃঃ ১৮৫।
৫৩। 'ইংরাজ রমণী', গ্র, গ্র, (ব), (৫ম ভাগ) পৃঃ ৩৪৪।
৫৪। ঐ, পৃঃ ৩৪৫।
৫৫। গ্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৭৬।
৫৬। ঐ, পৃঃ ১৮৪ ৮৫।

প্রভাত সাহিত্যে বাস্তবতা

প্রভাতকুমার দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া রোমান্টিক হইলেও তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তিনি বাস্তবতার একটি মায়া (illusion) সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার রচিত গল্প উপন্যাসগুলিকে অতিমাত্রায় বাস্তব বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া **verisimilitude**১ —এই ইংরাজি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের রচনায় যে সমস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহারা সকলেই আমাদের পরিচিত জগৎ হইতে আসিয়াছে, তাহারা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দোসর। "পটলডাঙ্গা বেনেটোলার মেসবাসী কলেজের ছাত্র, হেদো-বিডন গার্ডেন বিচরণকারী পেনসনভোগী বৃদ্ধ, বউবাজারের বোর্ডিং অধিষ্ঠিত নবীন কেরানি, বাঁকিপুর সাসারামের চাকুরে ও উকীল, মফঃস্বল আদালতের মোক্তার, উপেক্ষিত রেলস্টেশনের ছোটবাবু, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ফিরিঙ্গি গার্ড, উত্তরবঙ্গের জমিদার, পশ্চিমবঙ্গের চাষী গৃহস্থ, মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক, চিৎপুরের জ্যোতিষী, পর্যটক বাজীকর, কাশীবাসিনী বিধবা, লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেডি ইত্যাদি রকমারি মানুষ, প্রভাতকুমারের গল্পের পরিচয় জমাইয়া আমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী আত্মীয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"২ আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি যে প্রভাতকুমার তাঁহার সাহিত্যে সাধারণ মানুষকেই স্থান দিয়াছেন—কোন মহাপুরুষ অথবা অনন্যসাধারণ চরিত্র তিনি আঁকেন নাই। এই চরিত্রগুলির কার্যকলাপও অত্যন্ত স্বাভাবিক। লেখক বিপত্নীক যুবককে পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন, সংসারত্যাগীদের সংসারে ফিরাইয়া দিয়াছেন, সম্ভবস্থলে বালবিধবাকে মৃত পতির স্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন। তাঁহার গল্পে সতীন মরিলে অন্য স্ত্রী "ভাগ্যবতী! তোমার মত ভাগ্য আমার হউক"৩ বলিয়া আক্ষেপ করে না বরং 'হাসিতে গল্পেতে মনের প্রফুল্লতা ও স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত'৪ হয় না।

তাঁহার স্ত্রী চরিত্রগুলির আচার আচরণ এবং বাচনভঙ্গি এত নিখুঁত যে, তাহা প্রায় ফটোগ্রাফে পরিণত হইয়াছে। ইহারা কেহ ধনী গৃহের গৃহিণী, কেহ বা ক্ষুদ্র রেলকর্মচারীর স্ত্রী, কেহ বা কলেজের ছাত্রী, কেহ বা কলেজ ছাত্রের স্ত্রী, আবার কেহ বা কন্যাদায়গ্রস্তা মা। ইহারা কেহই নূতনত্বের চমক সৃষ্টি করে না কিন্তু লেখকের লিপিকুশলতায় আমরা তাহাদেরকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যাহা ছিল না তাহার বিকাশ সৃষ্টিকার্য, আর যাহা ছিল তাহার প্রকাশ আবিষ্কার।... ...চরিত্রের আবিষ্কারকার্য দেখিলে বুঝিতে পারি লেখক অমুক ব্যক্তিটিকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।"[৫]

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের নরনারীরা এইরূপ আবিষ্কারের ভাস্বর নিদর্শন। নারী চরিত্র চিত্রণের সময় লেখক সুনিপুণভাবে মেয়েলি ইডিয়ম প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদের সংলাপের বিশিষ্ট ভঙ্গিটিও যেন লেখকের কলমের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি সম্পন্ন গৃহের প্রাচীনা গৃহিণী, কি আধুনিকা শিক্ষিতা তরুণী, কি দরিদ্র ঘরের কন্যাভারগ্রস্তা জননী প্রত্যেকের বাক্‌ভঙ্গির বিশিষ্টতা তাহাদের ভূমিকাগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। লেখক কোন কিছু বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করেন নাই অথচ ভূমিকাগুলি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে শুধু তাহাদের সংলাপের মধ্য দিয়া। লেখকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কার্য নহে। 'রমাসুন্দরী'তে স্বাস্থ্যবান নবযুবক নবগোপালকে যখন তাহার জননী বলেন—"ভারি শক্ত শরীর কিনা। ঠেলা মারলে পড়ে যান, তালপাতার সেপাই...।"[৬] তখন বাঙ্গালী ঘরের পুত্র-স্নেহান্ধ মাকেই আমরা যেন প্রত্যক্ষ করি। অথবা "তুই কি পীর না প্যাগম্বর? কি ধিঙ্গী মেয়েই পেটে ধরেছিলাম না।"[৭] এই উক্তি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রহারোদ্যতা বঙ্গ জননীর ছবি আমাদের সামনে ফুটিয়া ওঠে। উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে এইরূপ প্রত্যক্ষবৎ চিত্রের অভাব নাই।

প্রভাতকুমার যে শুধু দেশীয় রমণীর চরিত্রাঙ্কনেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে বিদেশিনী নারীর চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার বিলাতী পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'মুক্তি' গল্পে যেমন বিদেশিনী ব্যাপিকার সার্থক চিত্র আছে তেমনই 'মাতৃহীন' গল্পে মিস্ ক্যাম্বেলের মধ্য দিয়া লেখক একনিষ্ঠ প্রেমের এক অপরূপ আলেখ্য পাঠককে উপহার দিয়াছেন। 'ফুলের মূল্য'র ম্যাগি ও তাহার মা, 'পুনর্মূষিক' গল্পে মিস্ টেম্পল, 'কুমুদের বন্ধু' গল্পে ঈথেল, 'সতী' গল্পে বার্থা এবং 'বিলাতী রোহিণী' গল্পে নোরা—এই চরিত্রগুলিও সুচিত্রিত এবং বাস্তবানুগ। মন্মথ-নাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'প্রভাত-সাহিত্যে বিদেশিনী' প্রবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের মধ্যে আমার মনে হয় প্রভাতকুমারই তাঁহার গল্পগুলিতে বিদেশিনীদের যথার্থ জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি যে চিত্রই আঁকিয়াছেন, তাহা সজীব, উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীদের মত কোথাও অপ্রশংসাও করেন নাই, স্তুতিও করেন নাই, পরন্তু বিদেশিনীদের একটি জীবন্ত মূর্তি আমাদের সমক্ষে আনিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের বিবিধ বরণীয় গুণগ্রাম এবং তাঁহাদের কাহারও চরিত্রের লঘুতা ও তরলতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দিয়াছেন।"[৭ক]

প্রভাতকুমারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য তাহাদের 'বাঙ্গালীত্ব'। বাঙ্গালীয়ানা যেন তাহাদের সর্বাঙ্গ দিয়া পরিস্ফুট হইতেছে। দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া শাশ্বত কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবার মত ব্যাপ্তি তাহাদের নাই কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই এই চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত সজীব করিয়া সৃষ্টি করিয়া লেখক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই দিক দিয়া আমরা প্রভাতকুমারকে বাঙ্গালী জীবনের চরিতকার বলিতে পারি। প্রভাতকুমারের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁহার সামাজিক উপন্যাস 'সংসারে' (১৮৮৬) সম্ভবত সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর ঘর-সংসারের বাস্তবানুযায়ী বর্ণনা দিয়াছেন। প্রভাতকুমারকে এই ব্যাপারে তাঁহার সার্থক উত্তরসাধক বলা যাইতে পারে। উভয়ের রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি—

(ক) "বিন্দু সেই রকে একটু একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি।"

(খ) ······তা নে বাছা, যা ভাল পাস্ নিয়ে আসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস, একটু অম্বল রেঁধে দেব। বাবুকে কি দিয়ে যে ভাত দি তা ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ শাক যদি ভাল পাওয়া যায়, এক পয়সার আনিস ত···আর থোড় পাস ত নিয়ে আসিস, একটু ছেঁচকি করে দেব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস একটু ঘণ্ট রেঁধে দেব।"[৯]

(গ) "রথযাত্রা, মাছ ত আজ খাইতে নাই আলুভাতে মুগের দাইল ভাতে এবং আলু পটল ও কাঁচকলার একটা ঝোল ইহাই রন্ধন করিলেন। এগুলি রন্ধন শেষ হইলে, বালক-বালিকাদিগের জলযোগ জন্য গৃহিণী খানকতক পরোটা ভাজিয়া, খানিকটা মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া লইলেন।"[১০]

(ঘ) "দিদি সন্ধ্যেবেলা হীরু আসবে, এবেলা কিছু মাছ আনিয়ে রাখলে হত না? বড়গিন্নী বলিলেন,—হ্যাঁ সে ত আনাতেই হবে। চুণিকে একবার পাঠাও না জেলেবাড়ী। পাকা রুইমাছ যদি পায় তবে পোয়াটেক নিয়ে আসুক।···মাছ এনে রেখে একবার বাজার যাক। হাঁসের ডিম কিনে আনুক। ডিমের কালিয়া খেতে হীরু ভালবাসে। আর পয়সা দুইয়ের কিছু চুনো মাছ, অম্বল রাঁধা যাবে।"[১১]

(ঙ) "কিরণ এনামেলের গেলাসটি হাতে লইয়া উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার ডাকে আহার স্থানে গিয়া কুঞ্জ দেখিল, একখানি পিঁড়ি পাতা, তাহার সম্মুখে কলাপাতায় সুধা ধবল অন্ন সজ্জিত তাহার সহিত দুই টুকরা নেবু, শাক ভাজা, খানিকটা চচ্চড়ী,

তাহার ভিতর হইতে মাছের কাঁটা উঁকি দিতেছে, আলু কাঁকুড়ের দালনা, লাল লাল দুই টুকরা মাছ ভাজা এবং কুচো চিংড়ি দিয়া আমড়ার বোলের অম্বল। পাশে দুইটি মাটীর খুরি, একটিতে ঘন সোনামুগের দাল অপরটিতে কইমাছের ঝোল।"[১২]

(চ) রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বড় বউ মাছ ভাজিতেছিলেন, নিকটে পাঁচুর দিদি বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। হরিদাসীর নিকটে গিয়া মালা হাতে করিয়া গৃহিণী দাঁড়াইলেন। তাহার কুটনার প্রতি নজর করিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাগা হরিদাসী, এই কি তোমার কাজের ছিরি?"

"কেন দিদিমা?"

"এ কি কুটনো কুটছ, না খেলা করছ।"

"কেন কি হয়েছে?"

"মাছের ঝোলের আলু কুটছ, তা অমন ডুমো ডুমো করেই কুটতে হয়? সেদ্ধ হতে ছ' জন্ম লেগে যাবে যে!

হরিদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বড় হচ্ছে? আচ্ছা তা ছোট ছোট করে কুটছি।"

অতঃপর গৃহিণী গিয়া পুত্রের ঘুম ভাঙ্গাইলেন। তাহাকে সত্বর স্নানাদি করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "ভাত হল বলে, খেয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়—রোদ্দুর বেড়ে উঠছে।"

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিদাসীর আলুর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হরিদাসী তুমি যে অবাক করলে বাছা!"

"কেন দিদিমা?"

"ছোট ছোট করে কুটতে বলেছি বলে, কি অমনি একেবারে কুচি কুচি করতে হয়। গলে যে ঘণ্ট হয়ে যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

হরিদাসী বিরক্তির সহিত বলিল, "চৌচির করছিলাম, তাতে বললে ডুমো ডুমো হচ্ছে। আটচির করছি তাতে বলছ কুচি কুচি হচ্ছে। তবে কি রকম করে কুটব।"[১৩]

প্রথম উদ্ধৃতি দুইটি রমেশচন্দ্র হইতে অবশিষ্টগুলি প্রভাতকুমার হইতে।

এইরূপ প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা বঙ্কিম, রবীন্দ্র অথবা শরৎ কাহারও রচনায় খুব সুলভ নহে। বাঙ্গালীর রন্ধনশালার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'তে (১৮৭৩) ইন্দিরা পাচিকা হিসাবেই সুভাষিনীর সংসারে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু "আমি মাছ মাংস রাঁধি বা দুই একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি" এইটুকু লিখিয়াই লেখক তাহার রন্ধননিপুণতার বিবরণ শেষ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (১৮৭৮) রোহিণী রন্ধনে দ্রৌপদী বিশেষ। কিন্তু পাঠক তাহাকে একবার শুধু ঠন্ ঠন্

করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতে দেখে। বিষবৃক্ষেও (১৮৭৩) রন্ধনশালার বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা পাঠকের মনে কোন ক্রমেই বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর আমেজ আনিয়া দেয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রঙীন দৃষ্টি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন চর্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু প্রভাতকুমার দৈনন্দিনতায় ম্লান জীবনযাত্রার মধ্যেই রোমান্সরস খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

শুধু রন্ধনশালা নয় অন্যান্য বিষয় বর্ণনাতেও প্রভাতকুমার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গরীবের ঘরে অসচ্ছলতার জন্য চুনকাম হয় না, তাই পাঁচ বৎসর পূর্বেকার বসুধারার শুভচিহ্নটি থাকিয়া যায় ('কুড়ানো মেয়ে')। 'নীলুদা' গল্পে নীলমণির ঘরের এবং 'রত্নদীপ' উপন্যাসে রাখালের রেলওয়ে কোয়ার্টারটির বাস্তবানুগ বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রতি প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া মনে হয়। 'রমাসুন্দরী'তে কমলা দেবীর পূজার ঘর বা 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে বিমলের ঘরের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক কোন খুঁটিনাটি বিষয়ই বাদ দেন নাই।

প্রভাতকুমার বর্ণনা ছাড়া আর একটি উপায়ে বাস্তবতা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার গল্প উপন্যাসে খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত বস্তু এবং সুপরিচিত স্থানের প্রকৃত নাম ব্যবহার করিবার ফলে বাস্তবতা সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন বিদ্যাসাগর, অমৃতলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল ইত্যাদি খ্যাতনামাদের প্রভাতকুমার তাঁহার গল্পে বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়াছেন। তাঁহার গল্পে 'ইনোজ ফ্রুট সল্ট', 'ডি গুপ্ত', 'হেজলীন স্নো' ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার কলিকাতার বিখ্যাত হেদো, গোলদীঘি, বিডন বাগানকে এবং লণ্ডনের রিজেণ্টস্ পার্ক, হাইড পার্ক ইত্যাদিকে তিনি তাহার গল্পে কাজে লাগাইয়াছেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকান এবং 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার উল্লেখও তাঁহার গল্পে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রভাতকুমার বাস্তবতার মায়াসৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁহার রচনার সামগ্রিক আবেদন রোমান্টিক। বাস্তব চরিত্র এবং বাস্তব সমস্যাকে বিচিত্র ঘটনার পেষণযন্ত্রে ফেলিয়া তিনি যে রস নিষ্কাশন করিয়াছেন তাহা রোমান্সরস। এই জন্যই তাঁহার অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই মধুর সমাধানের মধ্য দিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। এইরূপ সমাধান মানবজীবনে আকাঙ্ক্ষিত বটে, কিন্তু সর্বদা সহজলভ্য নহে।

॥ টীকা ॥

১। **Language & Literatures of Modern India, P. 187.**

২। ডঃ সুকুমার সেন : বা, সা, ই, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৫।

৩। 'বিষবৃক্ষ'।

৪। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৭১।

৫। বাংলা সাহিত্যের নরনারী, পৃঃ ১৫৭।

৬। 'রমাসুন্দরী' প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৪৭।

৭। 'গরীব স্বামী'।

৭ (ক)। 'বঙ্গশ্রী': বৈশাখ ১৩৫৭, পৃঃ ৩৮৭।

৮। 'সংসার' রমেশ রচনাবলী, পৃঃ ৩৩৬।

৯। ঐ পৃঃ ৩৬৫।

১০। 'গরীব স্বামী', পৃঃ ৮৪-৮৫।

১১। 'সতীর পতি', পৃঃ ২২৫-২২৬।

১২। 'মনের মানুষ', পৃঃ ৮১।

১৩। 'রমাসুন্দরী', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৬৯।

প্রভাতকুমারের ভাষা ও রচনারীতি

প্রভাতকুমারের সাহিত্য জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনের প্রভাব সর্বাধিক। তাঁহার ভাষার ক্ষেত্রেও এই দুইজনের প্রভাব লক্ষণীয়। অবশ্য প্রভাতকুমারের ভাষার একটি নিজস্ব ষ্টাইল রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় গদ্যে সাধুভাষার ব্যবহার করিলেও প্রভাতকুমারের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সরল। তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কিঞ্চিৎ জটিল এবং ভারাক্রান্ত (ponderous)। তৎসম শব্দের বাহুল্য প্রভাতকুমারের ভাষাতেও আছে কিন্তু অপ্রচলিত তৎসম শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই বলিলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সন্ধি ও সমাসের আড়ম্বর তাঁহার ভাষায় নাই। আবার রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অলংকৃত এবং কাব্যগুণমণ্ডিত ভাষাও তিনি ব্যবহার করেন নাই। প্রসাদগুণই প্রভাতকুমারের ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেন বলেন—

"প্রভাতকুমারের ভাষার মূলে রবীন্দ্র প্রভাবিত বঙ্কিমী পদ্ধতি। ভাষা সরল, অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও হৃদয়গ্রাহী, সরস, উজ্জ্বল এবং সুন্দর, অতি অল্প আয়োজনে ভাষার এইরূপ পারিপাট্য সাধন অল্প কৃতিত্বের কার্য নহে।"[১]

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে ব্যবহৃত গদ্যকে দুইটি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে (১) বর্ণনার অংশ (২) সংলাপের অংশ। বর্ণনার ভাষায় প্রভাতকুমার সর্বত্র সাধুভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। সমসাময়িক কালে 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) আদর্শে অনেকেই ভাষার পথ পরিবর্তন করিয়াছিলেন—এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।[২] কিন্তু প্রভাতকুমার তাঁহার ভাষার আদর্শে অবিচল থাকিয়াছেন আজীবন। সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ও দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 'রক্ষণশীল আধুনিক'। ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁহার এই মনোভঙ্গিই পরিস্ফুট। বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধুভাষার পক্ষপাতী হইলেও সংলাপের ভাষায় তিনি চলিত ভাষা, চলিত ভাষাই বা বলি কেন, একেবারে মুখের ভাষাকে ব্যবহার করিয়াছেন। বাস্তবতার অনুরোধেই তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চরিত্রানুযায়ী উচ্চারণ ভঙ্গিটিও তাঁহার সংলাপের ভাষায় যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য প্রভাতকুমার তাঁহার প্রথমদিকের রচিত গল্পগুলিতে সংলাপের ভাষার আদর্শ ঠিক করিতে পারেন

নাই। তাই দেখি 'ভূত না চোর', 'কাজীর বিচার', 'কাটা মুণ্ড', 'বেনামী চিঠি', 'হিমানী' এই গল্পগুলির সংলাপে সাধুভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। আবার 'একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবন চরিত', 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'অঙ্গহীনা' এই গল্প তিনটির সংলাপ অংশে কখনও সাধু, কখনও চলিত এবং কখনও বা সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। সংলাপ রচনায় ভাষাগত এই অসঙ্গতি প্রভাতকুমার অল্প দিনেই সংশোধন করিয়া লইয়াছেন।

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে যেমন বহু বিচিত্র চরিত্র আসিয়া ভিড় করিয়াছে তেমনই বিচিত্র সংলাপও তিনি রচনা করিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে তিনি রোমাণ্টিক হইলেও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মুখে তিনি যে ভাষা দিয়াছেন তাহা একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আটপৌরে ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষা। সে ভাষায় মনের উচ্চতম ভাব সমুহের যথাযথ প্রকাশ ঘটিলেও আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রার ছবি তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার ছবি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও বৈদগ্ধপূর্ণ। তাঁহার পাত্রপাত্রীদের সংলাপ উপমা অলংকারের সৌন্দর্যে ঝলমল করে। তাহার সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় কথাকে এমন সুন্দরভাবে যদি আমরাও প্রকাশ করিতে পারিতাম। প্রভাতকুমারের ভাষা কিন্তু নিতান্তই ঘরের ভাষা।

আটপৌরে ভাষার দোষগুণ উভয়ই প্রভাতকুমারের ভাষায় বর্তমান। একদিকে সাধারণ মানুষের চরিত্র এবং জীবনযাত্রা যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই কোন গভীর ভাব রূপ পাইতে পারে নাই। এই কারণেই প্রভাতকুমারের রচনায় ভাবাত্মক অংশ নাই বলিলেই চলে। তাঁহার ভাষা সহজ সরল এবং সুখপাঠ্য বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষায় সেই ব্যঞ্জনাশক্তি নাই যাহার সাহায্যে নায়ক নায়িকার গভীর কোন অনুভূতি পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাঁহার ভাষা এত লৌকিক এত সুপরিচিত এত ঘরোয়া যে তাহার মধ্য দিয়া কোন সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করা কঠিন। যেখানে আটপৌরে জীবনযাত্রার কথা প্রকাশ পাইয়াছে সেখানে তাঁহার ভাষা আশ্চর্যরূপে সার্থক। যেমন 'রমাসুন্দরী'তে সীতানাথের অন্তঃপুরের চিত্র। কিন্তু যেখানেই তিনি জীবনের কোন সংকটমুহূর্তকে বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই তাঁহার ভাষা উপযুক্ত ভাবানুগ্রাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জন্যই দেখা যায় যেখানে ঘটনা পরম্পরা পাঠকের চিত্তকে এক নিবিড় দুঃখ ভারাক্রান্ত ঘটনার সম্মুখীন করিয়া দেয় সেখানে লেখক হয় পাশ কাটাইয়াছেন অথবা সেখানে

নায়ক নায়িকার আলাপের সুর তরল হইয়া anticlimax-এর সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন 'সতীর পতি' উপন্যাসে বিপিনবাবু নবনিশাকরের মত হীরালাল ও রেবতীর মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করিতে যাইতেছে—"সে জানে যে তাঁহাকে দেখিয়া উহারা লজ্জিত হইবেই, ইহাও বেশ বুঝিতে পারিবে যে উহাদের মিলনে শাঁখ বাজাইবার জন্য আমি আসি নাই……।"[৩] এতএব আর যাহাই হউক অবস্থাটা একটু সঙ্গীন। কিন্তু হীরালাল ও রেবতীর সহিত দেখা হইবার পর যে কথোপকথন হইল তাহা নিম্নরূপ—

রেবতী—আপনি কবে এলেন দার্জিলিঙে ?

বিপিন—আজই এসে পৌঁছেছি, আপনার শরীর কেমন আছে, বলুন দেখি। আপনার খুব অসুখ হয়েছিল শুনলাম।

এই প্রকার মামুলী শিষ্টাচারের পর বিপিন গম্ভীরভাবে হীরালালকে বলিলেন, "তুমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরছ, তোমার নিজের দোষেই কথাটা বাড়ীতে জানাজানি হয়ে গেছে। ……যদি বাড়ীর লোক ঠিকমত চিঠিপত্র পেত তা হলে এটা আর জানাজানি হত না।"[৪]

যেন সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া পড়াটাই হীরালালের জীবনের সমস্যা। হীরালালের দ্বিধাবিভক্ত ভালবাসা, তাহার দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ হৃদয়, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় তাহার অসহায়তা ইত্যাদি পাঠকের মনে যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারিত লেখকের আটপৌরে ব্যঞ্জনাশক্তিহীন ভাষার মরুপথে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। একই কারণে 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসটিরও রসহানি হইয়াছে। গভীর হৃদয়াবেগকে রূপ দিবার শক্তি প্রভাতকুমারের নাই বলিয়াই বিশেষ করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

……আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।……ব্যক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।"[৫]

প্রভাতকুমারের ভাষা বাহিরের অর্থকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু অন্তরের গতিকে প্রকাশ করিবার মত পর্যাপ্ত শক্তি তাহার কতটা আছে সে বিষয়ে যেন সন্দেহ জাগে।

প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসে বর্ণনার অপেক্ষা সংলাপের অংশই বেশী। প্রভাত-কুমার গল্প রচনায় প্রথম হইতেই সংলাপ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে তিনি এই সম্পর্কে উপদেশও প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"আজ কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থী হইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি। ছোট গল্পে, কথোপকথনের মাত্রা কতটুকু indulge করা যাইতে পারে? কোনও একটা মনের ভাব ফুটাইতে হইলে, লেখক নিজের জবানি সেটাকে জানায়, কিম্বা পাত্র-পাত্রীর মুখে পাঠককে জানিতে দেয়। কোনটা প্রশস্ত? অবশ্য দুই চাই। এসম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে নাটকের Province-এ encroach করা স্বরূপ পাপস্পর্শ করে কিনা, আমার গল্পে আমি যতটুকু কথোপকথনের আশ্রয় লই তা too little কিম্বা too much যে side-এর হউক, দোষের বিবেচনা করেন কিনা, সংশোধন আবশ্যক মনে করেন কিনা।

দেখুন, কোনও একটা complex মনের ভাব ফোটান, তাহা action এবং কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় নাকি? লেখক তাহাকে আগাগোড়া delineate করিতে চেষ্টা করিলে হয়ত একটু tideous হয়। আপনি কি মনে করেন?"[৬]

উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে প্রভাতকুমার সংলাপ বা কথোপকথনের প্রতিই বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছেন। গল্প উপন্যাসে চরিত্রোপযোগী সংলাপ ব্যবহারের ফলে তাঁহাকে বহু বিচিত্র সংলাপ রচনা করিতে হইয়াছে। সংলাপে তিনি প্রয়োজন বোধে ইংরাজি, আরবী-ফার্সী, হিন্দী ইত্যাদি শব্দ এবং বাক্য বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে অবাঙ্গালী চরিত্রের মুখের ভাষায় কিছুটা তাহার নিজ মাতৃভাষা দিয়া বাকী অংশে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই অনূদিত অংশে তিনি সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন। কোথাও কোথাও লেখক ইংরাজী সংলাপের বাঙ্গলা অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন। সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গলা ইংরাজি ব্যতীত হিন্দীও (আদর্শ এবং আঞ্চলিক উভয় জাতীয়ই) ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গলা সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তবে প্রধানত কলিকাতার কথ্য ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দী সংলাপের বৈচিত্র্য প্রভাতকুমারের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর মুখে তিনি বাঙ্গলামিশ্রিত হিন্দী যেমন ব্যবহার করিয়াছেন তেমনই শুদ্ধ হিন্দীও ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দীভাষীর মুখেও তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দী ব্যবহার করিয়াছেন। পুলিশ কনেষ্টবল, দ্বারোয়ান শ্রেণীর মুখে তিনি ভোজপুরী অথবা মগহী ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দীভাষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি একজন মাড়োয়ারির মুখের হিন্দী এবং একজন মৈথিল পণ্ডিতের মুখের হিন্দী একরূপ নয়।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের পণ্ডিতজীর ভাষা এবং 'মনের মানুষ' উপন্যাসের মাড়োয়ারি বাবুটির মুখের ভাষা তুলনা করিলেই পার্থক্যটি বুঝা যাইবে। আবার 'নবীন সন্ন্যাসী'তে পশ্চিমা সাধুজীর মুখের ভাষাকে হিন্দী না বলিয়া 'হিন্দুস্থানী' বা 'উর্দু' বলিয়া মনে হয়।

আমরা উদাহরণসহ প্রভাতকুমারের সংলাপ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতেছি—

(ক) অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির মুখের ইংরাজি বুকনি।

(১) "……কে হে ফেলো ?"[৭]

(২) "মিনষেটা প্রাণে বড় ফিয়ার হয়েছে।"[৮]

(৩) "আমরা হলাম ক্যালকাটাজ্ সন……।"[৯]

(৪) "আমরা সকলে এত ট্রাবোল্ নিয়ে থিয়েটার করছি।"[১০]

(৫) "অ্যাঁ ! এই কথা বলেছে ? ও সব বিলকুল ফলসো—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে ? তিনি কি আর বেঁচে আছেন ? গেল বছরের আগের বছর তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট্—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে। একেবারে সন্ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য ! তাঁর ছেলেরা এখনও আমাকে বেজোদাদা বলতে ইগ্নোরেণ্ট—অজ্ঞান।"[১১]

(খ) মেয়েলি ভাষা।

(১) ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গ্রেপ্তার করিলেন, বলিলেন, "এ কি রে শতেক খোয়ারী ?" কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি ?" "তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী ? খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন হাতী হচ্ছেন—আর এই সব বিঘ্নে হচ্ছে। কি হয়েছে বল।" কুসুম বলিল, "হতভাগা লক্ষ্মিছাড়া ম্যানকা আমায় দিলে ত আমি কি করব ? আমার বুঝি দোষ, বারে।"[১২]

(২) "কদিন থেকেই ত রাত্রে নীচের ঘরে খিল বন্ধ করে 'পুজোর হিসেব' তৈরী হচ্ছে। ও রে আমার পুজোর হিসেব করুণী রে।"[১৩]

(গ) নিম্ন শ্রেণীর ভাষা।

(১) মোক্ষদা সুন্দরী স্বর আর এক পর্দা তুলিয়া উত্তর দিল "ঈস্ ! রাগ দেখ পুরুষের। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন। জুতো পাবি কোথা, তাই শুনি ? বাপের জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস্ রে মিন্‌ষে ?"

দন্ত খিঁচাইয়া মিন্‌ষে চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোপ্‌রও হারামজাদী শূয়রকে বাচ্চি ! তুই আমার বাপ তুল্লি, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর ?"

মোক্ষদা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তুলেছি, তুলেছি। ঝাঁটা তুলিনি, এই তোর ভাগ্যি।

"তোল না ঝাঁটা, তোর কগাছা ঝাঁটা আছে আমি দেখি একবার। ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটীকে বিয়ে করে এনে রাজার হালে রেখেছি, তুই আমায় ঝাঁটা দেখাবি বৈকি! নৈলে আর কলিকাল বলেছে কেন? হায় রে।"

মোক্ষদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "মরি মা মশারি ছিঁড়ে। কি আমার নাজার হালে নেখেছেন গো:। আমি নোকের বাড়ী ধান ভেনে, বাসনমেজে, উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি, তাই গুবুর গুবুর চলে, নইলে ঐ বাকর কি দিয়ে ভরাতিস্ বল দেখি? খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল, উনি আমায় রাজার হালে রেখেছেন। যে পুরুষ রোজগার করতে জানে না, তার এত তেজ কেন?"[১৪]

(২) "দোহাই হুজুর আর আমার একটিও টাকা নেই। এই গ্যাখেন আমার কাপড় চোপড়। যেমন করে হোক, গ্যান আমায় নিব্বাহ করে কর্তা।"[১৫]

(৩) ......হিঁ বাবা, আমি পষ্ট শুনলাম, ও মা! ও মা! বলে ছেলে কান্‌তে নেগেছে।"[১৬]

(ঘ) পূর্ববঙ্গীয় ভাষা।

(১) গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি বাহে? বাবুর সাদি নাকি?" নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।"[১৭]

(২) ......না একটা বিটি ছাওয়া না কিছু শুধুই পয়সা দিমু হঃ।"[১৮]

(৩) কেহ বলিল—"হবিব ভাই, দিসনে। তোর ভেড়া তুই দিবি ক্যান্?" কেহ বলিল, "জুলুম? দেখি ত বকন্দাজের ছাওয়াল ক্যামনে এ ভেড়া নিয়ে যায়।"[১৯]

(৪) সারেঙ বললে, "না মিস্ সাহেব, পাজি কোথায় পামু? আমরা কি হাঁদু যে পাজি রাখমু?"[২০]

(ঙ) মুসলমানী ভাষা।

(১) "উনি কি তোমাদের হেঁদু? ইসাইযে। সাহেব বলবে। সাহেবের মেম নেই, এন্তেকাল করেছে। এ কুঠীতে সাহেবের দুই বেটী, এক বেটা থাকে। ছোট সাহেবের এখনও সাদি হয়নি। ছোট মিসবাবারও সাদি হয়নি। বড় দামাদ সরকারী কাজে বিলায়েৎ মুলুকে গিয়েছে, তাই বড় বেটী এখন বাপের কাছে থাকে। তার দুই লেড়কা, তিন লেড়কী। বাস্।"[২১]

(২) "আমাদের পরশী এক মুসলমান মাস ছয় হল ইন্তেকাল করেছে। তার একটি বেওয়া আছে, কমসিন্ আর বেশ খাপ সুরতি—তারই সঙ্গে আমি নিকা বসবার বন্দোবস্ত করেছি। তারই জন্যে কিছু জেওর খরিদ করতেই এখানে আসা। কিন্তু তখন কি জানি কলকাতায় এ রকম হল্লা তা হলে আসতাম না। যা হোক এসে যে আপনাদের খেলাফতের পাহানা পেকড়েছি, তাই খয়ের, নৈলে নসীবে কি হত বলা যায়না।" [২২]

(চ) মাতালের মুখের ভাষা।

(১) "লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলমেন, তোমরা ভেবেছো মাতালছ্য নানাভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই ছব বলছে—কাল এছব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয় —হাম যায়েঙ্গা—আলবৎ যায়েঙ্গা—মুখ ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তারপর এই বাছায় এনে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিছটি কথায় ইছতিরি লোককে বছীভূত করতে কতক্ষণ ?"[২৩]

(২) ……কিন্তু কনক তুঃ তুমি ভাই কোনও কঃ কর্মের নও। সেই ত বউরাণী বিঃ বিধবা বিবাহে রাজি হল—আমার তরফ থেকে ত আর রাজি করাতে পারলে না……ভেঁচে থাক ভিত্তেসাগর ছিরজীবী হয়ে থুমি।"[২৪]

(৩) সতীশ বলিল, "শালা বল্লে তোর গাল হল বুঝি ? তুই কার ভাই হলি জানিস্। ঐ যে বিবি হুঁয়া বৈঠা হায় তুই তার ভাই হলি। এ বিবি কোন হায় জানতা ? কছু জানতা। হুস্বাবা এ যে সে বিবি নেহি। রঙ্গালয় জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সম্রাজ্ঞী অদ্বিতীয়া গায়িকা ও নাচিকা রেবতী সুন্দরীকা নাম শুনা হায় ? ইনি সেই রেবতী সুন্দরী, হমারা ওয়াইফ—ফাইভ হাণ্ড্রেড রুপীজ্ এ মান্থ হাম ইনকা সেলারি দেতা হায় শরীর অসুস্থ হুয়া থা, হাওয়া খানেকো বাস্তে চুনারমে লে গিয়া, টু থাউজেণ্ড রুপীজ্ হাম খরচ কিয়া। ইনকো ভাই হোনেমে তুমরা এতনা আপত্তি।"[২৫]

(৪) "এ কি ? আজ হেন বেশ কেন পি পি প্রিয়ে ? সাবান, পাউডার ভেজুষা সব ফুঃ ফুরিয়ে গেছে ? ধোবা আসেনি ? আহা কি পরিতাপ। কী পরিতাপ। কীঈ পরিতাপ। একাকিনী শোকাকুলা এ রাম বাগানে কাঁদেন পেঁচার বাচ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে।"

বলিয়া রমেশ ধপাস্ করিয়া তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "হরিবাবু, প্রিয়ে আছ কেমন বন্ধু ? বল হরি হরিবোল।"[২৬]

(ছ) হিন্দী সংলাপ।

(১) কনেষ্টবল বলিল, "ভাগ গেল্লাই কা ? আপন আঁখিয়াসে হাম্ কুদতে দেখলি হো, তোহর কিরে।"[২৭]

(২) সাহেব একখানি চপ্ কাটিয়া চর্বন করিবার বৃথা চেষ্টার পর রাগিয়া বলিলেন, "লে যাও। ফেঁক দেও। কুত্তাকো মৎ দেও উসকো দাঁত টুট যায়েগা।"[২৮]

(৩) পণ্ডিতজী বলিলেন, "ঠিক বাত বাবুজী খুব ঠিক। দেখিয়ে জনকজী মহারাজ কেত্তা ভারি মাহাৎমা থেঁ—রাজর্ষি থেঁ—গৃহী ভী থেঁ।"[২৯]

(৪) "দেখো জী, তুমকো রোজ শিখলাতা, কব শিখেগা? পহলে বাহরকা মেমসাহেব, তব ঘরকা মেমসাহেব, তব বাহারকা সাহেব, তব ঘরকা সাহেব। সমঝা? খেয়াল রাখ্‌খো।"[৩০]

(৫) "আজ চার বাজেকে পাসিঞ্জার মে। হাম ইস্ মকানকা মনৈজর হাঁয়। কোই তিন সাড়ে তিন বাজে যমুনা আয়া, ঘরকা কিরায়া যো বাকী থা সো দিয়া, এক মহিনাকা কিরায়া পেশগী দিয়া, আপনা চিজবস্ত লেকে চলা গিয়া।"[৩১]

(জ) সংলাপে অশুদ্ধ হিন্দী।

(১) 'ঐ হুঁয়া। মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠকে বৈঠকে জামরুল খাতা হায়।"[৩২]

(২) "হাম যে যে বাৎ বোলতা হায় মন দেকে শুনো। তেরা যেত্তা রূপিয়া একঠো লেকড়িকা বাকসমে বন্ধ করনা। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী রাতমে, কোই বিধবা আওরৎকো কহনা কি তুম চুল এলো করকে মাটিমে উবুড় হয়ে পড়কে, আপনা দাঁতসে একঠো ঘলঘসে গাছকা শিকড় উপরায়কে লাও। ঐ শিকড় লাল সূতাসে বাকসমে বাঁধ দেনা। বাকসমে পিতলকা তালা বন্ধ করকে, চাভি ঐ বিধবা আওরৎ কো দে দেনা। রোজ রাত দুপুরমে বাক্সকে উপর একশো আটবার মন্তরকো জপ করনা। এক মাহিনা বাদ যব ফিন কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশীকা রাত আওয়েগা—আওরৎকে বোলয়কে চাভি খোলনা। তব দেখোগে কি এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো গিহা।"[৩৩]

(৩) "তুমকো এৎনা করকে বোলতা হায়, হামলোগ বাহার যানেসেই পাংখা বন্ধ কর দিও, তুমারা হুঁস্ নেই হোতা হায়! দেখো তো সাঁঝ সে রাত এগারো বাজে তক পাংখাঠো চলা ইস্কা লোকসান্ কোন্ দেগা?"[৩৪]

(৪) ......কাঁদনেসে ক্যা হোগা? গাড়ী লড় গিয়া। হাম লোগ সব চাপা পড় গিয়া। তুমারা নাম ক্যা?"[৩৫]

(৫) "হ্যাঁ—না—এখনও উসেকা চেলা নেহি কিয়া। লেকেন হামরা চেলা হোনেকে বাস্তে উসকো বহুৎ আকিঞ্চন।"[৩৬]

(ঝ) সংলাপে অশুদ্ধ বাঙ্গলা।

(১) "হেল্লো মুখটিয়ার টুমি হে খানে খি খড়িতেছে ?...ইহা টোমার শ্বশুর বাড়ী আছে ? উটম্ হামি টোমার শ্বশুর বাড়ী সার্চ খড়িবে।"[৩৭]

(২) "টুমি বড় শয়তান আছ—**A downright scoundrel,** পুলিশের উপযুক্ত লোক। টোমার বয়স কম হইলে আমি টোমায় পুলিশে ডারোগা কার্য দিট। এখন গৃহে যাও কল্য প্রাতেই টুমি রঙ্গপুর পরিট্যাগ করিয়া যাইবে।"[৩৮]

শব্দ ঃ—

(ক) আরবী ফার্সী শব্দ।[৩৯]

আওলাৎ, আওরৎ, আরজ, আলাহিদা, আসকতি, ইম্মশরিফ, ইস্তেকাল, এজাজৎ, কসুর, কমসিন, কাফি, কেরায়া, খয়ের, খসম, খিদমত, খৎ, খিলাফৎ, খাতির জমা, গোলাম গরীবখানা, জান, জমায়েৎ, জবাহ, জিম্মা, জ্যাবর, জাঁহাপনা, তগদির, তবিয়ৎ, দোস্ত, দিল আরাম, দিলখুস, দুস্মনী, নিকা, নসীব, নাদারৎ, নাজনী, নজর সানি, না লায়েক, পুষিদা বাৎ, পাহানা, বাহানা, বিবি, বেইমানী, বদিয়তি, বেহেতর, বেহাল, বেহেস্ত, বহি, মোসাফির-খানা, মাফ, মাফী, মাদা, রিস্তাদার, লবজ্, শওহর, সেলাম-আলেকুম, হপ্তা, হামছায়া, হুরী।

(খ) ইংরাজী শব্দ।

(১) তাঁহার পশ্চাদ্ ভাগ হইতে একখণ্ড সুদীর্ঘ **শিকঁ** ঝুলিতেছে।[৪০]

(২) উহা পড়িলে **dowdy** (বুড়ো বুড়ো) দেখায়।[৪১]

(৩) **শ্রোবারি** অতিক্রম করিয়া বার্চহিলের নিকট পৌঁছিল।[৪২]

(৪) ঘোষ বললেন এস **পটলাক** (**Potluck**) খেয়ে বাড়ী যেও।[৪৩]

(৫) পাখা টানিবার **থং** বাহিরেই ঝুলিতেছিল।[৪৪]

(৬) মাথায় একটি সাদা উলের **ফাসিনেটর** জড়াইয়া সুশী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে।[৪৫]

(৭) আবার গুজব উঠিয়াছে সিমলা শৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে আরও কয়েকজন লোককে **ডিপোর্ট** করা যাইবে।[৪৬]

(৮) তার **রিপোর্টে** যদি কোন **ভেলু** থাকত তাহলে সেইদিনই আমাদের খানাতল্লাসী হত না।[৪৭]

(৯) দাঁড়াও **প্ল্যানটা** আগে মাথার মধ্যে বেশ করে **মেচিওর** করি তবে বলবে।[৪৮]

(১০) মাঝে মাঝে তর্কযুদ্ধও যে না বাধিল তাহা নহে কিন্তু সে যে **ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ**।[৪৯]

(১১) কিন্তু ভাই এখন খুব **সিরিয়াসলিই** বলেছি—মোটেই ঠাট্টা নয়।[৫০]

(১২) এই উক্তিতে তাঁহার **প্লীবিয়ন অরিজিনের** প্রতিও কটাক্ষ আছে।[৫১]

(১৩) তাঁহার মত যে **হোমষ্টডিই আসলষ্টডি** সুতরাং তিনি কন্যাকে কলেজে দিলেন না।[৫২]

(১৪) মরক্কো চামড়ার একটি ছোট **প্লেগি ব্যাগ** হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন।[৫৩]

(গ) ইংরাজী শব্দের অনুসরণে নূতন বাঙ্গলা শব্দ গঠন।

(১) ছোঁড়া চাকর[৫৪] (Boy Servant)

(২) পুষ্প বালিকা[৫৫] (Flower Girl)

(৩) সঙ্কেত লেখক[৫৬] (Stenographer)

(৪) মশারি বক্তৃতা[৫৭] (Curtain Lecture)

(৫) সমস্তটা কাঠের[৫৮] (All Wood)

(৬) বিদ্যুৎ পাখা[৫৯] (Electric Fan)

(৭) দুধ মা[৬০] (Wet-Nurse)

(৮) বাইবেল বাক্য[৬১] (Gospel-truth)

(ঘ) নূতন শব্দ সৃষ্টি।

নাচিকা[৬৩], ভক্তিনী[৬৪], অহিঁদুয়ানি[৬৫], কালকৈতিক[৬৬], উপদার।[৬৭]

(ঙ) গ্রাম্য শব্দ।

ভুজঙ[৬৮], আজাড়[৬৯], ধাঁচা।[৭০]

(চ) অসঙ্গত বা অনুচিত প্রয়োগ।

(১) কর্তাকে **পরাস্ত**[৭১] মানিতে হইল।

(২) পঙ্কজিনীর **অশ্রাব্য**[৭২] স্বরে গোপনে মত প্রকাশ করিলেন।

(ছ) ধনাত্মক শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য।[৭৪]

(১) পরকলাগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া টুনটুন মৃদু শব্দ হইতেছিল।

(২) ...উন্মোচন করিতে খুড় খুড় করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

(৩) এক আধটা জন্তু কোথা হইতে বাহির হইয়া মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসে।

(৪) ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

(৫) চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

(৬) গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

(৭) বুকটি দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

(৮) ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল।

(৯) মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল।

(১০) বিজ্ বিজ্ করিয়া কি বকিতে লাগিল।

(১১) হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

(১২) মধ্যাহ্নের রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে।

(১৩) পায়ের চারি গাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিতে করিতে...

(১৪) ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছে।

(১৫) টুক্ টুক্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম।

(১৬) হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

(১৭) সন্ সন্ করিয়া বায়ু বহিতেছে।

(১৮) টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

(১৯) হন্ হন্ করে চলে গেল।

(২০) টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে।

(২১) বৃদ্ধা থর থর করিয়া চলিয়া গেল।

(২২) তিনি অভিমানে গম্ গম্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(২৩) টুক্ টুক্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম।

(২৪) খস্ খস্ করিয়া কলম চালাইলেন।

(২৫) গ্রীষ্মকাল ঝুর ঝুর করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে।

(২৬) এই কথা শুনিয়া ডাকিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বাক্য :—

(ক) বাক্য মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ ব্যবহার।

(১) সে এখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। **আত্মানাং সততং রক্ষেদ দারৈরপি ধনৈরপি**—উপদারের আর কথা কি ?[৭২]

(২) **মৌনং সম্মতি লক্ষণং**—এই সূত্রের অনুরূপ কোনও সূত্র মুসলমান শাস্ত্রেও আছে বোধ হয়।[৭৬]

(৩) বিপিনবাবুর মনে হইল এই স্ত্রীলোক যত বড় অভিনেত্রীই হউক না কেন, "**তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ** কুস্থানে কেনই বা প্রবেশ করিব।"[৭৭]

(৪) নইলে আর শাস্ত্রে বলেছে—বেশ্যা **শ্মশান কুসুমা ইব বর্জনীয়া**।[৭৮]

(৫) **ভাবনা যাদৃশীর্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ।** তবে আমার বিঘ্নাশঙ্কা কোথায়। [৭৯]

(৬) স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্য প্রতিরাত্রে কিছু না কিছু নূতন জিনিষ উপহার দিতেন। **নিস্পৃহস্যতৃণংজগৎ।** [৮০]

(৭) **কণ্টকেনৈব কণ্টকং** এই নীতি বাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। [৮১]

(৮) ইদানীং শ্রীনিবাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ **গতিরন্যথা** ছিল না। [৮২]

(৯) বিশেষ তখন সে **যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা**—বয়স তাহার ১৬/১৭ বৎসর মাত্র। [৮৩]

(১০) সেখানে **কলৌ সুজনা ইব** চুলের সংখ্যা খুবই কম……। [৮৪]

(গ) বাক্যমধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যান্য কবিদের কাব্যাংশ ব্যবহার।

(১) কিন্তু আমি আপনাকে **যেতে নাহি দিব**…। [৮৫]

(২) বটে! **আমি অতিথি তোমারই দ্বারে ওগো বিদেশিনী।** [৮৬]

(৩) কিন্তু পাঁচজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ আর নির্জনে **কপোতকপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে** দেখা সাক্ষাৎ এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। [৮৭]

(৪) বিপিনবাবু বলিলেন, রবিবাবুর একটা লাইন খালি মনে পড়ছে—**শৃংখল বন্দীরে ছাড়ি** আপনি পলায়ে গেছে। [৮৮]

(৫) বারম্বার অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল—**এ কি মুক্তি**—এ কি **পরিত্রাণ! কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে।** [৮৯]

(৬) সে গর্বিতা মদোদ্ধতা, সরোজবাসিনী **ধরার ধূলির চেয়ে নীচে** হইয়া গিয়াছে। [৯০]

(৭) অবিনাশ রবিবাবু কোট করিয়া বলিল, **পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা জান না নিজে, মোহন কি যে তোমার মালিকা।** [৯১]

(৮) নিস্তব্ধ রজনী মেঘান্তে এখন **চৈত্র নিশীথ শশী** আকাশ হইতে জ্যোৎস্না মদিরা ঢালিতেছিল। [৯২]

(৯) ধনী ভাবী শ্বশুরের সেই সুসজ্জিত ড্রইংরুমে সুখাসনে বসিয়া অধীর প্রতীক্ষা পরে কক্ষমধ্যে সেই **সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতার** ন্যায়, **চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালার** মত কন্যার সহসা আবির্ভাব, চারিচক্ষুর সেই প্রথম মিলন কি—অশুভক্ষণেই মিলন। [৯৩]

(১০) প্রেম যে **কেবলি যাতনাময়** তাহাতে যে **কেবলি চোখের জল** একথা কে অস্বীকার করিবে? [৯৪]

(১১) **অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্মল**, বিধাতার সহস্ত, নির্মিত একটি শুভ্র আত্মা। [৯৫]

(১২) **কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা, অগ্নি অনিন্দিতা** [৯৬]।

(ঘ) **ইংরাজি রীতি প্রভাবিত বাক্য** :—

(১) হাস্যকারী আর কেহ নয়, সেই দারোয়ান নাথু মণ্ডল। [৯৭]

(২) যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়। [৯৮]

(৩) ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্বাবধিই নাকি মানবচিত্তে নিজ ছায়াপাত করিয়া থাকে। [৯৯]

অলংকার :—

(ক) উপমা—

১। "কিন্তু সন্ধ্যাগমে দিবালোক যেমন দেখিতে দেখিতে কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামিভক্তিও কোথায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল বালিকা তাহার ঠিকানা পাইল না।" [১০০]

২। "বালকের হাত হইতে একটি খেলনা কাড়িয়া লইয়া সেটি লুকাইয়া, অন্য শত শত খেলনা তাহার হাতে দিলেও সে যেমন আছড়াইয়া ফেলে, শশিভূষণের প্রণয়শিশুও সেইরূপ মনোরমা ভিন্ন অন্য কোনও দেব, দেবী নারী বা কিন্নরীকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে চাহিল না।" [১০১]

৩। "শ্যামাচরণবাবু বামন, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন।" [১০২]

৪। "কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিমাপ উচ্চক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" [১০৩]

৫। "বারুদের স্তূপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে এই নবীন বন্ধুত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।" [১০৪]

(খ) উৎপ্রেক্ষা—

১। "কাঁটা বনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল।" [১০৫]

২। "তিনি যেন আমার মূর্তিমান প্রলোভন, আমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার জন্য সংসার সুখের নিষিদ্ধফল হাতে করিয়া আহ্বান করিতেছেন।" [১০৬]

৩। "ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথম কয়েক মুহূর্ত মোহিতের মনে হইল সে যেন সুখের সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়াছে।" [১০৭]

(গ) রূপক ঃ

১। "সেই নরাকার বৃটিশ বন্যজন্তুটি সেইমাত্র পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।" [১০৮]

২। "নরশোণিতের পরিবর্তে সেই শিশুরাক্ষস স্বীয় অগ্নিময়ী তৃষা জলেই নিবারণ করিতে বাধ্য হইল।"[১০৯]

৩। "প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল এক গলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা, তাহার সর্বশরীরকে আলিঙ্গন করিল। চারিদিকে পদ্মবিকাশ! ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।"[১১০]

৪। "যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এতদিন পুজা করিলাম, মুহূর্তের মধ্যে, তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালমুর্তি বাহির হইয়া পড়িল।"[১১১]

(ঘ) Anti-climax ঃ

১। "অধিকন্তু ন দোষায়, হুঁকোর জল ছাড়া।"[১১২]

২। "বিজয়ের পিপাসা পাইয়াছিল, তাই সে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া যুবতীকরপল্লব-নির্মিত সুগন্ধি কপিত্থরসযুক্ত তক্রের অভাবে লছমন কর্তৃক পরিপুরিত সোরাই হইতে এক গ্লাস কলিকাতার কলের জল ঢালিয়া লইয়া পান করিল।"[১১৩]

(ঙ) Anti-thesis (বক্রোক্তি) :

১। "বর্তমানযুগের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' ও 'নারী অধিকার' তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায় সরমা স্বামীর জুতা খুলিয়া লইলেন, চটি জুতা পরাইয়া দিলেন।"[১১৪]

২। "রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে পারার চেয়ে অসময়ে বাড়ীর লোকের উপবাস নিবারণ করতে পারা অল্প বাহাদুরীর নয়।"[১১৫]

৩। "এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, যতীনবাবু লোকটি বেশ অমায়িক নিরহঙ্কার উচ্চ শিক্ষিত হইলেও ঝাঁঝালো নহেন।"[১১৬]

(চ) Periphresis (বক্রভাষণ) :

১। "সোমবার প্রাতে সতীশবাবু যখন মুঙ্গের হইতে বাড়ী ফিরিলেন তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে এবং তাহা কেবল গাড়ীর কষ্টর জন্যই নহে।"[১১৭]

(ছ) **Innuendo :**

১। …আসিয়া দেখিলেন পাখী উড়িয়া গিয়াছে।"[১১৮]

(জ) **Pun (শ্লেষ) :**

"তার উপর আবার উকীলের সংখ্যা বর্ধমানে এত বর্ধমান যে রাস্তায় একটা লাঠি মারলে তিনটি উকীল মরে যায়।"[১১৯]

(ঝ) **Epistrophe (অন্ত্যাবৃত্তি) :**

১। "ভাই নাই, বোন নাই, খুড়া নাই, জেঠা নাই, মামা নাই, পিসা নাই, তাহার আর কেহই নাই।"[১২০]

২। "আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দ্বিধাও নাই, সঙ্কোচও নাই।"[১২১]

প্রকৃতি বর্ণনা :

১। প্রকৃতি প্রভাতকুমারের সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। তাঁহার গল্প উপন্যাসে কোথাও কোথাও তিনি মাত্র অল্প কয়েকটি বাক্যের সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রকৃতি চিত্র আঁকিয়াছেন। অবশ্য বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রকৃতি বর্ণনায় যে ঐশ্বর্য লক্ষিত হয় প্রভাতকুমারে তাহা নাই। প্রভাতকুমার হইতে আমরা প্রকৃতি বর্ণনার দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম।

২। "জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগর গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।"[১২২]

৩। "পূর্বদিক লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র পক্ষীর কলকূজনে নদী তীর মুখরিত। ক্রমে সে রক্তাভা গাঢ়তর গাঢ়তম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নবোদিত সূর্যের একটি কনকরশ্মি, ভগবানের আশীর্বাদের মত ছুটিয়া আসিয়া ধ্যানরত মোহিতের ললাটদেশ স্পর্শ করিল।"[১২৩]

৪। "গ্রীষ্মকাল ঝুর ঝুর করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। সমস্ত মাঠের গ্যাস লণ্ঠন যেন নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রজনী।"[১২৪]

৫। "শুক্লাদশমীর চাঁদ তখন গগনের মধ্যভাগে আরোহণ করিয়াছে, বারান্দার সম্মুখস্থ খোলা জমিটুকুর সবুজ রং জ্যোৎস্নালোকে কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।"[১২৫]

৬। "সূর্য অস্তমিত হইলেও পশ্চিম গগনে এখনও বর্ণলীলা চলিতেছে। সেখানে মেঘ বালকগণ ছুটাছুটি করিয়া যেন ফাগ খেলিয়া বেড়াইতেছে।"[১২৬]

৭। "চৈত্র মাসের সুবিমল জ্যোৎস্নাধারায় গগনভুবন প্লাবিত।"[১২৭]

॥ টীকা ॥

১। বাঙলা সাহিত্যে গদ্য : পৃঃ ২০৮।

২। "পোষাকি গদ্যে চলিত ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলেন প্রথম সবুজপত্রে প্রকাশিত রচনায়।" বা, সা, ই, (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ২৩২।

৩। 'সতীর পতি' : পৃঃ ২৯৩।

৪। ঐ, পৃঃ ২৯৮।

৫। 'ছন্দ' : র, র, (১৪ শ খণ্ড) পৃঃ ১৫৪।

৬। 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫, পৃঃ ১৬৯।

৭। 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প, পৃঃ ১১৬।

৮। ঐ, পৃঃ ১৩২।

৯। ঐ।

১০। ঐ, পৃঃ ১৩৯।

১১। 'মাষ্টার মহাশয়', প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪১।

১২। 'প্রণয় পরিণাম', প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১১৩।

১৩। 'অদ্বৈত বাদ', প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৮২।

১৪। 'প্রেম ও প্রহার', ঐ, পৃঃ ২৫৭।

১৫। 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৯১।

১৬। 'দুধ মা', মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৮, পৃঃ ১০০৭।

১৭। 'খালাস', প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৩০।

১৮। 'বাজীকর', প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৯।

১৯। 'রত্নদীপ', প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৪৬৩।

২০। 'মনের মানুষ', পৃঃ ১৪৫।

২১। 'কানাইয়ের কীর্তি' নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প, পৃঃ ১৯৭।

২২। 'সতীর পতি', পৃঃ ২৩।

২৩। 'পোষ্ট মাষ্টার', প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ২২৫।

২৪। 'রত্নদীপ', প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৪৯০।

২৫। 'সতীর পতী', পৃঃ ৩৪।

২৬। 'মনের মানুষ', পৃঃ ২৫১।

২৭। 'নিষিদ্ধ ফল', প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৪৯।

২৮। 'আত্মতত্ত্ব,' ঐ ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৪।

২৯। 'নবীন নন্ন্যাসী,' প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৩০৪।

৩০। 'মনের মানুষ', পৃঃ ১২৫।

৩১। ঐ, পৃঃ ২৩৪।

৩২। 'নিষিদ্ধ ফল', প্র, গ্র, (ব) ৪র্থ ভাগ পৃঃ ১৪৮।

৩৩। 'নবীন সন্ন্যাসী', প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৩২৯।

৩৪। ‘মনের মানুষ’, পৃঃ ২১২।
৩৫। ‘রেলে কলিসন’, ‘জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প,’ পৃঃ ১২০।
৩৬। ‘নবীন সন্ন্যাসী’, প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৭৩।
৩৭। ‘রসময়ীর রসিকতা’, প্র, মু, শ্রে, গ, পৃঃ ১৩০–৩১।
৩৮। ‘বাজীকর’, প্র, গ্র, (ব) ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৩।
৩৯। শব্দগুলি প্রভাতকুমারের বিভিন্ন গল্প উপন্যাস হইতে গৃহীত।
৪০। ‘সত্যবালা’, প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৬৭।
৪১। ঐ।
৪২। ঐ, পৃঃ ৭৪।
৪৩। ঐ।
৪৪। ‘সিন্দুর কৌটা,’ প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ২১।
৪৫। ঐ।
৪৬। ‘সম্পাদকের আত্মকাহিনী’, ‘গল্পবীথি’, পৃঃ ৫৪।
৪৭। ঐ।
৪৮। ‘সতীর পতি’, পৃঃ ৩০।
৪৯। ঐ, ১০৭।
৫০। ঐ, পৃঃ ২০৫।
৫১। ‘শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি’, প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৬৫।
৫২। ‘বিলাত ফেরতের বিপদ, গল্পাঞ্জলি’, পৃঃ ৬৯।
৫৩। ঐ, পৃঃ ৭০।
৫৪। ‘কুড়ানো মেয়ে,’ প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৬৩।
৫৫। ‘প্রবাসিনী’, প্র, গ্র, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৩৩।
তুঃ বঙ্কিম, ‘পুষ্পনারী’ (রজনী)।
৫৬। ‘নবীন সন্ন্যাসী’, প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ২১৭।
৫৭। ‘বিদায় বানী’, পৃঃ ১৩৯।
৫৮। ‘গহনার বাক্স’, প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২৪।
৫৯। ‘সতীর পতি’, পৃঃ ১০৭।
৬০। ‘দুধ-মা’, ‘মাসিক বসুমতী’ চৈত্র, ১৩৩৮।
৬১। ‘বাল্যবন্ধু’, গল্পাঞ্জলি, পৃঃ ৪৮।
৬৩। ‘সতীর পতি’, পৃঃ ৩৪।
৬৪। ‘মনের মানুষ’, পৃঃ ৪৫।
৬৫। ঐ, পৃঃ ২৬৭।
৬৬। বিলাতী থিয়েটার, প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৫।
৬৭। ‘সতীর পতি’, পৃঃ ৪২।
৬৮। ‘সত্যবালা,’ প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭৫।

৬৯। 'নবীন সন্ন্যাসী', প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৬১।

৭০। ঐ, পৃঃ ২৬৫।

৭১। 'গুরুজনের কথা', প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯৭।

৭২। 'খোকার কাণ্ড', 'গল্পবীথি' পৃঃ ১২।

৭৪। প্রভাতকুমারের রচনায় ধন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য লক্ষণীয়। এস্থলে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

৭৫। 'সতীর পতি', পৃঃ ৪২।

৭৬। ঐ, পৃঃ ৬০।

৭৭। ঐ, পৃঃ ১৪৮।

৭৮। ঐ, পৃঃ ৩৪০।

৭৯। 'ভুলভাঙ্গা', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১২২।

৮০। ঐ, পৃঃ ১২৯।

৮১। 'বেনামী চিঠি', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫২।

৮২। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, ঐ, পৃঃ ১৬৩।

৮৩। 'সুখের মিলন', পৃঃ ১৮২।

৮৪। 'নিষিদ্ধ ফল', প্র, গ্র (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৪১।

৮৫। 'সতীর পতি', পৃঃ ৭৩।

৮৬। ঐ, পৃঃ ১৬২।

৮৭। ঐ, পৃঃ ২০৭।

৮৮। ঐ, পৃঃ ৩৪২।

৮৯। 'পত্নীহারা', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃ. ১২৪।

৯০। শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, ঐ, পৃঃ ১৬৯।

৯১। 'উপন্যাস কলেজ', যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প পৃঃ ৬১।

৯২। 'মনের মানুষ', পৃঃ ৯১।

৯৩। 'বিলাসিনী', বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প, পৃঃ ১। বাক্যটিতে একই সঙ্গে কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের, কাব্যাংশের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৯৪। 'প্রণয় পরিণাম', প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ১১৩।

৯৫। 'সচ্চরিত্র', ঐ, পৃঃ ১৪৪।

৯৬। 'দিব্যদৃষ্টি, মাসিক বসুমতী' আশ্বিন ১৩৩৬, পৃঃ ৯৪০।

৯৭। 'বিষবৃক্ষের ফল', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯৯।

৯৮। 'প্রতিজ্ঞা পূরণ', ঐ (২য় খণ্ড) পৃঃ ৬৭।

৯৯। 'সত্যবালা,' প্র, গ্র, (ব) ৫ম ভাগ, পৃঃ ৬৫।

১০০। 'কলির মেয়ে,' প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৮৬।

১০১। ঐ।

১০২। 'অঙ্গহীনা', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড), পৃঃ ২।

১০৩। 'ভূত না চোর' ? ঐ, পৃঃ ৩৭।
১০৪। 'বিষবৃক্ষের ফল', ঐ, পৃঃ ১৯১।
১০৫। 'কলির মেয়ে', ঐ, (২য় খণ্ড), পৃঃ ৮৭।
১০৬। 'ভুল ভাঙ্গা', ঐ, (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৩৮।
১০৭। 'নবীন সন্ন্যাসী', ঐ, (২য় খণ্ড), পৃঃ ৪৪৮।
১০৮। 'গুরুজনের কথা', ঐ, পৃঃ ২০৪।
১০৯। 'কুমুদের বন্ধু', গল্পবীথি, পৃঃ ২৬৫।
১১০। 'অঙ্গহীনা,' প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫।
১১১। 'ভুলভাঙ্গা', ঐ, পৃঃ ১৪২।
১১২। 'গহনার বাক্স', প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ পৃঃ ৩২৬।
১১৩। 'সিন্দুর কৌটা,' ঐ, পৃঃ ৮৭।
১১৪। 'গহনার বাক্স', ঐ, পৃঃ ৩২৪।
১১৫। ঐ, পৃঃ ৩২৭।
১১৬। 'নবীন সন্ন্যাসী,' প্র, গ্র, (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৪৫।
১১৭। 'গহনার বাক্স', প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২৯
১১৮। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৬৭
১১৯। 'গহনার বাক্স', প্র, গু, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩০।
১২০। 'জীবনের মূল্য', পৃঃ ৭১।
১২১। 'ভুল ভাঙ্গা', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১২৯।
১২২। স্বর্ণ সিংহ', ঐ, পৃঃ ৪৯।
১২৩। 'নবীন সন্ন্যাসী' ঐ, (২য় খণ্ড), পৃঃ ৪৭৪।
১২৪। 'প্রত্যাবর্ত্তন, ঐ, (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৪৩।
১২৫। 'সিন্দুর কৌটা' প্র, গ্র, (ব) ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯।
১২৬। ঐ।
১২৭। 'ভুল ভাঙ্গা', প্র, গ্র, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৬০।

পরিশিষ্ট

বালিগঞ্জ

পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি (১) ২৬শে ভাদ্র রাত্রি, ১৩২১

আধুনিক রোমিও

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এই ছিল যে বাল্যবিবাহ ভাল এবং তাহা হওয়াই উচিত, কিন্তু বরকন্যা একটু পরিণত বয়স প্রাপ্ত না হইলে, তাহাদের একত্র বাস বিধেয় নহে। তাঁহার পুত্র শ্রীমান অখিলপদ ষোড়শ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধুর বয়ক্রম তখন দশ বৎসর মাত্র তাহার নাম নন্দরাণী। বাপের বাড়ীতে সকলে তাহাকে রাণী বলিয়াই ডাকিত।

বিবাহের একবৎসর পরে নন্দরাণী শ্বশুরালয়ে আসিল। কালীপদ বাবুর অন্তঃপুরে তাহার স্ত্রী, একটি বিধবা ভগিনী এবং অবিবাহিতা কন্যা ছিল। কন্যাটি বধুর অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট তাহার নাম কমলমুখী।

অখিল তখন কলেজে পড়িতেছে। বাহিরের ঘরেই তাহার শয়নের ব্যবস্থা। দিবসে আহারাদি করিবার সময় সে অন্তঃপুরে যাইত। তাহার মা পিসীমা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন মাঝে মাঝে দুর হইতে অখিল দেখিতে পাইত রঙীন শাড়ী জড়িত (?) একটি মেয়ে ঝুম ঝুম করিয়া মল বাজাইয়া যাইতেছে।

দুই মাস থাকিয়া বধু পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এ দুইমাসে, একদিনের জন্যও বালিকা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বাবার উপর তাহার রাগ হইত—কিন্তু কি করিবে উপায় নাই।

তাহার শ্বশুরবাড়ী ভবানীপুরে। শ্বশুরের বাড়ীখানি প্রকাণ্ড। চারিদিকে বৃহৎ কম্পাউণ্ড। রাণী গৃহে ফিরিলে তাহার বোনেরা তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বরের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয় নাই, শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। রাণীর বড় বোনের বাগবাজারে বিবাহ হইয়াছিল। সে বলিল,—"আচ্ছা, আমি শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাই তারপর তোদের দেখা করিয়ে দিচ্ছি।"

অখিলকে বাগবাজারের বাড়ীতে দিদি নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। চিঠি বাড়ীর ঠিকানায় গেল না—কলেজের ঠিকানায় গেল। অখিল কলেজ পলাইয়া শ্যালিকার

আলয়ে গিয়া, স্ত্রীর সহিত প্রথম আজ দুই বৎসর পরে আলাপ পরিচয় করিল। এইরূপ মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। অখিলের পিতা কিছুই জানিলেন না।

লেখাপড়া অখিলের ঘুচিয়া গেল। কেবল আবার কতদিন পরে রাণীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইবে এই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিত।

ক্রমে সে চিঠি লিখিতে লাগিল। স্ত্রীকে চিঠি লেখে, কলেজের ঠিকানায় তাহার উত্তরও আসে।

পূজার সময় অখিলের পিতা বধূকে আবার আনিলেন। অখিলের বাহিরের ঘরেই শয়ন করিবার ব্যবস্থা।

অখিল এখন নানা ছুতায় বাড়ীর ভিতর যায়। কখনও কোন সুযোগে, স্ত্রীর সঙ্গে দুই এক মিনিট করিয়া দেখাও হয়। দুই একটি কথাবার্তা হয়। রাণী আঁচলে দুইটি করিয়া পান সর্বদাই বাঁধিয়া রাখিত। কখন হঠাৎ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিছুই স্থিরতা নাই। সাক্ষাৎ হইলে পান দুইটি দিত। সেই পান দুইটি অখিলের অমৃতের মত লাগিত। অখিল ভাবিত, যাহারা যখন ইচ্ছা প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পায়, তাহারা কি সুখী।

দুই এক মিনিট করিয়া যে উভয়ে দেখা হয়, তাহার মধ্যে কথা কহিবার সময় কোথা? তাই, অখিল, স্ত্রীকে চিঠি লিখিত। পরদিন সেখানি পকেটে লইয়া বেড়াইত। কোনও সুযোগে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলে, পত্রখানি তাহার হাতে দিত। ক্রমে রাণীও উত্তর লিখিয়া আনিয়া অখিলের হাতে দিল।

এটা অখিলের পরীক্ষার বৎসর। পরীক্ষা দিল—যথাসময়ে ফল বাহির হইল, অখিল ফেল হইয়াছে।

এমন ভাল ছেলে, যে প্রবেশিকায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল সে ফেল হইল কেমন করিয়া! কালীপদ বাবু বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রীতিমত কোর্ট মার্শাল আরম্ভ হইল। গৃহিণী হইতে বালক বালিকা পর্য্যন্ত অনেকেরই সাক্ষী গ্রহণ করিয়া জানিলেন—ছেলে মাঝে মাঝে বধূর সঙ্গে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করে।

সুতরাং এবার ব্যবস্থা করিলেন, ছুটির পর কলেজ খুলিলে, অখিল হষ্টেলে গিয়া থাকিবে। সেখানেই পড়াশুনা করিবে। প্রতি রবিবার প্রাতে বাড়ী আসিবে এবং সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া হষ্টেলে ফিরিয়া যাইবে।

কি করে, বেচারী অখিল বাক্স বিছানা বাঁধিয়া হষ্টেলে গিয়া ভর্তি হইল। স্ত্রী তখন অখিলের শ্বশুর বাড়ীতে। পত্রাদি নিয়মিত ভাবেই লিখিতে লাগিল। রাণীর

দিদি স্বামীর সহিত পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলেন—সুতরাং তাহাদের দেখা সাক্ষাতের সুযোগও আর নাই।

কিছুদিন পরে, রাণী অখিলদের বাড়ী আসিল, ডাকে স্ত্রীর নামে পত্র লিখিলে বাবার হাতে গিয়া পড়িবে, সুতরাং লেখাও বন্ধ হইল।

রবিবার দিন প্রাতে অখিল বাড়ী গেল। যে কয়বার বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল একবারও রাণীর সাক্ষাৎ পাইল না। তাহার মাতা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পরের রবিবারেও এইরূপ হইল। অখিল বিকালে বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, একজন ঝি আসিয়া তাহার হাতে পত্র দিল। পত্র লইয়া দেখিল—উপরেই লেখা রহিয়াছে—

শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা বরিষণে
চিঠিতে কি ভুলে মন বিনা দরশনে।

আর আর যাহা সব লেখা রহিয়াছে তাহা পড়িয়া, অখিলের মন আহ্লাদে ও দুঃখে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

কয়েক রবিবার পরে অখিল বাড়ী গিয়া ঝি মারফৎ এই পত্র পাইল—

প্রিয়তম,

অনেকদিন তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। কতকথা তোমায় বলিবার আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হইবে, ভাবিয়া কোনও কুল-কিনারা পাই না। পিসীমা বৃন্দাবন গিয়া অবধি আমি যে ঘরে শুই, সেই ঘরে এই ঝি নীচে বিছানা করিয়া শুইয়া থাকে। তুমি যদি কোনও সুযোগে এক রবিবার রাত্রিতে বাড়ীতে থাক, তবে গোপনে দুই এক ঘণ্টার জন্য আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে। ঝি ততক্ষণ বাহিরে বারান্দায় বসিয়া থাকিবে। যেমন ভাল বিবেচনা হয় করিও। আমি তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি।

তোমার সাধের
রাণী

এই পত্র পাইয়া অখিলের মাথা ঘুরিয়া গেল। হষ্টেলে ফিরিয়া এক সপ্তাহকাল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় কাটাইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিল। ঝি যেরূপ দ্বার খুলিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছে তাহা নিরাপদ নহে। সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে, উঠানে নীচের বারান্দায় সিঁড়ির কাছে···(?) উঠিয়া তাহার পিতামাতার শয়নকক্ষ এ সমস্তই পার হইতে হইবে। এতগুলা আপদ্ সঙ্কুল স্থান পার হইতে গেলে কেহ না কেহ হয়ত তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। সে মহালজ্জার কথা হইবে। আর কি অছিলা করিয়াই বা রাত্রে

বাড়ীতে থাকিবে। অসুস্থতার ভান করিলে হয়ত তাহার পিতা কি মাতা তাহার কাহারও শয়নের ব্যবস্থা করিবেন তখন উঠিয়া যাইবার কোন উপায় হইবে না। তাহার চেয়ে বরঞ্চ রোমিও যেমন করিয়াছিল সেইরূপ করাই সঙ্গত।

ইংরাজের দোকান হইতে ১৫ টাকা দিয়া সে একটি দড়ির মই কিনিয়া আনিল। হাত ব্যাগের মধ্যে সেটি লুকাইয়া, রবিবার প্রাতে বাড়ী গেল।

ঝির সাহায্যে সেই মই ও চিঠি স্ত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিল। রাণী সেটি লুকাইয়া রাখিল।

চিঠিতে লেখা ছিল, এই মই, জানালায় বেশ করিয়া বাঁধিয়া নীচে অবধি ঝুলাইয়া দিও। রাত্রি বারোটার সময় পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া বাগান দিয়া আমি আসিব ও এই মই সাহায্যে উঠিয়া তোমার নিকট যাইব। চিঠি ও মই রাণী বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। রাত্রিতে শয়ন করিতে গিয়া রাণী সেই চিঠি পড়িল এবং মই দেখিল। দেখিয়া ঝিকে বলিল, "এ দিয়ে কি করে আসবেন তিনি ?"

ঝি বলিল—"এই দড়ির থাটালে পা দিয়ে দিয়ে উঠে আসবেন।"

"যদি পড়ে যান ?"

"আশ্চর্য্য কি ! আমি হলে ত উঠতে পারিনে বাপরে।" রাণীর মুখখানি শুকাইয়া গেল। বলিল, "না ভাই এ দিয়ে তাঁর এসে কাজ নেই। শেষে কি পড়ে গিয়ে হিতে বিপরীত হবে।"

"আমারও ত ভারি ভয় করছে।"

"না—এ আমি কখনও ঝুলিয়ে দেব না। তার সঙ্গে এখন যদি দু বছর দেখা না হয় তার আর কি করব ? এ দিয়ে চড়ে কায নেই। আমার গা থর থর করে কাঁপছে।"

"দাদাবাবু যে রাত্রি ১২টার সময় পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে জানালার নীচে আসবেন—তার উপায় কি ?"

"তুই গিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বলতে পারবিনে ? বলিস এ দিয়ে উঠে কার্য্য নেই। সে আমি কিছুতেই পারব না।"

"আমি গিয়ে কি করে বলব ?"

"চুপি চুপি খিড়কী দরজা খুলে বেড়িয়ে যাবি।"

"যদি কেউ আমায় দেখতে পায় ? জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছিস্ ? তখন আমি কি জবাব দেব ?"

"একটা যা হয় কিছু ওজর করিস্।"

ঝি বলিল, "না বড়দিদি সে আমি পারব না। তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর।"

"কি ?"

"তুমি চিঠি লিখে দাও। দাদাবাবু রাত্রি ১২টার সময় জানালার নীচে এলে, সেই চিঠিখানি তাঁর গায়ে ফেলে দেব।"

"অন্ধকারে চিঠি কোথা গিয়ে পড়বে, যদি দেখতে না পান?"

ঝি একটু ভাবিয়া বলিল, "একটা দড়িতে ঢিল বেঁধে তার সঙ্গে চিঠিখানা বেঁধে দিলেই হবে এখন।"

সেই পরামর্শই রহিল।

এদিকে অখিল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হষ্টেলে গেল না। হষ্টেল হইতে সমস্ত রাত্রি ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

বাড়ী হইতে সে এক বন্ধুর গৃহে গিয়া ব্যাগটি রাখিল। পরে সেখান হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ১১টার সময় নিজ বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইল। যে পথে অন্তঃপুরের প্রাচীর সে পথটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। অখিল প্রাচীরের একটা স্থান পুর্বেই নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে গিয়া, কষ্টে উঠিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল।

এখন যে সময় সে লাফাইয়া পড়ে, সেই সময় একজন পাহারাওয়ালা সেখানে আসিয়া পড়ে। লাফাইবার সময় সে তাহার বাতি উঁচু করিয়া ধরিল এবং দেখিতে পাইল।

দেখিয়া সে মোড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। সেখানে অপর একজন পাহারাওয়ালা বসিয়া ঝিমাইতেছিল তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "এ জোড়িদার কালীবাবুকা বাগীচামে এক গো চোর ঘুষল বা।" বলিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিল সমস্ত বর্ণনা করিল।

জুড়িদার বলিল, "চল ত কোনখান দিয়া লাফাইল দেখি।"

দুজনে গিয়া প্রাচীরের সেই অংশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "এ চোর ধরিয়া দিতে পারিলে সরকার হইতে বকশিস্ ত মিলিবেই কালীবাবুর কাছেও বকশিস্ মিলিবে। অতএব এস আমরা দুজনে পাঁচিল ডিঙাইয়া প্রবেশ করি।"

প্রবীণ কনেষ্টবলটি বলিল, "পাগল হইয়াছ? উহার কাছে নিশ্চয় ছোরা আছে যদি বুকে বসাইয়া দেয়?"

"তবে, তবে কি হইবে?"

"তার চেয়ে বরং দেউড়িতে গিয়া বাবুর চাকর-বাকরকে জাগাইয়া বাবুকে সংবাদ দিই।"

"তবে চল আর দেরী করা নয়।"

উভয় কনেষ্টবল তখন দেউড়িতে ভৃত্যকে জাগাইয়া বলিল—"বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশেষ প্রয়োজন তাঁহাকে খবর দাও। অত্যন্ত জরুরী কার্য।"

চাকর চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাবুকে সংবাদ দিতে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে পাঁচিল ডিঙাইয়া অখিল বাগানের সেইখানটায় পড়িয়া গেল। তাহার হাঁটুতে একটু আঘাত লাগিল, কাপড় ছিঁড়িয়া গেল। সেইখানে সে কয়েক মিনিট থাকিয়া পরে আঃ উঃ বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাগানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। বাগানের পথের উপর হইতে মাঝে মাঝে পা তাহার নীচে পড়িয়া যায়। এক একটা ফুল গাছকে ধরাশায়ী করিয়া অখিল অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাণীকে লেখা হইয়াছে রাত্রি ১২টার সময় সে মই ঝুলাইয়া দিবে। এখনও ১২টা বাজে নাই। তাহার হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধা ছিল। তাহার কাঁচ ভাঙিয়া গিয়াছে, ঘড়ি বন্ধ। এগারোটা চল্লিশ মিনিট হইয়া তবে ঘড়ি বন্ধ হইয়াছে। এতক্ষণ ১২টা বাজিতে আর মিনিট দশেক আছে বোধ হয়। অখিল আর একটু অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। কলমের আমগাছের শাখায় তাহার মাথা লাগিল। ভন্ ভন্ করিয়া গোটাকতক মাছি উড়িয়া তাহার ললাটে কর্ণে আঘাত করিল।

গৃহ এখান হইতে অধিক দুরে নহে। এক একটা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতেছে দেখা যাইতেছে। কোন্ জানালাটি রাণীর ঘরের তাহা অতদুর হইতে ভাল বুঝিতে পারিল না। সাবধানতার সহিত আরও দুই এক পদ অগ্রসর হইল এইরূপ ক্রমে বাড়ীর কাছে গিয়া পৌছিল। তখন উপরে নজর করিয়া রাণীর ঘরের জানালাটি চিনিতে পারিল। সেইদিকে গিয়া জানালাটির তলে দাঁড়াইল। মই নামে নাই দেখিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দেখিল দুই দুইজন মানুষ জানালা দিয়া চাহিতেছে।

এক মুহূর্তে শব্দ পাইল খিড়কীর দরজা খুলিল। হ্যারিকেন লণ্ঠন হস্তে তিন চারিজন লোক ছুটিয়া বাহির হইল। একজন বলিল—"এক জায়গামে নেহি, এক জায়গামে নেহি, চার আদমি চার তরফ দৌড়ো।"

একথা শুনিয়া অখিলের প্রাণ উড়িয়া গেল। বুঝিল বাগানে লোক ঢুকিয়াছে সন্দেহ করিয়া উহারা চোর ধরিতে আসিয়াছে।

উহা দেখিয়া, যেদিকে আলো ছিল, সে তাহার বিপরীত দিকে প্রাণপণে দৌড় দিল, "ঐ চোর ঐ চোর" বলিতে বলিতে, দুবে চৌবে প্রভৃতি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কৃত্রিম পাহাড় হইতে একখানা পাথর তুলিয়া অখিল পশ্চাদ্ধাবনকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। ছুটিতে ছুটিতে দুইজনের লণ্ঠন নিবিয়া গিয়াছিল ঢিল গিয়া তৃতীয় লণ্ঠনকে চূর্ণ করিয়া দিল। আর একটা পাথর লইয়া সেইদিকে অখিল ছুঁড়িল পরে আর একটা।

"আরে বাপ আরে দাদা"—বলিয়া কে একজন আর্তনাদ করিয়া উঠিল। যাহার

হাতে লণ্ঠন ছিল সে পলাইতে লাগিল। অখিল সেই কৃত্রিম পাহাড়ের কোলে দাঁড়াইয়া রহিল।

অখিল এই সুযোগে পাহাড় হইতে নামিয়া রাণীর জানালার দিকে গেল। দেখিল মই রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিল। যখন অর্ধেক পথ উঠিয়াছে তখন আরও কতকগুলি লোক খিড়কী দিয়া বাহির হইল। তাহাদের দুইজনের হস্তে কনেষ্টবলের বুলস আই লণ্ঠন। সেই লণ্ঠনের তীব্র আলোক দেওয়ালের গায়ে পড়িয়াছে। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"আরে চোর দেওয়ালের গায়ে বাবুর ঘরে উঠিতেছে।" তাড়াতাড়ি উঠিয়া অখিল মই তুলিয়া লইল। প্রবেশ করিয়া দেখিল রাণীর মুখ পাংশুটে বর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

অখিল চাহিয়া দেখিল ঘরের দ্বার বন্ধ। 'কিছু ভয় নাই, তুমি বিছানায় বস', বলিয়া সে খপ্ করিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিল।

তাহার পর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল—[২]

॥ টীকা ॥

১। পাণ্ডুলিপির মার্জিনে এই স্থলে এইরূপ লিখিত আছে—

Court martial-এর চিত্র (?)

অখিলের পিতা অখিলের মাতাকে দিব্য দিলেন।

২। গল্পটি এই পর্যন্ত লিখিত আছে। সমাপ্তিসূচক সামান্য অংশই বাকি আছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি (২)

জীবনের মূল্য

অপরাহ্নকালে পল্লীগ্রামের এক বৈঠকখানায় বসিয়া দুই বৃদ্ধে কথোপকথন হইতেছিল। প্রথম বৃদ্ধ ইনি গৃহস্বামী—বলিলেন—"তা দাদা, আমার এমনই কি বয়স হয়েছে? এ বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না?"

অপর বৃদ্ধ বলিলেন—"কেন করবে না? আকছার এই ত—" বলিয়া সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী দুই তিনখানি গ্রামের কয়েক ব্যক্তির বৃদ্ধ বয়সে দার গ্রহণের উদাহরণ দিলেন।

গৃহস্বামী—ইহার নাম পার্বতীচরণবাবু বলিলেন "আমি যে এখনও নবীন ছোকরাটি আছি, একথা বলছিনে। এ বয়সে আবার বিবাহ না করতে পার্লেই ভাল। কিন্তু দেখ, বুড়ো হলে, সেবা শুশ্রূষার একটু দরকার। আমি এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে রয়েছি—ছেলেপিলেরা বিদেশে, হঠাৎ যদি আমার শরীর অশরীর হয়—কে করে বল দেখি?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল—"তার সন্দ কি? ওদের কাছে একবার কথাটা পেড়ে দেখলে হয়।"

"তাকি আমি পাড়িনি, কিন্তু রাজি হয় কি? বলে আর এক জায়গায়—আমাদের মেয়ের বিয়ের কথা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে—তাদের কি বলে জবাব দিই। তাই শুনে ভিতরে ভিতরে আমি খবর নিলাম। পাকাপাকি ছেড়ে কিছুই হয়নি। তাদের ছেলেটি বি, এ, পড়ছে—তিন হাজার টাকা চায়—এই শুনেই ওদের আক্কেল গুরুম্ হয়ে গেছে। কাল কি খাবে তার ঠিকানা নেই—তিন হাজার টাকা দিতে পারবে ওরা? দেনায় ত এদিকে ভদ্রাসনখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় যাবার যো হয়েছে। আমি বলেছি বিয়ে দিক, আমি ওর দেনা বিলকুল শোধ করে দিচ্ছি। তাই শুনে কর্তাগিন্নী কতকটা রাজিও হয়েছিল। কিন্তু তাদের বড় ছেলে—সেই অকাল কুষ্মাণ্ড—কলেজে পড়ে, ধেড়েকেষ্ট পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেড়ায় সেই নাকি বলেছে, বোনকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হয় সেও কবুল—কিন্তু বুড়ো বরে দেব না।"

"ছেলেটা বড় নষ্ট। বাপ মায়ের ওপর কথা কবার তুই কেরে বাপু?"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ বলিল—"তোমার গিন্নীকে দিয়ে ঐ মেয়ের মাকে যদি একবার বলাতে পার তাহলে হতে পারে।"

"শুনেছি ছেলেকে পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে গিন্নীর গহনাগুলিও সব বন্ধক পড়েছে।"

"বন্ধক পড়েছে উদ্ধার করে দেব। সব উদ্ধার করে দেব।"

এই সময় একজন ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বয়স চল্লিশের বেশী হয় নাই—গৌরবর্ণ। টিকিতে একটি ফুল বাঁধা আছে। প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বাঁড়ুয্যে মশাই নমস্কার। কি বখশিস্ দেবেন বলুন?"

"কেন কি হয়েছে?"

"রাজি করে এসেছি।"

"অ্যাঁ বল কি?"

"মেয়ের বাপ রাজি, মেয়ের মাও নিমরাজি। বাড়ীখানি বন্ধক আছে, সেখানি উদ্ধার করে দিতে হবে। মেয়ের মার খানকতক গহনা বন্ধক আছে। সেগুলি উদ্ধার করে দিতে হবে আর নগদ দু'হাজার। এই হলেই তারা রাজি।"

বৃদ্ধ সোৎসাহে ভট্টাচার্য্যের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"ভ্যালা মোর ভাই রে। তুমি না হলে আর অন্য কেউ পারে? আচ্ছা আমি সবই করে দেব। এখন বিবাহের একটা দিন দেখে দাও।"

তখন পঞ্জিকা বাহির হইল। দিন দেখার ধুম পড়িয়া গেল।

(২)

কন্যার পিতার নাম রাধামাধববাবু। তাঁহার সহিতও পার্বতীবাবুর কথাবার্তা হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, সম্মুখে এখন চৈত্রমাস, এখন ত হইবার যো নাই—বৈশাখ মাসে তখন দিন স্থির করা যাইবে।

মেয়েটার একখানিও ফোটোগ্রাফ ছিল না। বহুব্যয়ে কলিকাতা হইতে ফোটোগ্রাফার আনিয়া বৃদ্ধ মেয়েটির একটি ফোটোগ্রাফ তুলাইয়া লইয়াছেন। সেই ফোটোগ্রাফখানির সম্মুখে চশমাটি চোখে দিয়া তিনি প্রায়ই মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া থাকেন।

তাঁহার বন্ধু বিশ্বম্ভরবাবু একদিন আসিয়া এই কার্যে বৃদ্ধকে ধরিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"আপনি যে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন দেখছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তা সত্যি। দেখ এই মেয়েটি বয়সে আমার নাতনীর সমান। কিন্তু একে দেখে অবধি আমি যেন কি রকম হয়ে গেছি। এ নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী, মরে জন্মগ্রহণ করেছে। নইলে এ বয়সে আমি এটুকু মেয়েকে দেখে এমন পাগল হব কেন? হিসাব করে দেখলাম কিনা, গিন্নীর মরবার ঠিক এগার মাস পরেই ঐ মেয়েটি জন্মগ্রহণ করেছে। এ নিশ্চয়ই আমার মৃত স্ত্রী।

বিশ্বম্ভরবাবু মনে মনে হাস্য করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল—"দেখ আশ্চর্য কিন্তু—এখন ত আমার হরিনাম করবার বয়স। কিন্তু খেতে শুতে সর্বদাই ওকেই আমার মনে পড়ে। ও যেন আমায় যাদু করেছে।"

বিশ্বম্ভর বলিলেন—"সতী মরে যেমন গৌরী হয়ে জন্মেছিলেন—আবার শিবের সঙ্গে বিবাহ হল সেই রকম আর কি।"

"ঠিক সেই রকমই মনে হয়। লোকে বলে বুড়ো স্বামীকে মেয়েরা পছন্দ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি তাই হবে? ও ত আমায় পছন্দ করবেই করবে। কেন না —"

"জন্মান্তরের স্বামী।"

"যদি দেখি, বিবাহের পর আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করছে তা হলে, একটু যা সন্দেহ আছে, তাও থাকবে না। কি বল বিশ্বম্ভর?"

"সে কথা ঠিক।"

"আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? আমি যে এসব বলছি—বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে বলে প্রলাপ বলছি না আন্তরিক এর মধ্যে কিছু আছে?"

"এ রকম হওয়া কখনও শুনিনি কিন্তু।"

"শোননি? আমি শুনেছি। আমাদের বাড়ীতেই আমাদের জ্যাটামশায় একজন মস্ত পণ্ডিত ছিলেন আর খুব একজন সাধুও বটে। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে বাড়ী এসে দ্বার বন্ধ করে পুজা করছিলেন। আমার এক কাকা তখন ছেলে মানুষ, বড় দুরন্ত ছিলেন। পাড়ার কার কি লোকসান করে এসেছিলেন। সে গৃহস্ত এসে তাঁর কাছে নালিশ করলে। শুনেই তিঁনি রাগে বলে উঠলেন—অমন ছেলেকে সর্পাঘাত হোক। তার মাস খানেক পরেই বাস্তবিক সে ছেলেকে সাপে কামড়ালে সে মরে গেল। তার কিছু দিন পরে বাড়ীর একটি বউ—সে তখনও পর্যন্ত বাঁজা ছিল রাত্রে স্বপ্ন দেখলে ছেলে বলছে—খুড়িমা আমি জ্যাটামশায় শাপ দিয়ে ছিলেন, আমি পরমায়ু থাকতে মরেছি। আমি এবার তোমার কাছে এলাম। এসব কথা আমি ছেলে বেলা থেকেই শুনে আসছি।"

(৩)

গৌরী ওদিকে, বুড়ো বরের সহিত বিবাহ হইবে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার সমবয়সীরা কেহ তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কেহ বা সমবেদনা জানায়। কেহ কেহ তার মার কাছে এ কথা বলিল—মা উত্তর করিলেন "যদি ভবিতব্য থাকে তবে কে নিবারণ করতে পারবে বল?"

কিসের একটা ছুটি হইল, মেয়ের ভাই বাড়ী আসিল। সকল কথা শুনিয়া বোনটির অবস্থা দেখিয়া সে মা বাপকে বলিল এ বিবাহ কখনই হইতে পারে না।

বোনটির সহিত তাহার কথাবার্তা হইল। সে বলিল যেমন করিয়া হউক সে তাহাকে এ বিবাহ হইতে উদ্ধার করিবে।

মা বাপকে বলিল দুই সপ্তাহ সময় দিন, যদি ইতিমধ্যে বিবাহের ঠিকঠাক না করিয়া ফেলিতে পারি—তবে ঐ বুড়োকে দিবেন।

ছেলেটি তাহার বাসায় গিয়া তাহার বন্ধুদের বলিল। একজন বন্ধু স্বীকৃত হইল বিনা পণে বিবাহ করিতে।

সমস্ত ঠিকঠাক হইল। বিবাহের দিন প্রাতে পাত্রকে লইয়া ছেলেটি আসিয়া পৌঁছিল।

বিবাহ হইতেছে ইতিমধ্যে কোথা হইতে খবর পাইয়া বৃদ্ধ আসিয়া হাজির।

বিবাহ সভায় উলকা ঝুলকা হইয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—"এ কি ?" মেয়ের বাপ বলিল—"বাড়ুয্যে মশাই একটি সুবিধেমত পাত্র পাওয়া গেল—" বৃদ্ধ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল অ্যাঁ এতবড় আস্পর্দ্ধা ! আমার সঙ্গে প্রতারণা। আমাকে ফাঁকি ? আমি যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হই তবে আমি অভিশাপ দিচ্ছি বছর পোয়াবে না—এ মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে বলিয়া বৃদ্ধ হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পাল্কীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ওঠাও পাল্কী।"

(৪)

অভিশাপ দিয়া, সারারাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। তিনি ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঘন ঘন তামাক খাইতে লাগিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

দুঃখে ও অপমানে তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। প্রভাতে তাঁহার বন্ধুরা যখন আসিয়া তাঁহাকে দেখিলেন তখন তাঁহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। তিনি একখানি চৌকির উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। উত্তাপে তাহার দেহ পুড়িয়া যাইতেছে।

ক্রমে বৃদ্ধের মন হইতে সে ভাব তিরোহিত হইয়া একটা অনুশোচনার ভাব আসিল। বলিতে লাগিলেন—"আহা বড়ই অন্যায় করেছি। বিনাদোষে মেয়েটিকে ব্রহ্মশাপ দিয়ে এলাম যদি ফলে যায় তবে কি হবে ? বাপের ত ঐ অবস্থা।"

বন্ধুরা বললেন—"আপনি রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলেছেন। ব্রহ্মশাপ—সর্বনেশে জিনিষ বৈকি। তা এখন আশীর্বাদ করুন যেন বেচারীর কোন অমঙ্গল না হয়।"

"আমি রোজ আশীর্বাদ করছি। আহা কচি মেয়ে আমারও বুড়ো বয়সে কি বাহাত্তুরে ধরল।" বাস্তবিকই বৎসরখানেক মধ্যে মেয়েটি বিধবা হইয়া গেল।

(৫)

দশ বৎসর কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে গৌরীর বাপ মরিয়াছে—তাহার দাদা এখন সামান্য

চাকরী করে। দাদার স্ত্রীর সঙ্গে গৌরীর বনে না। তাহারা কোথায় থাকে কেহ জানে না। অনেক দিন গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

মাঝে মাঝে বৃদ্ধ সংবাদ পান—তাহারা বড় কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। গৌরীর একটি ছেলে হইয়াছে। ছেলেটি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বেড়ায়। গৌরী এখন দাদার বাড়ীতে থাকে না। একটি সদয় ভদ্র পরিবারে থাকিয়া পাচিকার কার্য করে।

এই সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধর অনুশোচনা বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন আহা আমি যদি ব্রহ্মশাপ না দিই তা হলে বেচারীর এ বিপদ হয় না আমিই এর জন্যে দায়ী।

তাঁহার বন্ধুরা বলে "আপনি দায়ী কি করে? তার স্বামীর পরমায়ু ছিল না, সে মরেছে। সে যখন জন্মেছিল, তখনই বিধাতা পুরুষ স্থির করে দিয়েছিলেন সে কত বছর বাঁচবে। তখন ত আর আপনি তাকে ব্রহ্মশাপ দেননি।"

একদিন বৃদ্ধ উহাদের খবরাখবর লইতে কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া তাঁহাদের যে প্রকার বর্ণনা করিল, শুনিয়া বৃদ্ধের চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

পরদিন বৃদ্ধ সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইলেন। বলিলেন কলিকাতা যাইতেছি।

কলিকাতায় পৌছিয়া সে ঠিকানা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৃদ্ধ উপস্থিত হইল। বাড়ীর কর্ত্তাটি বৃদ্ধ, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি চান?"

"এই বাড়ীতে আমাদের গ্রামের শশী বাঁড়ুয্যের বিধবা মেয়ে······থাকে কি?"

"থাকেন।"

"আমিও সেই গ্রামের। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায়।" ২

বৃদ্ধ বলিলেন—"ওঃ বুঝেছি।"

গঙ্গাচরণ বলিলেন—"আমার নাম পূর্বে আপনি শুনেছিলেন?"

"হ্যা।"

"আমি একজন মহাপাপী।" ৩

॥ টীকা ॥

১। প্রভাতকুমারের মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ বানান দেখা যায় না।

২। কাহিনীর সুরুতে ইঁহার নাম পার্বতী চরণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবার প্রকাশিত উপন্যাসে ইনিই হইয়াছেন গিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩। পাণ্ডুলিপি এখানেই শেষ। গল্পের সামান্য একটু অংশ যাহা বাকী আছে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি (৩)

"একজন **highly sensitive** যুবক য়ুরোপ গিয়া সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়া আসিল। ইহাই নিজ জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করিল। ক্রমে দেখিল, য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সঙ্গীত বিদ্যার উচ্চ সম্মান, এদেশে তাহা নাই। মুর্খ ধনী লোকে তাহাকে একটু প্যাট্রোনাইজ করার ভাব দেখাইল। বাগান বাটীতে প্রথম **Engagement** হইল। সেখানে গিয়া ব্যাপার যাহা দেখিল, দ্বিতীয়বার সেরূপ **Engagement accept** করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। যথার্থ ভদ্রলোকের **Engagement accept** করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে পেট চলে না। এক রাজার পুত্র বিবাহ উপলক্ষ্যে গাইতে গিয়াছিল, রাজা খুশী হইয়া তাহাকে গা হইতে খুলিয়া শাল বখশিস করিয়া দিলেন। **Last Straw, profession** সেইদিন হইতে ছাড়িয়া মাষ্টারি কার্যে নিযুক্ত হইল।"*

* এই খসড়ার উপর ভিত্তি করিয়া প্রভাতকুমারের 'গুণীর আদর' গল্পটি রচিত।

প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থগুলিতে সঙ্কলিত গল্পসমূহের কালক্রমিক তালিকা

গল্পের নাম	সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকাল	
১। দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর	অগ্রহায়ণ ১৩০২	ভারতী
২। শাহজাদা ও ফকীর কন্যার কাহিনী	„	„
৩। একটি রৌপ্য মুদ্রার জীবনচরিত	ভাদ্র ১৩০৩	দাসী
৪। ভূত না চোর ?[১]	চৈত্র „	ভারতী
৫। কাজীর বিচার	কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪	ভারতী
৬। শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি[২]	বৈশাখ ১৩০৫	প্রদীপ
৭। কাটামুণ্ড	„	„
৮। বেনামী চিঠি[৩]	ভাদ্র ১৩০৫	„
৯। অঙ্গহীনা	চৈত্র „	„
১০। হিমানী	বৈশাখ ১৩০৬	„
১১। ভুলভাঙ্গা	জ্যৈষ্ঠ „	ভারতী
১২। কুড়ানো মেয়ে	আষাঢ় „	„
১৩। পত্নীহারা	শ্রাবণ „	„
১৪। দেবী	ভাদ্র „	„
১৫। ভিখারী সাহেব	আশ্বিন „	„
১৬। বিষবৃক্ষের ফল	কার্তিক „	„
১৭। প্রিয়তম	অগ্রহায়ণ „	„
১৮। সারদার কীর্তি	মাঘ „	„
১৯। বউচুরি	বৈশাখ ১৩০৭	„
২০। বন্যশিশু	জ্যৈষ্ঠ „	„
২১। কাশীবাসিনী	বৈশাখ ১৩০৮	„
২২। ধর্মের কল	আষাঢ় „	„
২৩। প্রণয় পরিণাম	ভাদ্র „	„
২৪। কলির মেয়ে	আশ্বিন „	„

২৫।	একদাগ ঔষধ[৪]	পৌষ ১৩০৮	ভারতী
২৬।	ছদ্মনাম	মাঘ "	"
২৭।	সচ্চরিত্র	ফাল্গুন "	"
২৮।	বাস্তু সাপ	বৈশাখ "	"
২৯।	ভুল শিক্ষার বিপদ	জ্যৈষ্ঠ "	"
৩০।	অযোধ্যার উপহার	বৈশাখ ১৩১০	"
৩১।	প্রতিজ্ঞা পূরণ	ভাদ্র ১৩১১	"
৩২।	খুড়া মহাশয়	আশ্বিন "	বঙ্গদর্শন
৩৩।	আধুনিক সন্ন্যাসী	মাঘ "	প্রবাসী
৩৪।	গুরুজনের কথা	ফাল্গুন "	"
৩৫।	বিবাহের বিজ্ঞাপন	বৈশাখ "	"
৩৬।	স্বর্ণ সিংহ	জ্যৈষ্ঠ "	"
৩৭।	মুক্তি	আষাঢ় "	"
৩৮।	ফুলের মুল্য	ভাদ্র "	"
৩৯।	পুনর্মূষিক	কার্তিক ১৩১২	"
৪০।	বলবান জামাতা	বৈশাখ ১৩১৩	"
৪১।	আমার উপন্যাস	আশ্বিন "	"
৪২।	খালাস	ভাদ্র ১৩১৪	"
৪৩।	উকীলের বুদ্ধি	কার্তিক "	"
৪৪।	হাতে হাতে ফল	শ্রাবণ ১৩১৫	"
৪৫।	প্রত্যাবর্তন	বৈশাখ ১৩১৬	"
৪৬।	প্রবাসিনী	আষাঢ় "	"
৪৭।	রসময়ীর রসিকতা	পৌষ "	মানসী
৪৮।	মাতৃহীন	চৈত্র ১৩১৭	"
৪৯।	মাতুলী	আশ্বিন ১৩১৮	"
৫০।	বিলাত ফেরতের বিপদ	" "	"
৫১।	বাল্যবন্ধু[৫]	অগ্রহায়ণ মাঘ ১৩১৯	মানসী
৫২।	আদরিণী	ভাদ্র ১৩২০	সাহিত্য
৫৩।	লেডি ডাক্তার	আশ্বিন ১৩২০	মানসী
৫৪।	সম্পাদকের আত্মকাহিনী	কার্তিক "	সাহিত্য

৫৫।	নীলুদা	কার্তিক ১৩২০	ভারতবর্ষ
৫৬।	যুগল সাহিত্যিক	ফাল্গুন-চৈত্র ,,	,,
৫৭।	বায়ু পরিবর্তন	বৈশাখ ১৩২৬	সাহিত্য
৫৮।	খোকার কাণ্ড	আশ্বিন ,,	মানসী
৫৯।	যন্ত্র ভঙ্গ	,,	ভারতবর্ষ
৬০।	কুমুদের বন্ধু	জ্যৈষ্ঠ ১৩২২	,,
৬১।	নিষিদ্ধ ফল	ফাল্গুন ,,	মানসী ও মর্মবাণী
৬২।	সতী দাহ	বৈশাখ ১৩২৩	,,
৬৩।	সখের ডিটেকটিভ	শ্রাবণ ,,	,,
৬৪।	কুকুর ছানা	আশ্বিন ,,	,,
৬৫।	অদ্বৈত বাদ	ফাল্গুন ,,	,,
৬৬।	সম্পাদকের কন্যাদায়	শ্রাবণ ১৩২৪	,,
৬৭।	আম্রতত্ত্ব	কার্তিক ,,	,,
৬৮।	বাজীকর	পৌষ ,,	,,
৬৯।	গহনার বাক্স	ফাল্গুন ,,	,,
৭০।	ডাগর মেয়ে	আষাঢ় ১৩২৫	ভারতবর্ষ
৭১।	কালিদাসের বিবাহ	আশ্বিন ,,	মানসী ও মর্মবাণী
৭২।	মাষ্টার মহাশয়	১৩২৬	,,
৭৩।	নয়নমণি	কার্তিক ,,	,,
৭৪।	অদৃষ্ট পরীক্ষা	বৈশাখ আষাঢ় ১৩২৯	মাসিক বসুমতী
৭৫।	হতাশ প্রেমিক	আশ্বিন ১৩২৯ (?)	....
৭৬।	অলকা	,, ,,	মানসী ও মর্মবাণী
৭৭।	কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্ত কথা	অগ্রহায়ণ ,,	,,
৭৮।	জ্যোতিষী মহাশয়	আষাঢ় শ্রাবণ ১৩৩০	মাসিক বসুমতী
৭৯।	হীরালাল	শ্রাবণ ,,	মানসী ও মর্মবাণী
৮০।	বিনোদিনীর আত্মকথা	আশ্বিন ,,	মাসিক বসুমতী
৮১।	প্রেম ও প্রহার	কার্তিক ,,	মানসী ও মর্মবাণী
৮২।	ঔপন্যাসিক	,, ,,	বঙ্গবাণী
৮৩।	গুণীর আদর	ফাল্গুন চৈত্র ,,	সচিত্র শিশির
৮৪।	হারাধন	চৈত্র ১৩৩০ বৈশাখ ১৩৩১	মাসিক বসুমতী

৮৫।	পোষ্টমাষ্টার	চৈত্র ১৩৩০	মানসী মর্মবাণী
৮৬।	যুবকের প্রেম	ভাদ্র কার্তিক ১৩৩১	মাসিক বসুমতী
৮৭।	ভোজরাজের গল্প	আশ্বিন ,,	সচিত্র শিশির
৮৮।	পুলিনবাবুর পুত্র লাভ	,,	মানসী ও মর্মবাণী
৮৯।	রানী অম্বালিকা	ফাল্গুন ,,	,,
৯০।	সতী	বৈশাখ ১৩৩২	,,
৯১।	রেলে কলিসন	ভাদ্র ,,	'শরতের ফুল' পূজা বার্ষিকী
৯২।	দাম্পত্য প্রণয়	জ্যৈষ্ঠ ,,	মাসিক বসুমতী
৯৩।	বিলাতী রোহিণী	আশ্বিন ,,	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি
৯৪।	প্রজাপতির পরিহাস	,,	বার্ষিক বসুমতী
৯৫।	চিরায়ুষ্মতী	,,	মানসী ও মর্মবাণী
৯৬।	বিলাসিনী	পৌষ ,,	সচিত্র শিশির (বড়দিন সংখ্যা)
৯৭।	ঢাকায় বাঙ্গাল	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩	মানসী ও মর্মবাণী
৯৮।	সুশীলা না পিপুলা	আশ্বিন ,,	বার্ষিক বসুমতী
৯৯।	ভুল	,,	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি
১০০।	উপন্যাস কলেজ	অগ্রহায়ণ ,,	ভারতবর্ষ
১০১।	যোগবল না সাইকিক ফোর্স	পৌষ ,,	মানসী ও মর্মবাণী
১০২।	সুধার বিবাহ	বৈশাখ ১৩৩৪	মাসিক বসুমতী
১০৩।	নূতন বউ	আশ্বিন ,,	বার্ষিক বসুমতী
১০৪।	ডোরা	বৈশাখ ১৩৩৫	মাসিক বসুমতী
১০৫।	বেকসুর খালাস	আশ্বিন ,,	,,
১০৬।	কানাইয়ের কীর্তি	কার্তিক ১৩৩৫	মানসী ও মর্মবাণী
১০৭।	পরের চিঠি	ফাল্গুন ,,	,,
১০৮।	বাপকী বেটী	,,	কুন্তলীন পুরস্কার
১০৯।	দিব্যদৃষ্টি	আশ্বিন ১৩৩৬	মাসিক বসুমতী
১১০।	সুশোভনা	পৌষ ,,	,,
১১১।	ঘড়ি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	,,
১১২।	একালের ছেলে	আশ্বিন ,,	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি
১১৩।	জামাতা বাবাজী	কার্তিক ,,	মাসিক বসুমতী

১১৪।	বি, এ, পাশ কয়েদী	আশ্বিন ১৩৩৮	মাসিক বসুমতী
১১৫।	প্রেমের ইন্দ্রজাল		জামাতাবাবাজী গ্রন্থে সংকলিত
১১৬।	হারাণো মেয়ে		
১১৭।	মাতঙ্গিনীর কাহিনী [৭]		
১১৮।	বেশ্যা খুন [৭]		

॥ টীকা ॥

১। শ্রীমতী ব্রজবালা দেবীর ছদ্মনামে প্রকাশিত।

২। রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে প্রকাশিত।

৩। ঐ

৪। 'পতন' নামে প্রকাশিত।

৫। 'মাঝারি গল্প' প্রকাশিত।

৬। 'স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বর্গ বৈদ্যের উপদেশ' নামে প্রকাশিত।

৭। 'আইনের গল্প' শীর্ষকে প্রকাশিত।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের কালক্রমিক তালিকা

উপন্যাসের নাম	সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কাল	গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রণ
১। রমাসুন্দরী [১]	ভারতী বৈশাখ ১৩০৯ হইতে আশ্বিন ১৩১০ পর্যন্ত	ভাদ্র ১৩১৪ (এপ্রিল ১৯০৮)
২। নবীন সন্ন্যাসী	প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৭ হইতে চৈত্র ১৩১৮ পর্যন্ত	ভাদ্র ১৩১৯ (সেপ্টেম্বর ১৯১২)
৩। রত্নদীপ	মানসী ফাল্গুন ১৩১৯ হইতে মাঘ ১৩২১ পর্যন্ত	আষাঢ় ১৩২২ (আগষ্ট ১৯১৫)
৪। জীবনের মূল্য	মানসী শ্রাবণ ১৩২২ হইতে মাঘ ১৩২৩ পর্যন্ত	ফাল্গুন ১৩২৩ (ফেব্রুয়ারী ১৯১৭)
৫। সিন্দুর কৌটা	মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২০ হইতে চৈত্র ১৩১৫ পর্যন্ত	বৈশাখ ১৩২৬ (মে ১৯১৯)
৬ (ক)। বারোয়ারি [১(ক)] উপন্যাস	——	বৈশাখ ১৩২৮ (১৯২১)
৬। মনের মানুষ	মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৭ হইতে শ্রাবণ ১৩২৯ পর্যন্ত	১৩২৯ (আগষ্ট ১৯২২)
৭। আরতি	——	১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)
৮। সত্যবালা [২]	মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৯ হইতে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ পর্যন্ত	১৩৩১ (এপ্রিল ১৯২৫)
৯। সুখের মিলন [৩]	——	আশ্বিন ১৩৩৪ (সেপ্টেম্বর ১৯২৭)

১০।	সতীর পতি	মাসিক বসুমতী ১৩৩৩ বৈশাখ হইতে ভাদ্র ১৩৩৫ পর্যন্ত	১৩৩৫ (অক্টোবর ১৯২৮)
১১।	প্রতিমা	——	১৩৩৫ (নভেম্বর ১৯২৮)
১২।	গরীব স্বামী	মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩৩৩ হইতে মাঘ ১৩৩৬ পর্যন্ত	(এপ্রিল ১৯৩০)
১৩।	নবদুর্গা	মাসিক বসুমতী আশ্বিন ১৩৩৫ হইতে চৈত্র ১৩৩৬ পর্যন্ত	(জুলাই ১৯৩০)
১৪।	বিদায় বাণী[৪]	মাসিক বসুমতী আশ্বিন ১৩৩৭ হইতে চৈত্র ১৩৩৮	পৌষ ১৩৪০ (ডিসেম্বর ১৯৩৩)

॥ টীকা ॥

১। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৯ সাল পর্যন্ত 'সুন্দরী' এবং পরে 'রমাসুন্দরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১ (ক)। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত এই উপন্যাসের ৯—১১ পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের রচিত।

২। এই উপন্যাসের প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ ১৩০২—১৩০৩ সালে 'ভারতী'তে 'লামাকুমারী' নামে প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। পরে মানসী ও মর্মবাণীতে আদ্যন্ত প্রকাশিত হয়।

৩। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'সুধার বিবাহ' নামে গল্পটি এই উপন্যাসের শেষে সন্নিবিষ্ট আছে। পরে গল্পটি 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪। প্রভাতকুমার এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রকাশিত পুস্তকটির ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রভাতকুমারের রচনা, বাকী অংশ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের।

প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থ এবং তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট গল্পসমূহের তালিকা

১। **নব-কথা** (ডিসেম্বর ১৮৯৯)

অঙ্গহীনা, হিমানী, ভূত না চোর, বেনামী চিঠি, কুড়ানো মেয়ে, একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত, পত্নীহারা, ভুল-ভাঙ্গা, দেবী, ভিখারী সাহেব, বিষবৃক্ষের ফল, বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার, কাজীর বিচার, কাটামুণ্ড, শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, শাহজাদা ও ফকীর কন্যার প্রণয়-কাহিনী, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।

২। **ষোড়শী** (অক্টোবর ১৯০৬)

বউ-চুরি, সারদার কীর্তি, প্রিয়তম, বন্য-শিশু, কাশীবাসিনী, কলির-মেয়ে, ধর্মের কল, প্রণয় পরিণাম, ছদ্মনাম, বাস্তুসাপ, সচ্চরিত্র, ভুল শিক্ষার বিপদ, অযোধ্যার উপহার, বলবান জামাতা, খুড়া মহাশয়, গুরুজনের কথা।

৩। **দেশী ও বিলাতী** (অক্টোবর ১৯০৯)

(দেশী) আমার উপন্যাস, বিবাহের বিজ্ঞাপন, আধুনিক সন্ন্যাসী, এক দাগ ঔষধ, স্বর্ণসিংহ, প্রতিজ্ঞাপূরণ, উকীলের বুদ্ধি, হাতে হাতে ফল, খালাস, প্রত্যাবর্তন।

(বিলাতী) মুক্তি, ফুলের মুল্য, পুনর্মূষিক, প্রবাসিনী।

৪। **গল্পাঞ্জলি** (সেপ্টেম্বর ১৯১৩)

বাল্যবন্ধু, বিলাত ফেরতের বিপদ, মাতুলী, রসময়ীর রসিকতা, মাতৃহীন, আদরিণী।

৫। **গল্পবীথি** (জুন ১৯১৬)

খোকার কাণ্ড, বায়ুপরিবর্তন, সম্পাদকের আত্মকাহিনী, যজ্ঞভঙ্গ, লেডি ডাক্তার, নীলুদা, যুগল সাহিত্যিক, কুমুদের বন্ধু।

৬। **পত্রপুষ্প** (আগষ্ট ১৯১৭)

নিষিদ্ধ ফল, সখের ডিটেকটিভ, কুকুরছানা, অদ্বৈতবাদ, সম্পাদকের কন্যাদায়, সতীদাহ।

৭। **গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প** (আগষ্ট ১৯২১)

গহনার বাক্স, আম্রতত্ত্ব, ডাগর মেয়ে, মাষ্টার মহাশয়, নয়নমণি, বাজীকর, কালিদাসের বিবাহ।

৮। হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (জানুয়ারী ১৯২৪)

হতাশ প্রেমিক, অলকা, কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্ত কথা, হীরালাল, প্রেম ও প্রহার, ঔপন্যাসিক, বিনোদিনীর আত্মকথা, অদৃষ্ট পরীক্ষা, জ্যোতিষী মহাশয়।

৯। বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প (নভেম্বর ১৯২৬)

বিলাসিনী, চিরায়ুষ্মতী, প্রজাপতির পরিহাস, সতী, পুলিনবাবুর পুত্রলাভ, রেলে কলিসন, গুণীর আদর, রাণী অম্বালিকা, ভোজরাজের গল্প।

১০। যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (জুন ১৯২৮)

যুবকের প্রেম, হারাধন, উপন্যাস কলেজ, পোষ্ট মাষ্টার, দাম্পত্যপ্রণয়, সুশীলা না পিপুলা, বিলাতী রোহিণী।

১১। নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প (মার্চ ১৯২৯)

নূতন বউ, ভুল, যোগবল না সাইকিক ফোর্স, ডোরা, ঢাকার বাঙ্গাল, বেকসুর খালাস, বাপ্ কী বেটা, কানাইয়ের কীর্তি, পরের চিঠি।

১২। জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প (নভেম্বর ১৯৩১)

জামাতা বাবাজী, দিব্যদৃষ্টি, প্রেমের ইন্দ্রজাল, হারাণো মেয়ে, সুশোভনা, ঘড়ি, একালের ছেলে, সুধার বিবাহ, বি. এ. পাশ কয়েদী, আইনের গল্প (মাতঙ্গিনীর কাহিনী, বেশ্যা খুন)।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

॥ আকর গ্রন্থ ॥

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—

প্রভাত গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং)
(১ম, ২য় এবং ৫ম ভাগ)
প্রভাত গ্রন্থাবলী (শ্রীভবন সং)
(১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ড)
গল্পাঞ্জলি
রত্নদীপ
গল্পবীথি
জীবনের মূল্য
পত্রপুষ্প
সিন্দূর কৌটা
গহনার বাক্স
মনের মানুষ
হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প
আরতি
সত্যবালা
বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প
সুখের মিলন
যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প
সতীর পতি
প্রতিমা
নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প
গরীব স্বামী
নবদুর্গা
জামাতাবাবাজী ও অন্যান্য গল্প
বিদায় বাণী

॥ গৌণ আকর গ্রন্থ ॥

১। অজিত দত্ত—

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস (১ম সং)

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য—

বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১ম সং)

৩। গিরীন্দ্র শেখর বসু—

স্বপ্ন

৪। গোপালচন্দ্র রায়—

শরৎচন্দ্র (১৯৬৫ সং)

৫। জগদীশ ভট্টাচার্য্য—

(সম্পাদিত) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় স

৬। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

স্বর্ণলতা (সচিত্র নূতন সং)

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ সং)

৮। নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত—

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

৯। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—

বাংলা ছোট গল্প (১ম সং)

১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—

সাহিত্যে ছোট গল্প (৪র্থ সং)

১১। পরশুরাম—

হনুমানের স্বপ্ন ও অন্যান্য গল্প

বিরিঞ্চিবাবা ও অন্যান্য গল্প

১২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—

রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড)

১৩। প্রমথনাথ বিশী—

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

বঙ্কিম সরণী (১৩৭৩)

ঐ (সম্পাদিত) ত্রৈলোক্য রচনা সম্ভার (১৩৭৪)

১৪। প্রমথ চৌধুরী—

নীল লোহিত

১৫। ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

ঘরের কথা

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

ইন্দিরা

কমলাকান্তের দপ্তর

কৃষ্ণকান্তের উইল

কপালকুণ্ডলা

চন্দ্রশেখর

দুর্গেশনন্দিনী

বিষবৃক্ষ

সীতারাম

ধর্মতত্ত্ব

(বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলির জন্য সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে)

১৭। বনফুল—

বনফুলের গল্প সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)

১৮। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—

সমীক্ষা

ঐ (সম্পাদিত) কঙ্কাবতী

১৯। রমেশচন্দ্র দত্ত—

সংসার

সমাজ

(রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ দুইটির জন্য সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত রমেশ রচনাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে)

২০। রাজশেখর বসু—

চলন্তিকা (১০ম সংস্করণ)

২১। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রেমের কথা

২২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

গৃহদাহ

পথের দাবী

শ্রীকান্ত

স্বদেশ ও সাহিত্য

(শরৎচন্দ্রের গ্রন্থগুলির জন্য "শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ" ব্যবহৃত হইয়াছে)

২৩। শিবনাথ শাস্ত্রী—

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ('নিউ এজ' ২য় সং)

২৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং)

২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

দৈনন্দিন

সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার

২৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫৪)

২৭। মন্মথনাথ ঘোষ—

হেমচন্দ্র (৩য় খণ্ড)

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

চোখের বালি

নৌকাডুবি

চতুরঙ্গ

শেষের কবিতা

মায়ার খেলা

বিচিত্র প্রবন্ধ

সাহিত্যের স্বরূপ

ছন্দ

তিন সঙ্গী

গল্পগুচ্ছ

কড়ি ও কোমল

সোনার তরী
নৈবেদ্য
দুই বোন
(রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে)

২৯। সরোজমোহন মিত্র—
ছোট গল্পের বিচিত্র কথা (১৯৫৪)

৩০। সুকান্ত ভট্টাচার্য—
ছাড়পত্র

৩১। সুকুমার সেন—
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ৫ম সংস্করণ
ঐ (চতুর্থ খণ্ড) সং ১৯৫৩
বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য (৩য় সং)
বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড)

৩২। সুবীর রায়চৌধুরী—(সম্পাদিত)
পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প (১ম সংস্করণ)

৩৩। হেমেন্দ্রকুমার রায়—
যাঁদের দেখেছি (১ম খণ্ড)

৩৪। হরপ্রসাদ মিত্র— বঙ্কিম সাহিত্যপাঠ

॥ সাময়িক পত্রিকা ॥

১।	কথা সাহিত্য—	শারদীয়া	১৩৬৯
২।	জন্মভূমি—	অগ্রহায়ণ	১৩০০
৩।	দাসী—	ফাল্গুন	১৩০২
৪।	দেশ—	৩১শে আষাঢ়	১৩৬২
		৭ই অগ্রহায়ণ	১৩৭৫
		সাহিত্য সংখ্যা	১৩৭৫
৫।	বঙ্গশ্রী—	বৈশাখ	১৩৫৭
৬।	ভারতী—	জ্যৈষ্ঠ	১৩০৫
		আশ্বিন	১৩০৫
৭।	মানসী ও মর্মবাণী—	বৈশাখ	১৩৩০
		ভাদ্র	১৩৩০
		ভাদ্র	১৩২৫

৮।	মাসিক বসুমতী—	আশ্বিন	১৩৩৬
		চৈত্র	১৩৩৮
৯।	সঙ্কল্প—	অগ্রহায়ণ	১৩২১
১০।	সাহিত্য—	আশ্বিন	১৩০৮
		চৈত্র	১৩১১
১১।	আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক)—	২৬শে মাঘ	১৩৫৫

॥ ইংরাজী গ্রন্থ ॥

1. Bertil Romberg— Studies in the Narrative Technique. of the First Person Novel.
2. Edwin Muir— The Structure of the Novel.
3. Henry Bergson— Laughter.
4. J. W. Beach— The 20th Century Novel.
5. John Palmer— Principal & Comic Characters of Shakespeare.
6. O' Henry— The Complete Works of O' Henry.
7. R. S. Wordsworth— Contemporary School of Psychology.
8. S. Maugham— Creatures of Circumstances.
   The Author Excuses himself.
   The Points of View.
9. S. K. Chatterji— Languages & Literatures of Modern India.
10. W. H. Hudson— An Introduction to the Study of Literature.
11. Walter Allen— Reading a Novel.

॥ ইংরাজী পত্রিকা ॥

1. American Review— October 1954.
2. Do — January 1955.

॥ ইংরাজী কোষগ্রন্থ ॥

1. Encyclopaedia Britanica (1957).
2. The Australian Encyclopaedia (1959).
3. Websters New International Dictionary (2nd Edn.).

নির্ঘণ্ট